অভ্যুদয়

স্মরণিকা ২০তম পুনর্মিলন উৎসব, ১৪২৯

১৯-২০ নভেম্বর, ২০২২

PURULIA RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH, ALUMNI ASSOCIATION

অভ্যুদয়

বিংশ সংখ্যা ২০২২

বিংশতিতম পুনর্মিলন

PURULIA RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH ALUMNI ASSOCIATION

(Regd. under the W.B. Societies Regn. Act XXVI of 1961 No. S/68117 Dt. 16.7.91

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি

রেজিস্টার্ড অফিস : ১০/৩ এল, উমাকান্ত সেন, কলকাতা - ৭০০ ০৩০

অফিস : ৯/১, অক্রুর দত্ত লেন, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১২

সম্পাদক

ড. নিরঞ্জন গোস্বামী, ১৯৭৬ (মাধ্যমিক)

সহ সম্পাদক

ডা. রজতকান্তি সিংহচৌধুরি, ১৯৮২

সম্পাদকমণ্ডলী

সুব্রত সর, ১৯৮১ । অরূপানন্দ মুখার্জী, ১৯৮৩ । দেবাশীষ ঘোষ, ১৯৮৫ । বিস্ময় রায়, ১৯৮৭ ।
শারদ্বত মান্না, ২০০৮ । চন্দ্রচূড় লাহিড়ী, ২০১১

প্রচ্ছদ

বিশ্বরূপ দত্ত, ১৯৬৭

অলংকরণ

সুব্রত চক্রবর্তী, ১৯৮১

কার্যকরী প্রকাশক

সঞ্জয় মুখার্জী, ১৯৮১ । সুব্রত দাস, ১৯৮৩ । সঞ্জয় চ্যাটার্জী, ১৯৮৮

ই-ভার্সন

অমূর্তজয় বসুরায়, ১৯৮৬ । বিমান চক্রবর্তী, ১৯৯৭

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রাক্তনী ছাত্র-সমিতির পক্ষে সভাপতি ডা: তপেন্দ্র মল্লিক দ্বারা ৯/১ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০১২ থেকে প্রকাশিত এবং ইউনিক ফটোটাইপ ৪৯, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ : ৯৮৩১১৬১৯২৬। © সর্বসত্ব সংরক্ষিত

PHONES PBX : (033)
2654-5391 2654-5700
2654-8494 2654-5701
2654-9581 2654-5702
2654-9681 2654-5703
E-MAIL : president@rkmm.org
WEBSITE : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA

MESSAGE

I am glad to learn that Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association will be celebrating its 20th Reunion on 19th and 20th November 2022 and a souvenir 'Abhyudaya' will be published to commemorate the occasion.

While discussing the noble attitude of selfless service Swami Vivekananda said, "In the world take always the position of the giver. Give everything and look for no return. Give love, give help, give service, give any little thing you can, but keep out barter. Make no conditions, and none will be imposed. Let us give out of our own bounty, just as God gives to us."; "Do you ask anything from your children in return for what you have given them? It is your duty to work for them, and there the matter ends. In whatever you do for a particular person, a city, or a state, assume the same attitude towards it as you have towards your children–expect nothing in return. If you can invariably take the position of a giver, in which everything given by you is a free offering to the world, without any thought of return, then will your work bring you no attachment. Attachment comes only where we expect a return."

May by the grace of Bhagavan Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sarada Devi and Swami Vivekananda the programme and the publication be a grand success!

I convey my good wishes to all.

(Swami Smarananda)
President

Belur Math
28th November, 2022

Phone No. 033-2654-5700/5701/5702
Fax : 91-033-2654-4346
E-mail: prabhananda@rkmm.org
Website : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
(The Headquarter)
PO. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711202, INDIA

MESSAGE

28.10.2022

I am happy to learn that the 20th Reunion of the ex-students of the Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith will be held at the Vidyapith premises on the 19th and 20th day of November 2022.

You must be aware that now-a-days I am keeping indifferent health and so I will not be able to attend the programme in person.

I am very delighted to hear that the centre will be releasing the souvenir *Abhudaya* in the inaugural function of the Reunion on 19 November 2022.

I wish the Reunion and the release of the souvenir all success.

May the Holy Trio bless all those associated with the activities of the centre and inspire them to become enlightened citizens dedicated to realising the New India envisioned by Swami Vivekananda.

Swami Prabhananda

(Swami Prabhananda)
Vice President

Sri Sanjoy Chatterjee
Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association

Phone PBX :
(033) 2654-1144 / 1180
(033) 2654-9581 / 9681
FAX : (033) 2654-4346
Email : mail@rkmm.org
Website : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711202
INDIA

Message

I am pleased to learn that Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association is organizing its 20th Reunion at the Vidyapith premises on 19 7 20 November. 2022.

Prayers to Sri Sri Thakur, Sri Sri Maa and Swamiji Maharaj for the success of the function.

Belur Math
24.10.2022

(Swami Suhitananda)
Vice President

Phone PBX :
(033) 2654-1144 / 1180
(033) 2654-9581 / 9681
FAX : (033) 2654-4346
Email : mail@rkmm.org
Website : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711202
INDIA

Message

Belur Math
28-10-2022

Dear Sri Sanjay Chatterjee,

Glad to know that Purulia Vidyapith Alumni Association is going to publish the Souvenir "Abhudaya" on 19 November 2022.

Other than শ্রীশ্রী ঠাকুর ও মায়ের বাণী have no other 'message'.

With love and best wishes,

Sd-
Swami Bhajanananda
Vice President
Ramakrishna Mission
Belur Math, Howrah

Phone PBX :
~~(033) 2654-1144 / 1180~~
(033) 2654-9581 / 9681
FAX : (033) 2654-4346
Email : mail@belurmath.org
Website : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MISSION
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711202
INDIA

MESSAGE

I am glad to learn that Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association is going to organize the 20th reunion on 19 and 20 November 2022 and a souvenir 'Abhyudaya' will be published to commemorate the occasion.

Swami Vivekananda once remarked, "*The faculty of organization is entirely absent in our nature, but this has to be infused. The great secret is absence of jealousy.*" It is wonderful that the Alumni Association of Purulia Vidyapith is holding the reunion in regular intervals which will give a scope to pass on the message of Swamiji to all the alumni and help them to achieve the goal envisioned by him.

Many brilliant boys that the Institute has produced over the years have been well established in the society. Hopefully, the reunion will provide ample opportunities to inspire them to join hands and work together to provide assistance in the development of their alma mater and in addition serve the poor and needy.

May Sri Sri Thakur, Sri Ma and Swamiji Maharaj shower their blessings profusely on all those associated with Purulia Vidyapith.

Suvirānanda

(Swami Suvirananda)
General Secretary

Date: 29 October 2022

RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH

P.O. VIVEKANANDANAGAR, DIST. PURULIA-723147

(A branch centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah, W.B. 711202)

Phone : 9609535336, 6297283340, 7584931517, 7547964485

e-mail: rkmvpurulia@gmail.com / purulia@rkmm.org ; website: www.rkmvpurulia.in

MESSAGE

It is joy unspeakable to welcome the Ex-students of this noble institution to the holy premises of their Alma Mater on the occasion of the 20th Reunion. This cordial invitation besides bearing the traditional warmth has got something that may appear maiden about it as this is an earnest call from the depth of the heart of an alumnus.

In inviting them I find an opportunity to express our sincerest gratitude to them for the way they stood beside us during the COVID-19 crisis. What is more inspiring for Purulia Vidyapith is that the Ex-students have always risen to the occasion and contributed to the development of this institution. This oneness in love with this institution makes us proud and stands as a glaring evidence to the success of education imparted here.

May the students and their families remain in peace and joy is my fervent prayer to Sri Ramakrishna, Holy Mother & Swami Vivekananda.

28 October 2022

Swami Shivapradananda

(Swami Shivapradananda)
Secretary

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

জেমস জয়েসের আধুনিকতাবাদী উপন্যাস *আ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান* আইরিশ বালক স্টিফেন-এর চৈতন্য প্রবাহ (stream of consciousness) নির্মাণ করেছে। বালকের চেতনায় ধরা পড়েছে জেসুইট ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত হোস্টেলের শৈশব। শৃঙ্খলা, শাস্তি, অপরাধবোধ, ধর্ম, দেশাত্ববোধ ও বৈপ্লবিকতা, শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব ও বয়োধর্মে যৌনতার স্ফূরণ। আমাদের বিদ্যাপীঠের শৈশব ও তার স্মৃতি অনেকটাই মনে পড়ে যায়— স্টিফেন-এর যাত্রা, বেড়ে ওঠার কাহিনী, মানসিক ও আত্মিক উন্মেষ সবই কি মিশন–এর ছাত্রজীবনকে মনে করায় না?

শৃঙ্খলা, শাস্তি, অপরাধবোধ, অন্তর্দশন (Joyce এর Epiphany)–এতো একটা Paradigm বা ছক, বেড়ে ওঠার অমোঘ রূপরেখা। কিন্তু বড় একটা পার্থক্যও আছে। স্বামীজির ভাবনায় 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' মানুষকে পূর্ণ ব্রহ্ম কল্পনা করে যে দর্শন সেখানে অপরাধবোধ, guilt and confession–এর স্থান সীমিত।

প্রথমে শৃঙ্খলাই ধরি, তা কখনো মনের শৃঙ্খল তো হয়নি; মনের স্বতস্ফূর্ত উন্মেষকে কখনো কেউ রোধ করেননি। তখন খুব কঠিন শৃঙ্খলা মনে হত, কিন্তু জীবনচর্যায় তা একটা ছাপ ফেলে গেছে। বিশৃঙ্খল জীবন হয়তো মিশনের প্রাক্তনীদের মধ্যে সংখ্যায় গৌণ। শাস্তির ভয় ও অপরাধবোধ, মিশনের বিখ্যাত Court আমরা কি ভুলতে পেরেছি? যাদের নাম উঠেছে আর যাদের ওঠেনি, সবাই পরে সেই নিয়ে আজও আমোদ করি।

এবার ধর্ম। এখানেও আইরিশ রোমান ক্যাথলিসিজম-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়, যে–ধর্ম ছিল রাজনীতিরই নামান্তর। Indian Culture ক্লাসে কালীপদ মহারাজ পড়িয়েছিলেন কঠোপনিষদ। ওই শৈশবেই নচিকেতার মৃত্যু সম্পর্কে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন আমাদের তন্ন তন্ন করে ভাবিয়েছিল। মিশনে উপনিষদের উপর বরাবরই প্রাধান্য। উপনিষদকে ধর্ম, দর্শন, নীতি কোন নামেই পুরোপুরি বোঝান যায় না। যবে থেকে মানুষ আছে, তার আধ্যাত্মিক প্রশ্ন আছে। আর উনি পড়িয়েছিলেন: শ্রদ্ধা কাকে বলে। আজও তো নিয়ত সম্মুখীন হচ্ছি অশ্রদ্ধার। হবেই তো। সবাই তো মহারাজের ক্লাস করেননি। দীপাঞ্জন সেদিন প্রণাম করলে আটকেছিলাম। মাত্র এক দশকের ছোট। বলল 'কেন করব না'? উত্তর দিতে পারিনি। মিশন তো শিখিয়েছে শ্রদ্ধা করতে। কিন্তু এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করতে গেলে নিজেকে তার যোগ্য করে তোলা কঠিন কাজ।

এখন anglicised সমাজে প্রণাম চলে না। ইউরোপীয় ভাবনায় অহং বা ego, যার ভাল নাম bourgeois self-respect, খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তো সংকর, দোআঁশলা। আমাদের hybrid সংস্কৃতি। কোন্‌টা নেব, কোন্‌টা ফেলব?

স্টিফেন-এর রূপরেখাটাই অনুসরণ করছি।

শিল্প ও নন্দতত্ত্ব–সুনীল পাল, রামানন্দদা, পাঁচুদা, বিশ্বরূপদা। মিশনের গেট থেকেই শুরু হয়ে গেল অসামান্য সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পনির্মিতি। ঢুকেই প্রার্থনাগৃহ, যার চূড়ায় পঞ্চবটী, তারপর সারদা মন্দির। ছাত্র প্রতিপদে শিল্পের সম্মুখীন হয়। তার জীবনচর্যায় শিল্প কোন বিকল্প নয়, অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। কীভাবে এসব সৃষ্টি হল তার অদ্ভুত বিবরণ আছে এই সংখ্যায় শ্রী সুনীল পালের লেখায়, কিন্তু যা নেই তা হল–শিল্পের কী সুষম শান্ত প্রভাব পড়ে ক্রমবর্দ্ধমান চৈতন্যে। সেটা আছে আমাদের প্রতিটি প্রাক্তন ছাত্রের উপলব্ধিতে।

স্টিফেন–এর বেড়ে ওঠার গল্পে এক বড় অংশ যৌনতার অনুভব আর তার ফ্রয়েডীয় উত্তরণ বা Sublimation। যদ্দূর মনে পড়ে আমাদের শিক্ষকেরা biological reproduction পড়িয়েছিলেন, কিন্তু ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনা

শিক্ষাবহির্ভূত ছিল। ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ যেমন সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছিল, তেমন নতুন উপবীতি ছাত্ররাও সাধুদের সঙ্গে একাদশীর খাওয়া খেতাম। ব্রাহ্মণ সন্তানরাই আরতি করত– কিন্তু কখনো মনে হয়নি এখানে বর্ণভিত্তিক বৈষম্য আছে। প্রার্থনাগৃহের সামনে গায়ত্রীমন্ত্র খোদিত সূর্য সকলের জন্যই ভাস্বর হয়েছিল।

খেলাধূলা–ধুলোখেলা– যে-কোনো মিশনের ছাত্র খেলার বিস্তৃত অঙ্গনের সৌভাগ্যে ভাগ্যবান–খেলাধূলার ও শরীরচর্চার সম্মান পড়াশোনার থেকে বেশি বই কম ছিল না। সুশীল ঘোষদা তো এক প্রেরণা ছিলেন। Drill competitionএ আমার প্লাটুন শিবাজী পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল–সেটাও তো এক identity– শিবাজী প্লাটুন–এর সদস্য!

প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিকতা– বিশেষ কিছু বুঝতাম না, ধুতি পরে যাওয়ার আনন্দ, অবচেতনা এক ভারতীয়ত্ব। সঙ্গীতের আকর্ষণ, ধুনোর গন্ধ, তিনবার জয়ধ্বনি দিয়ে আলো নেভানো, ধ্যানময় অন্ধকার! যে পাখেয়াজ বাজাত সে হয়তো আজ প্রমোটার হয়েছে, আর যে ভজন গাইত সে ব্যবসায়ী। কিন্তু সঙ্গীত তাদের ধমনীতে বইছে–খন্ডন ভব বন্ধন।

সাধু ও অসাধু– সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য–উপনয়নের সময় দন্ডী ধরে এক পা বেশি হেঁটে ফেললে সন্ন্যাসী হতে হয়। মায়ের খুব ভয় ছিল আমি এক পা বেশি হেঁটে সন্ন্যাসী হয়ে যাব! কিন্তু আমি সেই পা ফেলিনি—সৈকতেশদা ফেলেছে।

আরো লক্ষ লক্ষ সাধু, ভারতে পা ফেলেছেন। 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি'— আবার 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।' মিশনের থেকে বেরিয়ে তার সমালোচনা, বিরোধিতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখন সমাজের মূল ঝোঁক সংশয়বাদ ও শ্রদ্ধাহীনতায়। ঠাকুর তো বলতেন 'সাধু সাবধান'। সেই সমালোচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ যা আত্ম-সমালোচনা। চরৈবেতি চরৈবেতি। চারণ, পরিভ্রমণ, এগিয়ে চলা জীবের ধর্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম, মানুষের ধর্ম, dialectic-এর ধর্ম– বিরোধ ও দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া।

লেখাটা ছড়িয়ে গেল। আসলে অভ্যুদয় তো শুধুমাত্র ম্যাগাজিন নয়— 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে, বিরাট শিশু, আনমনে'। চৈতন্যের অভ্যুদয়, মনীষার অভ্যুদয়, আত্মজ্ঞানের অভ্যুদয়, স্থিতপ্রজ্ঞের অভ্যুদয়, ছাত্র, প্রাক্তনী, শিক্ষক, সাধু, বিদ্যাপীঠের অভ্যুদয়। তার সম্পাদকীয় তাই ঠিক লেখা গেলনা। হয়তো যায়ও না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়, তিন বছর পর অভ্যুদয় বেরোচ্ছে– বহু ভাই, দাদা, শিক্ষক ও সাধুকে আমরা হারিয়েছি। মহামারীর দৌলতে প্রয়াণলেখ বা অবিচুয়ারী বিভাগটি স্থূল হয়ে উঠেছে। এলিয়ট যেমন বলেছেন 'I had not thought death had undone so many.' কিন্তু এখানেই শেষ নয়–তাই তো পুনরভ্যুদয়। ভাইয়ে ভাইয়ে প্রীতির শৃঙ্খলাবন্ধন– খন্ডন ভব বন্ধন।

ড. নিরঞ্জন গোস্বামী

১১.১১.২০২২

সূচীপত্র

অতিমারির কবলে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ : আনন্দ-বেদনার স্মৃতি	স্বামী শিবপ্রদানন্দ	১
নস্ট্যালজিক	স্বামী শিবপ্রদানন্দ	৪
প্রবীণ ঈশ্বর	শান্তি সিংহ	৫
যাত্রাপথের আনন্দগান	বিশ্বরূপ দত্ত	৬
বোধ	দেবাশিস মণ্ডল	১৪
'গুরু' মস্তিষ্কে বিদ্যাপীঠ	শেখ তৌফিক ইসলাম	১৫
আমার অনুভূতিতে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ	অলোক সরকার	১৮
স্বামী বিবেকোনন্দ ও ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চা	জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য	২১
প্রাণ	ডা. নবারুণ ঘোষাল	২৪
রহস্যময়ী রূপকুণ্ড	ডা. শান্তনু মিত্র	২৮
এক্সকার্সনের গল্প	সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়	৩৩
কিছু মায়া রহিয়া গেল	তুহিনাভ মজুমদার	৩৫
বিদ্যাপীঠই নাটের গুরু	সুপ্রিয় দত্ত	৩৮
অবাক দুধপান	সুব্রত চক্রবর্তী	৪১
অবলুপ্তির পথে পুরুলিয়ার জৈন ইতিহাস	তাপস দাঁ	৪৩
কবিতার বিদ্যাপীঠ: বিদ্যাপীঠের কবিতা	ডা. রজতকান্তি সিংহচৌধুরী	৪৭
বহ্নি - শিখা	চিন্ময় দাস	৫৬
রামনাম	দেবাশিস ঘোষ	৬১
'পানিপথ'-এর চতুর্থ যুদ্ধ	অগ্নিমিত্র বিশ্বাস	৬৫
তাই লিখি যা আসে মনে	কৌস্তুভ মুখার্জী	৬৮
বিচার	বিস্ময় রায়	৭১
পর্দা জুড়ে ও কার হাত?	প্রসেনজিৎ সিংহ	৭৮
পরশমণি	চিরন্তন কুন্ডু	৮১
রাজীব বারিকের রেডিও	বিশ্বজিৎ রায়	৮৪
ইস্কুলবেলার শারদীয়া	অভিষেক চ্যাটার্জী	৮৬
স্মৃতি-স্বাদ-সঞ্চয়িতা	শিশির রায়	৮৯
থার্ড আম্পায়ার	দেবজ্যোতি মিত্র	৯২
স্পটলাইট	দেবপ্রিয় সমাদ্দার	৯৫
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?	শুভ্রকান্তি চক্রবর্তী	১০০
হগওয়ার্টস এক্সপ্রেস	শারদ্বত মান্না	১০১

বর্ণমালার গল্প	চিন্ময় গুহ	১০৪
পড়ার বইয়ের বাইরের পড়া	পৃথু হালদার	১০৮
স্মৃতিমেদুর বিদ্যাপীঠ	শুভাশিসপ্রসাদ বাগচী	১১১
জন্মজন্মান্তর	সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়	১১২
চক্রব্যূহ	ড. নিরঞ্জন গোস্বামী	১১৩
মধুপথ	অরূপানন্দ মুখার্জি	১১৪
এবার পুকুর মরছিল	সুমন মুখোপাধ্যায়	১১৫
পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে আমার শিল্প-প্রচেষ্টা	সুনীলকুমার পাল	১১৬
Our Vidyapith	Swapan Bandyopadhyay	১৪১
Review of 'Esecho Jyotirmoy'	Md. Anwarul Haque	১৪২
Humanistic Training in Writing and Renaissance Pedagogy	Dr. Niranjan Goswami	১৪৫
Autism Creates: An Inspirational Journey	Dr. Somnath Sengupta	১৫১
Charaiveti: Keep Walking, Keep Moving	Aloknath De	১৫৪
Honour-bound with Vidyapith	Debasis Ray	১৫৭
A Musing	Mangsatabam Harekrishna	১৬০
Those Selfless Shepherds of My Childhood	Debasis Chatterjee	১৬৩
Vidyapith: Classroom Memories	Arupratan Daripa	১৬৫
Income-Tax — Uri Baba	Sanjay Mukherjee	১৬৮
Vignettes	Subrata Sar	১৭২
The Gaudiya Vaishnavite Exuberance in Manipur – Tangible and Intangible Inheritance	T. Bhabeswar Singh	১৭৪
A Tribute to John Keats (1795-1821)	Rajat K S Chowdhury	১৭৮
IPR in Education	Pinaki Ghosh	১৭৯
Deben Bhattacharya : Traveller of the Tune	Sugata Guha	১৮৯
The Blue & White Boys on the Sweet Bengal Trains	Subrato Chaudhuri	১৯২
Targeted Radionuclide Treatment and Theranostics in Cancer: A few illustrative examples	Sandip Basu	১৯৭
Safer Internet – By the People, of the People, for the People	Dr. Partha Das Chowdhury	২০৩
Spirituality, Surgery and Adivasi Consciousness: A Journey Intertwined	Sisir Sagen Murmu	২০৭
Letters from the Ghats	Manas Sarkar	২০৯
The Letters of Swami Vivekananda: The Panacea of Modern Indian Society	Chandrachur Lahiri	২১৪

অতিমারির কবলে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ : আনন্দ-বেদনার স্মৃতি

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

কোভিড-১৯ অতিমারি পৃথিবীর জনজীবনে এক গভীর আঘাত হেনেছিল। জনজীবনকে স্তব্ধ করে তার তাণ্ডব একদিকে যেমন তীব্র ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তেমনি স্বাভাবিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কবে এবং কীভাবে নির্মূল হবে তার ইয়ত্তা এখনই করা সম্ভব নয়। অতিমারির ক্ষত আজও নীরবে রক্তক্ষরণ করে চলেছে।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের স্বাভাবিক জীবন সরকারি নির্দেশনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা সকলেই বাড়ি চলে যায়। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মিবৃন্দ অনেকেই তাঁদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। জনাকয়েক কর্মী সম্বল করে বিদ্যাপীঠের সাধু-ব্রহ্মচারীগণ আশ্রম-জীবন রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে অন্তর্জালের (Online) মাধ্যমে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়াও ছাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও তাঁরই উদ্যোগে পরিচালিত হয়। গৃহবন্দি অবস্থায় ছাত্রদের সুস্থ থাকার নিদান হিসাবে স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষকদের সাহায্যে যথাযথ নির্দেশনা দেন।

অতিমারির সময় বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের মাসিক বেতন ছিল ৩৩০০ টাকা। খাওয়া ও আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে অভিভাবকদের মাসে ১৪১০ টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অভিভাবকদের অধিকাংশের কাছ থেকে তেমন সাড়া না পাওয়ায় বিদ্যাপীঠ পরিবার প্রবল আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়। কারণ বিদ্যাপীঠের কর্মীদের (১৯৩ জন) প্রতি মাসের মাইনে দিতে গিয়ে আর্থিক অনটন তীব্র আকার ধারণ করে। অথচ সেই দরিদ্র পরিবারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায় বিদ্যাপীঠ সানন্দে বহন করতে থাকে। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ স্থায়ী আমানত ভেঙে সেই কাজে অগ্রসর হয়েছিল। একটি আর্থিক বছরের (২০২০-২০২১) শেষে দেখা যায় যে প্রায় ১৫,০০,০০০ অধিক টাকা ঘাটতি থেকেছে। কোন সূত্রে বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ জানতে পেরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতায় সে-যাত্রায় আর্থিক ঘাটতির হাত থেকে বিদ্যাপীঠ রক্ষা পায়।

সেবা কর্মিবৃন্দ

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সংলগ্ন ও দূরবর্তী গ্রামগুলির খেটে খাওয়া মানুষের রুজির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নির্দেশে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সাধু-ব্রহ্মচারী, কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও শিক্ষক এবং কল্যাণ জেলা-যুবসংস্থার স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ ত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়াও স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ, স্বামী ভূদেবানন্দ প্রমুখ কয়েকজন ত্রাণকাজে সামিল হয়েছিলেন। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ থেকে প্রকাশিত একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৮,৪৫,৭১০ টাকা সংগৃহীত হয়। ত্রাণের জন্য প্রাপ্ত এই বিপুল অর্থের সিংহভাগ পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের

প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ আন্তরিকভাবে দান করেছেন। তার মধ্যে বিদ্যাপীঠের তরফ থেকে ১৩,৩৮,৪২৫ টাকা ত্রাণ কাজে ব্যয় করা হয়। পরে উদ্বৃত্ত ১৫,০৭,২৮৫ টাকা বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিদ্যাপীঠের মাঠে একাকী কাশফুল

কোভিড-১৯ ত্রাণকার্যের বিস্তারিত বিবরণ :

কোভিড-১৯ ত্রাণকার্যে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের আবাসিকবৃন্দ বিগত ২ এপ্রিল ২০২০ তারিখ থেকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ২১ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সংলগ্ন গ্রামগুলিতে বিশেষকরে বোঙ্গাবাড়ি, চুনারডি, ফতুকডি, হাতুয়াড়া, পোতনাড়া, সুরুলিয়া, ধুরহি, বিরগিড়ি গ্রামে চাল, ডাল, আটা, চিড়া, আলু, গরুর দুধ,

সরষের তেল, সোয়াবিন, লবন, হলুদ, বিস্কুট, সাবান এবং দূরবর্তী অঞ্চলের চিতরা, মালথোড়, খৈরিপিহিড়া, হাড়ামজাঙ্গা, চাকড়া, মিশিরডি, শিরকাবাদ ও জালিকা গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে দুই সপ্তাহের জন্য চাল, ডাল, লবণ ও সাবান বিতরণ করা হয়। যার ফলে ৪৬৬৭ টি পরিবারের প্রায় ১৮,৬৬৮ জন উপকৃত হয়েছিলেন। সেনাবোনা ও কোটশিলা অঞ্চলে নাচনি ও ঝুমুর শিল্পী, চাটানিপাড়ার কিছু শ্রমজীবী মানুষ এবং আড়শা সিধু-কানহু অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের জন্য তিন সপ্তাহের ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়, যার ফলে ৩৩৭ টি পরিবারের (১২৫৮ জন) কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ডাবর-বলরামপুর অঞ্চলের নব কুষ্ঠাশ্রমের ৪০ জন আবাসিকের দুই সপ্তাহের জন্য ও কালিন্দীপাড়া (ধবঘাটা), ভাঙ্গড়া, বিলতোড়া, পিড়লগোড়া গ্রামের ১৪ টি পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আটা, সরষের তেল, লবন, হলুদ, বিস্কুট ও সাবান তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলত আরও ২১৬ জন মানুষ ত্রাণসামগ্রী লাভ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতায় গত ১০, ১১ ও ১২ মে ২০২০ মহুলটাঁড়, বারেরিয়া, ভূপতিপল্লি, কলাবেড়া, বেরসা, লটপদা, তালাডি, ফুলঝোড়, হিজলা, জিলিং, ভালুকডি, দামোদরপুর, ভূতাম, কুলাবহাল, অকড়বাইদ, জবলা-সুয়ালা, জবলা-বেলাবাইদ, বাসাপাড়া, কেলারডি, মাকেরকেন্দি, কুদা, পিটিদিরি ও জাহাজপুর বেদিয়াপল্লি গ্রামে শবর, বীরহোড়, পাহাড়িয়া, মাল, কালিন্দী, সর্দার ও বেদিয়া তফসিলী উপজাতির ১০০০ টি পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, মুড়ি, সরষের তেল, বিস্কুট, সাবান বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০০০ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

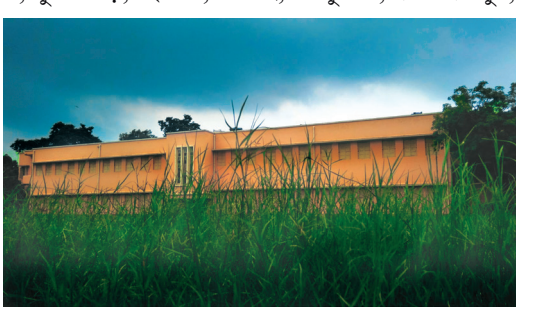
ঘাসে মুখ ঢেকেছে ছাত্রাবাস

সামগ্রিকভাবে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে জেলার ২৪,১৪২ জন প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী লাভ করেছেন।

ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করা ছাড়াও স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক প্রচার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। এই কাজে 'কল্যাণ' (পুরুলিয়া-জেলা-যুবসংস্থা) প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত

জনশিক্ষণ সংস্থানের কর্মিবৃন্দ পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। 'কল্যাণ' সংস্থার কয়েকজন আধিকারিক ও কর্মী ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পুরুলিয়া জেলার সিধু-কানহু-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যৌথভাবে কিছু পরিমাণ স্যানিটাইজার প্রস্তুত করে ত্রাণকার্যের সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য প্রদান করেছেন।

সচেতনতা শিবির

কোভিড-১৯ ত্রাণকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র মুফতি সামিম সৌকত, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ), পুরুলিয়া জেলার কয়েকটি ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক এবং মফসসল থানাসহ অন্যান্য থানার পুলিশকর্মিবৃন্দ সহযোগিতা করেছেন। ত্রাণকার্য পরিচালনায় আর্থিক সাহায্য করেছেন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন ছাত্র, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ, বিদ্যাপীঠ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ব্যক্তিবর্গ।

ত্রাণ সামগ্রী

কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় তরঙ্গ পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের জনজীবনকে নাড়া দিয়ে যায়। প্রধান শিক্ষক মহারাজসহ কয়েকজন সন্ন্যাসী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী কোভিডে আক্রান্ত হন। বিদ্যাপীঠ স্বাস্থ্যদপ্তরের আন্তরিক চেষ্টায় সকলে ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কোভিড-১৯-এর নিষেধাজ্ঞা রদ হওয়ার পর বর্তমান ছাত্রবৃন্দ বিদ্যাপীঠে ফিরে আসে। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের তরফ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের জেলা সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগের সহযোগিতায় গণটিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও প্রবীণ আশ্রমিকদের টিকাকরণ পুরুলিয়া জেলা হাসপাতালে সম্পন্ন হয়।

অতিমারীর স্তব্ধ সময়ে বিদ্যাপীঠ পরিবার কখনও নিঃসঙ্গবোধ করেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ আশীর্বাদ নিরন্তর অনুভূত হয়েছে। বিদ্যপীঠ পরিবার সেই পরিসরে অনেক প্রাক্তন ছাত্র ও পরিজনকে হারিয়েছে। তাঁদের অভাব পূর্ণ হবার নয়। তবু বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীরা যেভাবে তাঁদের মাতৃসম প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা ও সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। এজন্য বর্তমান সময় ও অনাগতকাল তাঁদের অবশ্যই কুর্নিশ জানাবে।

সেবার অর্ঘ্য

লেখক প্রাক্তনী, ১৯৭৬ (উ. মা.), বর্তমান সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

নস্ট্যালজিক

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একা আমি
আশেপাশে নেই কেউ
চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে থামি
শ্মশানে ডাকছে ফেউ

একদিন পাতা ঝরে যাবে তাই জানি
তো যাক্।
আগুনের খিদে সবাই আসলে মানি
পুড়ে খাক।

সময়ের স্রোতে মুছে যায় সব রং
কথাটা আদৌ ঠিক?
কেন না মনের সজীব স্মৃতির সঙ
আজও নস্ট্যালজিক।

লেখক প্রাক্তনী, ১৯৭৬ (উ. মা.), বর্তমান সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

প্রবীণ ঈশ্বর

শান্তি সিংহ

নিন্দা–প্রশংসা পাপ–পুণ্যের জিগির আমার কাছে তুলো না।

ওয়েলস আগেই তো বলেছেন : ঈশ্বর শেষ বিচারের দিনে
অ্যাবেল, সেন্ট পল বা সব্বাইকে নির্বিকার মনে
অথবা পরম কৌতুকে জামার আস্তিনে তুলে নেন।
এ্যাতো ছোট্ট পৃথিবী নামের গ্রহটি
ক'শ কোটিই বা মানুষ!
নগণ্য জীববিন্দুগুলির নির্জলা স্তুতি বা নির্মম নিন্দায়
মহিমময় মহাপ্রাণের কীই বা আসে যায় !

আবার সেই প্রবীণ ঈশ্বর লীলার স্বাচ্ছন্দ্যে ছড়িয়ে দেন জীববিন্দুকে
নতুন জীবনকে চাখবার জন্য— অসংখ্য আলোকবিন্দু অজস্র ধারায় পৃথিবীতে ঝরে পড়ে
মনুষ্যপ্রজাতির নবায়মানতায়
গ্রহটি উল্লাসে উচ্চকিত হয়...
অলক্ষ্যে ধ্যানী ঈশ্বর কচিৎ কৌতুহলে
দেখেন ছোট্ট জীববিন্দুগুলির বিচিত্র সঞ্চরণ!

লেখক প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠিত কবি

যাত্রাপথের আনন্দগান

বিশ্বরূপ দত্ত (১৯৬৭)

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(আলাপ)

চিত্র: ১

ধর্ম হচ্ছে শুদ্ধতম বোধ, সান্ত নিবিড় তন্ময়তা...অনন্য উপলব্ধি। সত্য সুন্দর আনন্দ স্বরূপের কাছে বিনম্র আত্মনিবেদন। সান্ত থেকে অনন্তে উত্তরণ। শিল্প-সংস্কৃতি আমাদের জীবনছন্দ বা নিত্য জীবনের ছন্দময়তা। আর জীবন হচ্ছে পূর্ণতার লক্ষ্যে অন্তবিহীন পথ চলা।

শিল্পের আশ্রয়ে আজীবন লালিত আমি, আমৃত্যু সেভাবেই থেকে যেতে চাই। শিল্পই আমার দীপ্র জীবন ধর্ম। সারা জীবন সেই ধর্মাচরণেই আমি অবিচল ও স্থিতধী হতে চাই। আত্মদীপনের উদ্‌ভাসে, প্রদীপ্ত চেতনার উন্মেষণে, সংবেদী মন ও মননে, নন্দন চেতনার আলোকে অন্তবিহীন পথচলা হয়ে গেল অনেকটা সময় জুড়ে। আরও কিছুদিন এভাবেই সৃজনে এবং পরম আনন্দে কাটিয়ে আমার মুক্তি হবে এই আলোতে, এই আকাশে।

সত্য সুন্দর আনন্দ স্বরূপের প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে জীবনে যা কিছু অর্জন করেছি, তাই অঞ্জলিভরে গ্রহণ করেছি। কোনো অভাববোধ, নৈরাশ্য বা মলিনতায় মনকে দীর্ণ করিনি। নিরন্তর পূর্ণতার অনুভবে, রসানুভূতির গভীরতায় ঋদ্ধ হয়েছি।

জীবন সুন্দর, জীবন মধুময়। তাই জীবনকে ভালোবেসে, মানুষকে ভালোবেসে নিঃশেষ হয়ে মানুষের ভালোবাসাতেই অশেষ হতে চেয়েছি আমি।

আসলে প্রাত্যহিক জীবনচর্চা এবং শিল্পচর্চা চিরদিনই আমার এক ও অভিন্ন। সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পদ, মানসিক সম্পদ বা মানসবৈভবেই নিরন্তর সমৃদ্ধ হতে চেয়েছি। আমার এই অনুধাবন, আত্মানুসন্ধান এবং শিল্পপ্রজ্ঞাই আমার ব্যক্তিজীবনকে গরিমাময় করেছে। হয়ে উঠেছে অপরিমেয় জীবনীশক্তির রমনীয় উৎসমুখ। উন্নততর সৃজনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সুন্দরতর মানুষ হয়ে ওঠা আর সহস্র বন্ধন মাঝেই মহানন্দময় মুক্তিলাভের প্রয়াস ও অমৃত বাসনাই আমার সারাজীবনের ব্রত ও তপস্যা।

শিল্প চর্চা মানে তো শুধুই ছবি আঁকা, ছবিদেখা, ছবি নিয়ে ভাবা নয়; সমস্ত জীবনটাকেই —এই বিশ্ব চরাচরকে নন্দনচেতনার প্রদীপ্ত আলোকে দেখা। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে শিল্প সুষমায় সুন্দর করে তোলা। ইতিবাচক মন ও গঠনমূলক, সৃজনঋদ্ধ মননে, পরমানন্দে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন করা। জীবন-শিল্পেই নিবেদিত প্রাণ হওয়া।

স্ফটিক-স্বচ্ছ একটি সহজসুন্দর নির্মল জীবনের অভিমুখে আমার প্রাত্যহিক জীবনচর্চা এবং নিত্যদিনের শিল্পচর্যা তাই এক ও অভিন্ন।

অধ্যাত্ম গুরুকরণ করিনি আমি। কিন্তু ইষ্ট বলে যদি কিছু থাকে, তা আমার শিল্প-সাধন, শিল্প-ভাবনা; নন্দন-যাপন। সেই অনুষঙ্গেই পরম মগ্নতায় আমার দিন কাটে, রাত কাটে। আমি নিত্যদিন আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির পরম্পরা-প্রবহমানতায় অবগাহন করে শুচিস্নানে ধন্য হই। হৃদয় আমার অনন্ত আকাশে প্রকাশিত হয়। এই দিব্যচর্যা এবং চর্চা আমার কাছে নিরন্তর অনন্তেরই বার্তা নিয়ে আসে।

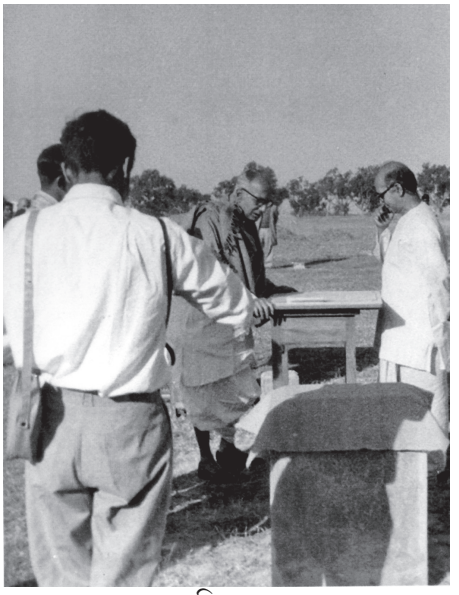

চিত্র: ২

দিব্য শিল্পসাধনার মধ্য দিয়ে আমি মানুষের সংবেদীমন ও প্রদীপ্ত মননকেই ছুঁতে চাই। বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবনের প্রতি নিবিড়, নিমগ্ন ভালোবাসায় প্রকৃতির অকৃপণ দানে লালিত হয়ে অন্তর দিয়ে, অন্তর ছুঁয়ে এ যেন অমল আনন্দে, নিরাসক্ত মনে নিরন্তর দীপ্ত আত্মোপলব্ধি, আত্মউন্মোচন, আত্মউন্মেষণেরই অন্তবিহীন পথে চলা। আর মনের গহনে পবিত্র অনুরণন— 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি'।

আমি প্রতিদিন আপন আসনে স্থিতধী হই। কিছু রেখা টানি, রঙ দি। তারপর সারাদিন তারা আমাকে টানে। একইসঙ্গে আপন অনুভবের কিছু কথা সযত্নে নিজহাতে, নিজস্ব ভাষায় লিখে রাখি যা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকে। এভাবেই একদিন লিখেছিলাম— 'শিল্পী হতে হলে অনুরাগী, আত্মমগ্ন দ্রষ্টা হতে হয়। সাধক হতে হয়। প্রেমিক হতে হয়। সংবেদনশীল, জীবনরসিক মরমী মানুষ হতে হয়।

দৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টির স্বচ্ছতায় মুক্তমনের মরমী মানুষ হতে হয়। কেবলই ঐহিক সুখ; নিছক ভোগ-বিলাস, বিষয়ভাবনা থেকে মনকে প্রতিনিয়ত মুক্ত রাখতে হয়। যেমন সোনার খাঁচায় রাখা পাখিও আসলে আকাশকেই ছুঁতে চায়।' লিখেছিলাম ভিন্নতর প্রেক্ষিতে—

'আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না জেনেও প্রতিদিন
পূর্ণতার লক্ষ্যে অন্তবিহীন পথে চলি।
আকাশ-ভরা সূর্য তারায় করি
অনন্তকে অনুভব। আর
সহস্র বন্ধনমাঝে
মহানন্দময় মুক্তিলাভের অমৃতবাসনায়
আমার সাধনপীঠে
আপন আসনে স্থিতধী হই—
প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি।
নিবিড়ঘন আঁধারে জ্বলে
প্রদীপ্ত ধ্রুবতারা।'

চিত্র: ৩

(বিস্তার)

রামকৃষ্ণ মিশন এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষা এবং সাধনাকে সাধ্যমতো আত্মীকরণ করে, প্রিয়তম লালমাটির বাঁকুড়ার সমৃদ্ধতর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-পরম্পরার এবং পরম রমনীয় লোকায়তের সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্বভূমিতে আপন আসনে স্থিতধী হয়েই এখন আমার আবিশ্ব ভাবনার বিস্তার। সৃজনে, মননে, অনুধ্যানে একান্ত আত্মানুসন্ধান।

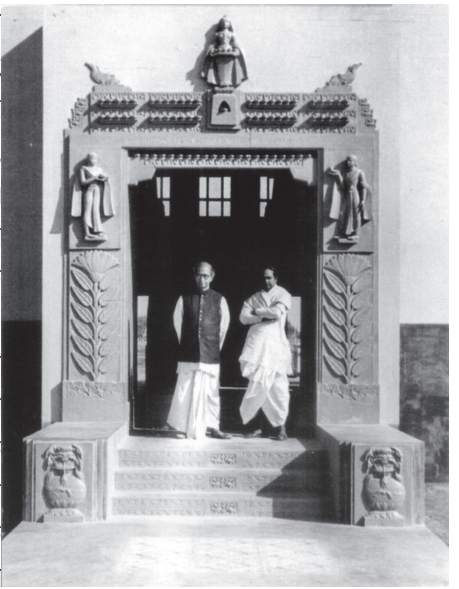

চিত্র: ৪

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে (১৯৬০-৬৩), পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে (১৯৬৪-৬৬/উচ্চ মাধ্যমিক ১৯৬৭) এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষকতার সূত্রে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের দিনগুলি (১৯৭২-৮৩) নিঃসন্দেহে আমার সামান্য জীবনে শ্রেষ্ঠতম সময়, অসামান্য সঞ্চয়। আজ অপরাহ্নবেলায় শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিমেদুরতা। অপরিমেয় সুখস্মৃতি, অপরিসীম আনন্দময় অভিজ্ঞতা; উজ্জ্বলতম মুহূর্তের সেই উদ্ভাস আজও আমার মনোভূমিতে, স্মৃতিপটে সজীব, সতেজ, প্রাণবন্ত।

১৯৬৩ সাল পর্যন্ত দেওঘর (চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী) পুরুলিয়া (নবম থেকে একাদশ শ্রেণী) একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৬৪ সালে দুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হয়। ১৯৫৮ সালে দেওঘর থেকে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রদল নিয়ে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সূচনা হয়। ১৯৬১ সালে যথারীতি প্রথম ছাত্রদল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ১৯৬০ সালে পঞ্চম শ্রেণী থেকে আমার যাত্রা শুরু দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে। ১৯৬৪ সালে নবম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হয়ে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে আসি। বিদ্যাপীঠের তরুলতা তো আজও মনকে মুগ্ধ করেই। হৃদয় মাঝে রচনা করে ‘সোনার স্বপন’।

পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিশ্বজননী, মা সারদাদেবী, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পূত পবিত্র ভাবাদর্শে ও অসীম কৃপাশীষ মাথায় নিয়েই আমাদের প্রতিদিনের পথচলা। সদ্‌ভাবনা, সুচেতনার আলোয় নিত্য আলোকিত; নন্দিত, প্রাণিত হওয়া। অগণিত প্রাজ্ঞ, পুণ্যাত্মা, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দের অকৃপণ, সস্নেহ সান্নিধ্য ও দীপ্র দিক-নির্দেশনা, পরম স্নেহশীল, আত্মনিবেদিত জ্ঞানবান আচার্যগণ নিঃস্বার্থ, সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দ, চিরশুভানুধ্যায়ী মানুষজন ও মরমী অভিভাবকবৃন্দ, দেশ-বিদেশের নানাপ্রান্তে সর্বস্তরের সকল প্রাক্তনীগণ —সবার ঐকান্তিক ভালোবাসা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সম্মেলক প্রয়াস, সহমর্মিতা ও সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের প্রিয়তম প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথ উত্তরোত্তর সুগম হয়েছে। সমৃদ্ধতর, সুন্দরতর হয়েছে।

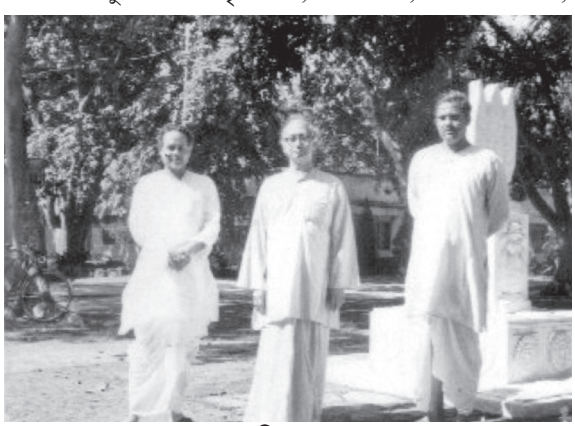

চিত্র: ৫

সকলের উদ্দেশ্যেই আমি যথাযথ প্রণাম, শ্রদ্ধা; শুভেচ্ছা, স্নেহ ও শুভময়তা জানাই।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা গুরুগৃহবাসের অনুষঙ্গ বা আবহে আমাদের প্রিয়তম এই আবাসিক বিদ্যায়তনে সম্মেলকভাবে নিত্য উচ্চারিত হয়—

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌভুনক্তু, সহবীর্যং করবাবহৈ। / তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।। / ওঁশান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

উচ্চারিত হয়—

ওঁ ভদ্রং কর্নেভিঃ শৃণুয়াম দেবা / ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ / স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।

চিত্র: ৬

কিংবা—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ বহ্মণাহুতম্ / ব্রহ্মৈবতেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।

বেদ, উপনিষদ, গীতার এইসব দীপ্ত অনুরণন আমাদের সকল প্রাক্তনীর প্রতিদিনের চলার পথের অবশ্যই সঞ্জীবনী মন্ত্র হয়ে থাকে।

আত্মবিকাশের আবহে, আত্মশক্তির বিকাশে বিদ্যাপীঠ আমাদের মুক্ত মনের আকাশ হয়ে থাকে যেখানে জগতে আনন্দ-যজ্ঞের আমন্ত্রণবার্তা নিত্য ধ্বনিত হয়। অনন্ত প্রেমের বার্তা ঘোষিত হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথায় 'যতমত, তত পথ' মনে রেখে 'মন ও মুখ এক করে' 'শিবজ্ঞানে জীবসেবায় প্রাণিত হওয়া যায়। সুস্থদেহ, সুন্দর মনে চরিত্রবান, উদারচেতা; সংবেদনশীল, জীবনরসিক মরমী মানুষ হবার শিক্ষালাভ করা যায়। ব্যক্তিত্ববান, দৃঢ়চেতা কিন্তু অবশ্যই নন্দনচেতনার আলোয় পরিশীলিত মননে আমরা সদা দীপ্যমান থাকি। জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা, প্রাক্তনীরা আর্তের সেবায়, পবিত্র মানব কল্যাণে সদাতৎপর।

বিদ্যাপীঠ-গীতির অংশবিশেষ স্মরণ করি– 'বিদ্যাপীঠের গগনতলে দীপ্ত আলো জ্বলেরে / সেই আলোকের শিখা বয়ে ছাত্রদল চলে রে / চলবো দেশ-দেশান্তরে ঘুরবো মরু প্রান্তরে / অভীঃ হওয়ার বাণী সাধি নূতন জগৎ গড়বো রে'।।

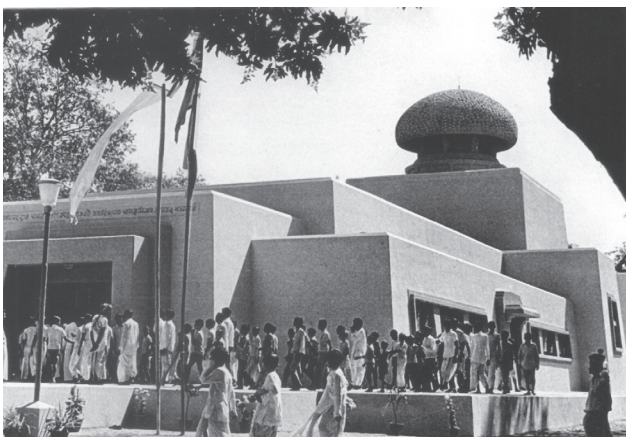

চিত্র: ৭

নানা বর্ণে, ছন্দে, গীতিতে, কথা যাত্রায় পুরানো সব নানা রঙের দিনের কথা, অনাবিল আনন্দঘন মুহূর্তের কথা বলা স্বাভাবিকভাবেই ধারাবাহিক এবং সুদীর্ঘ আলাপচারিতার, বিস্তৃত পরিসরে আলোচনার অপেক্ষা রাখে যদিও তার—

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে.....

ইতিমধ্যে আলোচনার প্রাথমিক পর্বে আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ও উপলব্ধির আলোয় আমার সারাজীবনের বোধ, বিশ্বাস, সাধন, যাপন, নন্দন ভাবনার কথা বলার

চিত্র: ৮

চেষ্টা করেছি। আজ জীবনের অপরাহ্নবেলায় অস্তাচলের ধারে দাঁড়িয়ে যখন পূর্বাচলের পানে তাকাই, অবশ্যই বিদ্যাপীঠের সুশিক্ষা ও সাধনা, শিল্পরূপময় অনাবিল আনন্দঘন দিব্য পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা; বিদ্যাপীঠের মাটি, পুণ্যভূমিই আমার এই শুদ্ধতমবোধ ও দীপ্রচেতনার অন্যতম ভিত্তিভূমি হিসাবে আমার স্মৃতি, সত্ত্বা, চেতনায়, মন ও মননে চির জাগরূক থাকে। সুদীর্ঘ দিনের সংবেদী মননসেতু দৃঢ়তর হয়। চেতনা মন্থনের উজ্জ্বল মুহূর্তে মনেও হয়—'সাধের বিদ্যাপীঠ যে মোদের শোভার নিকেতন....

এই 'শোভার নিকেতন' প্রসঙ্গে আমার বিশেষ কিছু নিবেদন সবিনয়ে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি। একেবারে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আশ্রমের রূপ ও বিকাশ; বহিরঙ্গের সুপরিকল্পিত, সৃজনঋদ্ধ, মননশীল রূপারোপের পুণ্যদর্শন নিঃসন্দেহে আমার জীবনে, সৃজনভাবনায় নন্দন যাপনে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। দৃষ্টির দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে, শ্রুতি নন্দন আবহে, সুচেতনার দীপ্তিতে চিরসুন্দরের প্রতি নিবেদিত প্রাণ হবার এক অমল অধ্যায়। দৃষ্টি এবং অন্তরদৃষ্টির স্বচ্ছতায়, অন্তর্লীন শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং আত্ম-নির্ভরতার শিক্ষা ও দীক্ষায় সেই হয়ে ওঠার দিনগুলিতে স্বপ্নময় কৈশোরকে বর্ণময় দীপ্তিময় করে তোলার অমূল্য সুযোগ পাই। চেতনা মন্থনের উজ্জ্বল মুহূর্তগুলিতে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজের মূল ভাবনা এবং রূপ কল্পনা যার সার্থক রূপদান করেন প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী সুনীল পাল এবং স্বনামধন্য চিত্রকর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুপম স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে দেওয়াল চিত্রে, ভিত্তি চিত্রে, নানা প্রাচীন শিল্প বস্তুর সমাহারে; দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনায়, উদ্যান পরিকল্পনায়, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের নক্সায়, মঞ্চস্থাপত্যে, নানা উৎসব অনুষ্ঠানের সজ্জা ও যথোপযুক্ত আবহ রচনায়; সুপরিকল্পিত মনন এবং অন্তর্লীন ব্যঞ্জনায় ধীরে ধীরে বিদ্যাপীঠের সামগ্রিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক এক অনন্য রূপসাগর হয়ে ওঠে। মহারাজ একান্তভাবে চাইতেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশীয় এবং মানবশিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে একান্ত হয়ে, সুন্দরের সঙ্গে নিত্য বসবাসের মধ্য দিয়ে পরম সুন্দর মনের অধিকারী হয়ে পরিশীলিত রুচির মানুষ হয়ে উঠি। পরবর্তী জীবনে জীবন-শিল্পেই নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠি।

পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজীর ব্যক্তিত্ব, বৈদগ্ধ্য, অসীম পান্ডিত্য এবং বিস্ময়কর শিল্পপ্রজ্ঞা—উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং অমৃতকথন আমার স্মৃতিপটে আজীবন ভাস্বর হয়ে থাকবে। পরম শ্রদ্ধেয় সুনীল দা এবং রামানন্দদার অপার স্নেহ, উজ্জ্বল সান্নিধ্য; অপিরসীম রসবোধ, শিল্পদৃষ্টি আমাকে নিত্য উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত করে। মহারাজের অনন্য ভাবনা এবং দিব্য দর্শনের রূপায়ণে সুনীলদা এবং রামানন্দদার আত্মমগ্ন যুগলবন্দী অনেকটাই আমার সচেতনভাবে দেখা, ক্ষেত্রবিশেষে সঙ্গে থাকা অবশ্যই আমার পরম শিল্পপাঠ গ্রহণের দীপ্র অভিমুখ এবং অসীম অমূল্য সঞ্চয় হয়ে আছে।

চিত্র: ৯

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"ওরে আমাদের আর্ট যে ধর্মের একটা অঙ্গ।

ঠাকুর নিজে কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন।'' বলেছেন— 'চারুকলা, বিজ্ঞান, ধর্ম– একই সত্যকে প্রকাশ করে।.... শিল্প-স্থাপত্য- ভাস্কর্যে কলার আত্মমগ্ন অনুধ্যানে স্বামীজী মগ্ন থাকতেন। তাঁর প্রদীপ্ত বিশ্বাস ছিল— 'ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল বিদ্যা-পরা ও অপরা এবং ভাবের ভেতরেই প্রাণ সঞ্চার করতে।' শিল্প একটা প্রধান বিদ্যা। স্বামীজী চাইতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে কেন্দ্র করে ভারত শিল্পের নব জাগরণ ঘটুক। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর ভাবনায়, রূপকল্পনায়, সুনীলদা, রামানন্দদার স্বতন্ত্র সৃজনশীলতায়, বিনম্র আত্ম-নিবেদনে সেই অমৃত সুরের ধারাই নিত্য প্রবহমান।

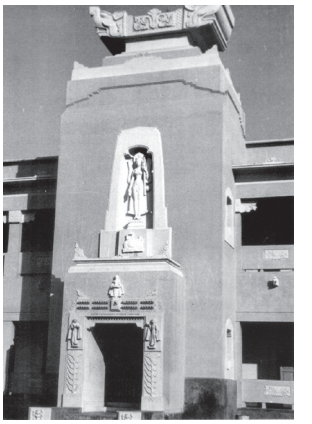

চিত্র: ১০

আচার্য নন্দলাল বসু বলেছেন— ''শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর IDEAL শিল্পের Back Bone-এর মত, যার অভাবে শিল্প নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে Aesthetics পথের সাধন ও পূর্ণতা। আর ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের) ছিল Aesthetics -এর পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণ অনুভবের বিকাশ।'' (গ্রন্থসূত্র- শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প দীপঙ্কর নন্দলাল – বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী)

বিদ্যাপীঠের পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে একান্ত আলাপচারিতার উজ্বল মুহূর্তে মহারাজের সেই দৃপ্ত উচ্চারণ— ...আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। – আজও আমার পায়ে চলা পথে; শিল্পযাপনে অনন্য, দিব্য দিক্‌দর্শন। প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা।

একান্ত মানসভ্রমণে আমাকে নিত্য প্রাণিত করে অনুপম শিল্পসম্ভারে পূর্ণ ও সমৃদ্ধ বিদ্যাপীঠের স্বতন্ত্রভুবন। সুনীলদার অবিস্মরণীয় স্থাপত্যকলা —প্রধান প্রবেশদ্বার, 'দেবযান'–প্রধান কার্যালয় সংগ্রহশালা, সভাগৃহ, শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির, সভাবেদী, নিবেদিতা কলা মন্দির, সারদা মন্দির, স্বদেশবেদী, বিবেকমন্দির, গ্রন্থাগার, শিবানন্দসদন; বিভিন্ন রিলিফ ওয়ার্ক সারদা মন্দিরের ভেতরে শ্রীশ্রীমা সারদার পূর্ণাবয়ব চিত্র বিশেষভাবে স্মরণ করি। অন্যদিকে বিদ্যাপীঠের প্রধান প্রবেশপথের দরোজার অনুপম নক্সা থেকে রামানন্দদার শিল্পকর্ম– অতিথিভবনে পুরুলিয়ার লোকায়তের আবহে ছন্দময়, অনাবিল আনন্দময় ভিত্তিচিত্র, প্রধান কার্যালয়ে অধ্যক্ষমহারাজের বসার ঘরের চার দেওয়ালে হিরন্ময়ানন্দজীর নির্বাচিত উপনিষদের বিশেষ বিশেষ অংশ অবলম্বনে ভিত্তিচিত্র, সভাঘরের প্রবেশ পথে জয়পুরী ভিত্তিচিত্র– পদ্মসরোবর, সারদামন্দির ও খাবার ঘরের ভিত্তিচিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্র: ১১

নিবেদিতা কলামন্দিরে কণ্ঠসংগীত চর্চা কক্ষে আছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে অসাধারণ দেওয়াল চিত্র; স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত বার্ষিকীতে (১৯৬৩) রচিত। এসব কিছুই আমার নিত্য অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎসমুখ। সানন্দ যাত্রা পথের মহার্ঘ পাথেয়, অনন্য মানসবৈভব।

আমাদের জ্ঞানপীঠ, প্রধান বিদ্যালয়ভবন 'সারদা মন্দির' প্রসঙ্গে কিছু কথা স্বতন্ত্র ভাবে বলতে চাই। এই ভবনের সামগ্রিক রূপ কল্পনা এবং সুনীলদার অনবদ্য রূপারোপ

চিত্র: ১২

প্রসঙ্গে পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজীর স্বকণ্ঠে ভবন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শোনার অসামান্য সুযোগ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। প্রধান প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে এক সময় মহারাজ বলেছিলেন আত্মমগ্নমননে আপন অনুভবের কথা। বলেছিলেন— 'মকর রাশিস্থে ভাস্করে'..... এইসময়, শ্রী পঞ্চমীতেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনা করতে হয়। একেবারে ওপরের অংশে তাই মকর এবং সূর্যমুখী ফুল সহ প্রতীকী অলংকরণ করা হয়েছে। দেবী সরস্বতী অপরূপ ভঙ্গিমায় নেমে আসছেন। ভক্তের হৃদয়পদ্ম বিকশিত হচ্ছে তাঁর পদস্পর্শের প্রতীক্ষায়। তাই দেবীর পদযুগল এখনও তা স্পর্শ করেনি। উত্তরে মানস সরোবরের দিকে মুখ রেখে দেবীর পদতলে হংসের অবস্থান। তার নীচে জ্ঞানদীপ জ্বলে ওঠার সনিষ্ঠ আয়োজন। তারপরেই স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমোঘ উদ্ধৃতি —'Education is the Manifestetion of the perfection already in man.' তারপর আমরা দেখি সূর্যমুখীর একাগ্রতা নিয়ে পরম শ্রদ্ধাবান দুই ছাত্র দুপাশে দেবীর আবাহনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারপর দুপাশে দুটি পূর্ণকুম্ভ, মঙ্গলকলস আর ভূমিতে নয়নাভিরাম আলপনা। ...এই পবিত্র সান্নিধ্যের স্মৃতিমেদুরতা আজও আমাকে এক অর্ণিবচনীয় অনুভবে ঋদ্ধ ও পূর্ণ করে।

বিদ্যাপীঠের নানা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ লিপি, পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ ও অলংকরণ, খাতাপত্র, সংশাপত্র, আসবাবপত্র সে সময় রামানন্দদার নান্দনিক ভাবনায় এক ভিন্নতর মাত্রা লাভ করতো। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে কিছু কিছু সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এই গরিমাময় অতীতকে স্মরণ করে আমি বিশেষ প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি এবং আনন্দ লাভ করি।

পরিশেষে আমার এই সানন্দ কথা-যাত্রার অন্তিম পর্বে অন্যতম প্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করি 'মানুষের মধ্যে আছে যে –মানুষ তার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি। কতশত জনপদে ঘুরে এসে দেখেছি তাদের সহনশীলতা ক্ষমা, রোষমুক্তি এবং অনেক বর্ণচ্ছটা আমি মানুষের মধ্যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি তো আজো। মুক্ত হয়ে বসে আছি সেই মানুষের মধ্যে, যার আজো ভালোবাসা আছে, বয়ে যায় ক্ষীরের মতন'।

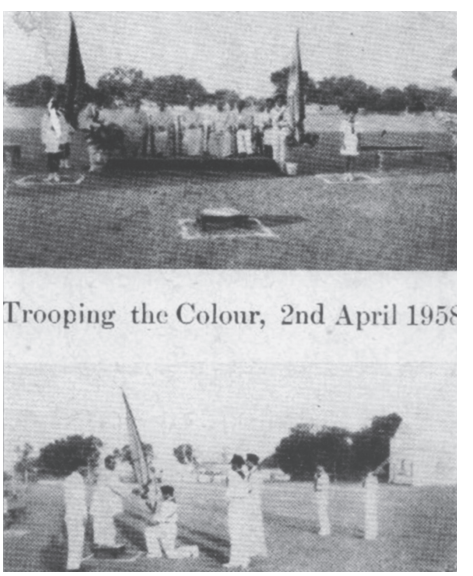

চিত্র: ১৩

দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের প্রিয়তম প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সময়ের অগণিত প্রাক্তনীর সঙ্গে মূলত সৃজনশীলতার সূত্রেই আমার প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ হয় বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। প্রিয় কবির অমোঘ উচ্চারণে একাত্ম হয়ে বলি, এই অমল সান্নিধ্যে আজও তো আমিও মুক্ত হয়ে বসে আছি সেইসব মানুষদের মাঝে যাদের মধ্যে গভীরতম ভালোবাসা আছে।

প্রকৃত বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের অমৃত সান্নিধ্যে বোধ হয় মানুষের মধ্যে যে- মানুষ, তার সন্ধান বিদ্যাপীঠের পবিত্র মাটিতেই আমরা পেয়েছি। অবশিষ্ট জীবন শুধু তাকে সযত্নে লালন করা। এই আমার একান্ত উপলব্ধি। আর সবিনয়ে আমার বিনম্র উচ্চারণ—

'মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ,
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রসূচী (আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ) —

১। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক—
শ্রীমৎস্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ
আলোকচিত্র- পার্থসারথি নিয়োগী / বিদ্যাপীঠ ১৯৭৪

২। বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার একেবারে সূচনা পর্বে অন্যান্যদের সঙ্গে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ।

৩। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বিদ্যাপীঠের সভাবেদীতে। ১৯৫৮-৫৯

৪। একেবারে সূচনাপর্বে বিদ্যালয় ভবনের প্রবেশদ্বারে হিরন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে শিল্পী সুনীল পাল মহোদয়।

৫। বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজী, সুনীল পাল এবং রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র - পার্থসারথি নিয়োগী /১৯৭৩

৬। নিবেদিতা কলামন্দিরের সামনে সুনীল পাল, স্বামী চন্দ্রানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দজী মহারাজ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ব্রহ্মচারী সর্বচৈতন্য (অমিতাভ মহারাজ) স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ প্রমুখ।
আলোকচিত্র- পার্থসারথি নিয়োগী / ১৯৭৩-৭৪

৭। শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির উদ্বোধনের পুণ্যদিন
আলোকচিত্র- পার্থসারথি নিয়োগী /১৯৭৪

৮। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরিভাগে পঞ্চবটীর রূপায়ণে সুনীল পাল মহোদয়
আলোকচিত্র- পার্থসারথি নিয়োগী / ১৯৭৩

৯। মন্দিরের সম্মুখভাগে সুনীলদার অনুপম ভাস্কর্য – গায়ত্রী মন্ত্র
আলোকচিত্র – পার্থসারথি নিয়োগী / ১৯৭৪

১০। 'সারদা মন্দির' / ১৯৭৪-৭৫
আলোকচিত্র- পার্থসারথি নিয়োগী

১১। 'বিবেক মন্দির' / ১৯৭৪-৭৫
আলোকচিত্র- পার্থসারথি নিয়োগী

১২। জিমনাসিয়ামের সম্মুখভাগে সুনীল পাল মহোদয়ের অনুপম একটি শিল্পকর্ম (রিলিফ ওয়ার্ক)
আলোকচিত্র- পার্থসারথি নিয়োগী / ১৯৭৫

১৩। (বিশেষ সংযোজন)
১৯৫৮ সালে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে প্রথম ছাত্রদলের পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা হবার পুণ্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

লেখক প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী

বোধ

দেবাশিস মণ্ডল (শিক্ষক)

ছুটন্ত রেলগাড়ির কামরায়
মেয়েটি জানালার বাইরে তাকিয়ে,
একমনে দেখে চলেছে...

যাদের এতকাল স্থির বলে জেনে এসেছে
সেই গাছ, সেই পাথর...সেই বাড়ি- ঘর
সবাই ছুটছে, এমনকি দুরের ওই পাহাড়
সেও থেমে নেই ...

শুধু অনেক সহযাত্রীর ভিড়ের মধ্যে
একা জানালার বাইরে তাকিয়ে বসে আছে মেয়েটি।
স্থির হয়ে বসে আছে ...একাকী !

তার গতিশীলতা শুধু রেলগাড়িই বোঝে।

‘গুরু’ মস্তিষ্কে বিদ্যাপীঠ

শেখ তৌফিক ইসলাম (শিক্ষক)

২০শে মার্চ ২০২২ রবিবার। অচেনা এক নম্বর থেকে ফোন আসায় খানিকটা বিরক্তির সুরে ফোনটা ধরার জন্য ক্লাস থেকে বেরোলাম। “পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে বলছিলাম, কংগ্রাচুলেশন আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে বিদ্যাপীঠে নির্বাচিত হয়েছেন। পরের সপ্তাতেই ২৭ তারিখে জয়েনিং, সমস্ত বেডিং পত্র নিয়ে চলে আসুন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমরা পাঠিয়েছি তবে ২৭-এর আগে পৌঁছালে ভালো, নচেৎ বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারেই চলে আসুন। আপনার আসল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বিদ্যাপীঠেই আছে।” ফোনের ওপার থেকে শ্রদ্ধেয় গলাটি ভেসে আসলো। অদ্ভুত এক বেদনা মিশ্রিত আনন্দ মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। বেদনা এই অর্থে যে নিজের পরিচিত কুটির, পরিচিত বারাসাত শহরের অলিগলি আর ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানোর আপাত স্বাধীনতা দিয়ে তৈরি ছোট্ট জগত ছেড়ে যাওয়ার বেদনা। একেবারেই যে বাইরে থাকিনি তা নয় বরং উল্টোটা সত্য। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। তবে তা বেশ অনেকদিনই হল। হোস্টেল জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ করে আবার বছর দশেকের বেশি বিনা আবাসিক স্কুল বাড়িতে জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ও কেটে গেল। আর আনন্দ বলতে দ্বিতীয়ত, বলা যায় আপাতত থিতু হতে পারা ওই সিংহ চতুর্থী প্রাপ্তি, কিছুটা নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে পারার অবকাশ। আর নিশ্চিতভাবে প্রথমত, ঠাকুর মা স্বামীজি ও রামকৃষ্ণ মিশন। ফুটবলার হিসেবে কলকাতা মাঠে তিন প্রধানের হয়ে খেলার সুযোগ আর শিক্ষক হিসেবে রামকৃষ্ণ মিশনের মত উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করা দুটোই একই রকম শখের ও স্বপ্নের।

অতঃপর শুরু হল ব্যাগ গোছানোর পালা। আর তার সাথে সাথে ইন্টারনেটের পাতায় বিদ্যাপীঠের বিভিন্ন খুটিনাটি খোঁজার চেষ্টা। ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইট ঘেটে বিদ্যাপীঠের ঐতিহ্য, বর্তমান দায়িত্বশীল পূজনীয় মহারাজদের পরিচিতি, ভৌগোলিক ব্যাপ্তি, বৃক্ষ রাশি সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা হলো। যা সত্যিই সুখকর এবং মনমুগ্ধকর। তারপর এলো সেই আনন্দে ভেজানো বিষাদের দিন। ২০শে জুন। হাওড়া থেকে বারোটা পাঁচ এর চক্রধরপুর এক্সপ্রেস। বয়স অনেক হলো, আর বড়দের মন খারাপ বাইরে থেকে দেখাতে নেই, তাই একটু-আধটু অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাওড়া পৌঁছলাম। সকাল ৬:৩০ এ পুরুলিয়ার রেল স্টেশন হয়ে ৭:০০ টায় পৌঁছলাম আমাদের বিদ্যাপীঠে। এক ঝাঁক নবীন শিক্ষক সবার মানসিক অবস্থা হয়তো অনেকটা আমার মতই। একই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে ও একই গুপ্তধন পাওয়ার জন্য ভালো খারাপ লাগার ব্যাপন খুব দ্রুত হারে চলতে শুরু করে ও সবাই খুব তাড়াতাড়ি ভালো খারাপের সম ঘনত্বে পরিণত হই। সবাইকে একসাথে গেস্ট রুমে রাখার জন্য একটু খারাপ লেগেছিল বৈকি কিন্তু পরে বুঝলাম অনেকগুলো বন্ধু তৈরীর ভিত্তি প্রস্তর ওই দিনই স্থাপিত হয়েছিল। অনেকগুলো বন্ধু হওয়ার পাশাপাশি পাওনার খাতায় হরি, বিষ্ণু ও কৃষ্ণ। ২৭শে জুন সকাল সাড়ে দশটায় বিদ্যাপীঠ এ জয়েনিং এর কাজকর্ম সারতে সারতে মনে পড়ে প্রধান শিক্ষক স্বামী জ্ঞানরূপানন্দজী মহারাজের কথা- “Toufique, we expect a lot from you.” সাধ্য কতটা আছে তা ভেবেই মনে মনে বিদ্যাপীঠ পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ যতটা অবদান রাখা যায় তা রাখার সাধ নিশ্চিত ভাবে মনের মধ্যে জেগে উঠলো। পরের দিন স্কুল এসেম্বলিতে যথারীতি পরিচয় পর্ব সারা হল, আর তারপর সেই চির পছন্দের জায়গা ক্লাসরুম আর সম্পাদক মহারাজ স্বামী শিবপ্রদানন্দজীর কথায় কিছু ‘লেজকাটা বাঁদর’ -বিদ্যাপীঠ পরিবারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই সম্পদের কথা বলতে গিয়ে একটি কথা না বললেই নয়, প্রথম যেদিন বিদ্যাপীঠ ঢুকলাম, প্রায় ঘন্টা তিনেক কাটালাম কিন্তু জানতেই পারলাম না ৭৫০ জন ওই লেজকাটা বাঁদর- আমাদের পরম প্রিয় সন্তান সম ছাত্র

সহ স্কুলটা চলছে, তাতে কোন হুল্লোড় নেই হইচই নেই নিশ্চুপ শান্ত ও স্নিগ্ধ। সেই দিন বুঝেছিলাম কেন সমাজে সাফল্যের সাথে সাথে শৃংখলারও সমার্থক রামকৃষ্ণ মিশন। আর লেজকাটা বাঁদরের নামকরণের সার্থকতা নিয়ে কিঞ্চিত প্রশ্ন তোলার পাপটুকুও মনে মনে করে ফেললাম। কিছুদিন বিদ্যাপীঠের গেস্ট হাউসে কাটানোর পর আমার জন্য বরাদ্দ হলো নবম শ্রেণীর হোস্টেল– রামকৃষ্ণ সদন, তুরিয়ানন্দ ধাম। চিফ ওয়ার্ডেন মহারাজের অফিসের উপরের ঘর। বিদ্যাপীঠ থেকে পাওয়া টোটো ধরে মালপত্র নিয়ে সবে রামকৃষ্ণ সদন পৌঁছলাম, ছাত্রদল ও তাদের অভিভাবক দেবাশীষ দা আগে থেকেই হাজির আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য। আর তার সাথে সাথে হৃদয় স্পর্শ করল আমার ব্যাগ পত্র নিয়ে আমার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছাত্রদলের হুড়োহুড়ি। আরো একবার নিজের ধারণার প্রতি বিশ্বাস শক্ত হলো যে এই জেনারেশন গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে জানে ভালবাসতে জানে। বাইরে কান পাতলে হয়তো এর বিপরীত শোনা যায় সবার মুখে মুখে। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমার সেরকম কখনোই মনে হয়নি যে আজকালকার ছেলে মেয়েরা শ্রদ্ধা করতে বা ভালোবাসতে জানে না। আর একটা কথা, প্রথম কয়েক দিনের মাথায় সম্পাদক মহারাজ স্বামী শিবপ্রদানন্দজী আমাদের নতুন যোগ দেওয়ার শিক্ষক মহাশয়দের নিয়ে একটি ছোট্ট মিটিং করেন, কিছু ইটিং ও অবশ্য ছিল। সেখানে তার থেকে প্রথম শোনার সৌভাগ্য হয়। এত রুচিশীল স্নিগ্ধ যথোপযুক্ত বাগ্মী-আমি আগে কখনো দেখেছি কিনা সন্দেহ আছে। তার কথায় বারবার একটি শব্দ বদ্ধ উঠে আসছিল ''বিদ্যাপীঠ পরিবার''। একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কতটা দায়বদ্ধতা, কতটা ভালোবাসা থাকলে পরে পরিবার বলা যায়। শুধু ডাকা নয় তার প্রতিটা চলার ধাপ, কথা বলা, সর্বক্ষণ বিদ্যাপীঠ ভাবনা বিদ্যাপীঠ পরিবার সম্বোধনের যৌক্তিকতা জানান দেয়। বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণের সুমধুর 'রথ যাত্রা'র পরিবেশ কিংবা শিবানন্দ ধামের 'নন্দ উৎসবের' মোহনীয় পরিবেশ এর স্বাদ চেটেপুটে নিয়ে অত্যন্ত আবেগ তাড়িতভাবে যখন বলি 'একেবারে শান্তিনিকেতন ফ্লেভার' মহারাজ ভালোবেসে মুদু ধমকে শুধরে দেন, এটাকে বলতে হয় 'বিদ্যাপীঠ ফ্লেভার'।

বিদ্যাপীঠের আরো একটি ফ্লেভার যেটি না বললেই নয় তা হলো বোটানিক্যাল ফ্লেভার। নিজে প্রাণিবিদ্যার ছাত্র হলেও গাছের প্রতি টান আমার অনেক পুরনো। সব সময় পাহাড় বা সমুদ্রের থেকে জঙ্গল ভ্রমণ আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণের। খুব বেশি না ঘুরলেও পশ্চিমঘাট পর্বত, মধ্যপ্রদেশের নাগজিরা, নাভিগাঁও ও মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ আরো বেশ কয়েকটি জঙ্গল ঘোরার সৌভাগ্য হয়েছে। বিদ্যাপীঠের ভৌগলিক ব্যক্তি বৃক্ষ রাশি আর তার সাথে পাওয়া পূজোর বোনাস–ময়ূর হরিণ উঠপাখি সত্যিই অন্তত একটি অভয়ারণ্যের অনুভূতি আনে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কর্মসূত্রে থাকতে পারা আমার জঙ্গল ঘোরার মতোই স্বপ্নের। বিদ্যাপীঠের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকেই বামদিকে মিউজিয়াম তারপর সেই সেই রাস্তা ধরে এগোতে থাকলে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষকদের কোয়ার্টার– গুরু পল্লী। আমার অবশ্য সে পল্লীতে যেতে এবং গুরুর তকমা পেতে বছর দুয়েক আরো লাগবে। কারণ আমাকে দু'বছর হোস্টেল ওয়ার্ডেন শিপে থাকতে হবে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের শর্ত অনুযায়ী। আর প্রধান ফটক থেকে সোজা চলে এলে বিশালাকার অডিটোরিয়ামকে বামদিকে ফেলে সামনে বিদ্যাপীঠের সবথেকে মনোরম, শান্ত আস্তানা প্রধান মন্দির। যার সামনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আমরা কবিতার লাইন শ্মশানের বুকে আমরা রোপন করেছি পঞ্চবটি, তাহার ছায়াতে মিলাবো আমরা জগতের শত কোটি'। এখানে আমরা সকাল ও সন্ধ্যের ভজনে ও প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করি। কংক্রিটের পঞ্চবটির পেছনে বুদ্ধের নারকেল– Buddha's Coconut যা একেবারেই কংক্রিটের নয় জীবন্ত ও প্রাকৃতিক। গাছটির বোটানিকাল নাম Pterigota alata var diversifolia. সাধারণ চলতি নামে বলতে গেলে পাগলা গাছ। তার পাগলামির কারণ হলো ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির পাতা তার শরীরে। গাছটিতে নারকেলের মত একটা ফল হয় বলে Buddha's Coconut নামেও ডাকা হয়। সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যার প্রফেসর রাহাদা'র থেকে প্রথম এই গাছের সন্ধান পাই। গাছটার মূলত বাসস্থান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্নাটকের দিকে হলেও বহু বছর ধরে আমাদের বিদ্যাপীঠ পরিবারের একজন। সারদা

সদনের সামনে বিশালাকৃতি বাওবাব (Adansonia digitata) সে আবার প্রধানত দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা। প্রধান ফটক থেকে ডান দিক ধরে হাঁটলে সামনে বেশ কয়েকটি নাগলিঙ্গম গাছ এর দেখা মেলে। যার বোটানিক্যাল নাম Couroupita gianesis. শুনেছি ঠাকুরের খুব প্রিয় গাছ এটি। বিদ্যাপীঠ এর ভেতরে জালের মত সাজানো রাস্তা বরাবর হাঁটতে থাকলে সন্তানসমবিজ ঢাকতে না পারা ব্যক্তবীজী পাইনাস সাইকাস মাঝেমধ্যেই চোখে পড়বে। আর সারি সারি কৃষ্ণচূড়া শ্বেত চন্দন যেন স্বাগত জানানোর জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। এত গাছের ভিন্নতা যাদের স্বাভাবিক বসবাসের জায়গাও হয়তো আমাদের এই পরিবেশ নয় তবুও সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছে বিদ্যাপীঠ, দিব্যি তারাও তো হেসে খেলে আছে। কাটিয়ে দিয়েছে তাদের জীবনের অনেক বসন্ত।

রাতে অপ্রয়োজনীয় বাতি স্তম্ভ জ্বলতে দেখিনা বিদ্যাপীঠে, হয়তো পাখির ঘুমের ব্যাঘাত যাতে না হয় সেজন্য। তাই জঙ্গলপ্রেমী মানুষের কাছে বিদ্যাপীঠ যে সত্যিই একটি পীঠ বা পীঠস্থান তা নিয়ে আমার তেমন সংশয় নেই। আবার একটু হোস্টেলের গল্পে ফিরি। বিদ্যাপীঠের ভাষায় 'সদন' ওই যে বলেছিলাম আমার- রামকৃষ্ণ সদন -নবম শ্রেণী। ছোট ছোট সবুজ সবুজ ছানা, প্রত্যেকে নিজের ঘর ছেড়ে মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এখানে এসেছে। স্কুলের সারা দিনের রুটিন তারা সুন্দরভাবে ভালোবেসে পালন করে নিজের কাজ নিজে করার পাঠ পায়। নিজের মনের আনন্দ দুঃখ নিয়ে নিজেকে মন্দিরে ঠাকুর মা স্বামীজীর চরণে সমর্পণ করার সুযোগ পায়। বিদ্যাপীঠের চাচা - মানে চা ও চাউমিন নিয়ে কিঞ্চিত অভিযোগ থাকলেও শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে বিদ্যাপীঠের স্বাস্থ্যকর আহার তারা গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যকর এই অর্থে তাদের খাবারের একটা বিরাট অংশ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস ও কিছুটা অবধি সবজি বিদ্যাপীঠের ক্যাম্পাসের মধ্যেই তৈরি হয় যা অনেকটা অর্গানিক ফার্মিং এর মত আর তার সাথে সাথে অতিরিক্ত তেল মশলার স্বল্পতা। বিদ্যাপীঠের নিজস্ব পোল্ট্রি, ডেইয়ারি এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন মন ছুঁয়ে যায়। সারাদিনের ক্লাস খেলাধুলা ও স্টাডির ধকল থাকলেও ওদের আনন্দ, লাফালাফি, অমলিন হাসি মাঝেমধ্যে রুমে ছোট্ট আড্ডা সেই ধকলকে নিমেষে কমিয়ে দেয়। তবে 'সুবোধ বালকে'র আড়ালে তাদের আরো একটা দুষ্টুমির জগত আছে তা এই কয়েকটা দিনে একটু আধটু টের পাচ্ছি বটে, তবে সেদিকে আর নাইবা ঢুকলাম। মনে মনে একটু একটু বুঝতে পারি মহারাজের দেওয়া 'লেজ কাটা বাঁদর' নামকরণের সার্থকতা। সকালের ভজন থেকে রাতের নাইট স্টাডি এই রুটিন ভালবেসে অনুসরণ করার জন্য ওই দুষ্টুমিটুকু অক্সিজেনের মতো বলেই আমার মনে হয়!

এই অল্প কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় শুনেছি ও বুঝেছি বিদ্যাপীঠের অসাধারণতা। ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে শুরু করে নানা বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তির বিদ্যাপীঠ আগমন, একের পর এক অসাধারণ থেকে অতি অসাধারণ ছাত্রবন্ধু উপহার দেওয়া বিদ্যাপীঠের সম্মুখে মা সরস্বতী ও শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ব্যপন সুনীল পালের ভাবনার চিত্ররূপ, পদ্মপুকুর, মা সারদার চরণ ধুলি এবং প্রতিষ্ঠাতা মহারাজের সন্তান স্নেহে গড়ে তোলা বিদ্যাপীঠের প্রতিটি ইটের মধ্যে ভাবনা, ভালবাসা ও আবেগ লুকিয়ে আছে তা বোঝা যায়। এমন ঐতিহ্যবাহী পরিবারের একজন হওয়া আমার কাছে গর্বের। বিদ্যাপীঠের এই পরিবেশে আফ্রিকান বাওবাব, দক্ষিণ ভারতের পাগলা গাছ দক্ষিণ আমেরিকার নাগলিঙ্গম এদের অভিযোজন এর যেমন কোন সমস্যা হয়নি বা হচ্ছে না, আমিও ওই গাছগুলোরই দলে। এই গাছপালা, সকালের শুদ্ধ অক্সিজেন, উঠপাখি, 'হরিণ, ময়ূর, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ, কলা ভবনে রবীন্দ্রনাথের পিয়ানো, বুদ্ধিমান ও ভালোবাসতে জানা ছাত্রদল, রঞ্জিতদা হরি সুব্রত সৈকত মানস রবি বিষ্ণু স্বরুপ মল্লিকদা সহ এক ঝাঁক বন্ধু সবই আমার বিদ্যাপীঠ থেকে পাওয়া। মহারাজ স্বামী শিবপ্রদানন্দজীর প্রজ্ঞতা, স্বামী জ্ঞানোরুপানন্দজী মহারাজের বুদ্ধিদীপ্ততা, স্বামী যজ্ঞমায়ানন্দজীর সরল অমলিন হাসি, স্বপনদা শক্তিদার মত ব্যক্তিত্বকে কাছাকাছি পাওয়া ও কিছু সময় কাটাতে পারার সৌভাগ্য- সবই আমার পাওয়ার খাতায়। পৃথিবী নিত্যতা সূত্রতে চলে। এত পাওয়ার পর আমি আমার এই ক্ষুদ্র সাধ্য ও মধ্য মেধা দিয়ে কতটা নিত্যতা সুত্র সংরক্ষণ করতে পারবো তা হয়তো সময় বলবে।

আমার অনুভূতিতে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ

অলোক সরকার (১৯৬৭)

আমি ১৯৬৪ সালে নবম শ্রেণীতে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়েছিলাম, তার আগে জামশেদপুরে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি স্কুলের ছাত্র ছিলাম। লেখাপড়ায় মেধাবী ছিলাম, কিন্তু শিল্প-শহরে জন্ম আর বেড়ে ওঠা বলে একটু বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। একে তো শিল্প-শহর তার ওপর বিহারি-অধ্যুষিত (তখনও ঝাড়খণ্ড হয়নি) এলাকা হওয়ার জন্য স্কুলে বা খেলার মাঠে ঝগড়া, লড়াই লেগেই থাকত। আমি চেহারায় খুব বড় মাপের ছিলাম না, কিন্তু মনের দিক থেকে অনেকের চেয়ে বেশি সাহসী ছিলাম। আমার সমবয়সী ছেলেরা সেজন্য আমাকে একটু সম্মান করতো। বেপাড়ায় খেলতে গেলে আমি অবশ্যই অপরিহার্য ছিলাম। এতদুর পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা পাশের বাড়ির এক কাকু জটিল করে দিলেন। উনি একদিন কোন খেলার মাঠে আমাকে হাতাহাতি করতে দেখেছিলেন, ব্যস আজকের দিনের ইন্টারনেটের চেয়েও দ্রুত গতিতে ঘটনাটা বাবার কানে পৌঁছে দিলেন। সঙ্গে অবশ্য একটা ভালো পরামর্শ দিয়েছিলেন। উনি বাবাকে বলেছিলেন আমাকে যেন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে ভর্তি করে দেওয়া হয়। বাবার কাছে ওনার কথাটা জুতসই মনে হয়েছিল।

একদিন রবিবার সকালে বাবা আমাকে নিয়ে পুরুলিয়ার দিকে রওনা দিলেন। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে বিশেষ কিছু জানালেন না। বাসে জানলার ধারে বসে ঠান্ডা হাওয়া খেতে খেতে ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই পুরুলিয়া পৌছে গেলাম। মা এবং দিদি মিলে হোল্ডঅল এবং একটা স্টিলের বাক্সে জিনিস পত্র ভরে দিয়েছিলেন। বাবাকে এসব কেন করা হলো প্রশ্ন করাতে বললেন, সময়ে সব জানতে পারবে। বিদ্যাপীঠের গেট দিয়ে ঢুকেই আমরা সোজা সারদা মন্দির স্কুল বাড়িতে উঠলাম। বাক্স, হোল্ডঅল কোথায় রাখা হয়েছিল সে কথা এখন আর মনে নেই। বাবা একজন মহারাজ এবং কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কি সব কথা বললেন তা আমি জানি না। আমাকে একজন একটি ক্লাসে নিয়ে গিয়ে সামনে পরীক্ষার খাতা দিলেন। আমি হাসব না কাঁদব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবে, সামনে অঙ্কের প্রশ্নপত্র দেখে আমার পুরুষকার জেগে উঠল। 'শোলে' সিনেমা তখনও মুক্তি পায়নি, পেলে বলতাম, বীরু কা সাথ টক্কর? অঙ্ক চিরকাল আমার প্রিয় বিষয়। খেলাধুলা, কুস্তি, মস্তি ইত্যাদি করার পর যেটুকু সময় পেতাম, তারপর অঙ্ক নিয়ে ভাবতাম। আধ ঘন্টার মধ্যে আমি সব অঙ্কের উত্তর লিখে ফেললাম। আমার সামনেই খাতা পরীক্ষা করা হলো, আমি পঞ্চাশে পঁয়তাল্লিশ মতো পেয়েছিলাম। তারপর, বাংলা ও ইংরেজির পরীক্ষা নেওয়া হলো। শতকরা পঞ্চাশের কাছাকাছি নম্বর পেয়েছিলাম।

এরপরে আমাকে একটু বাইরে যেতে বলে বাবাকে ডেকে ওনারা কি সব কথাবার্তা বলতে লাগলেন। আমি মাঠের মধ্যে কিছু ছেলেকে ঘুরে বেড়াতে, খেলতে দেখেছিলাম। পরে জেনেছি যে, তখনো ক্লাস শুরু হয়নি, ছেলেরা সবে এসে পৌঁছেছে। বাবার সঙ্গে কথা বলা হয়ে গেলে ওরা আমাকে ডাকলেন। প্রশ্ন করলেন, আমি বড় হয়ে কী হতে চাই? চটপট জবাব দিলাম, আমি বাবার মতো ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। বাবা টেলকোতে কাজ করতেন। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কারখানা, অফিস সব বন্ধ থাকতো। বাবা আমাদের নিয়ে নিজের অফিস, অন্যান্য শপ ইত্যাদি দেখাতেন। ব্রাউন কাগজের ঠোঙায় ফল, মিষ্টি প্রসাদ বিতরণ করা হতো। তখন থেকেই আমার মনে হতো যে আমিও বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবো, ঠান্ডা এসি ঘরে বসে কাজ করবো। হয়েও ছিলাম, সে কথা আপাতত থাক। তারপর হেডমাস্টার মহারাজ বললেন যে, সেক্ষেত্রে আমার জন্য টেকনিক্যাল বিভাগ যথোপযুক্ত হবে,

কারণ এ বিভাগে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্কের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং শেখানো হয়। ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে ড্রইং না বুঝলে চলবে না। এই কথা শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল বিভাগে ভর্তি হতে রাজি হয়ে গেলাম। মনে হয়, বাবাকেও ওনারা একই কথা বলেছিলেন। জামশেদপুরে আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তাম, পুরুলিয়ায় টেকনিক্যালের ছাত্র হয়ে গেলাম। পরে মনে হয়েছিল যে, ওরা সে সময় টেকনিক্যাল বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান পাওয়ার মতো কাউকে মনে করতে পারেন নি, সেজন্য আমার এ দশা হয়েছিল। আমি অবশ্য ১০৩-১০৪ ডিগ্রি জ্বর এবং প্যারাটাইফয়েড নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে সপ্তম হয়েছিলাম। পরে আইটি (এখন আইআইটি), বেনারস থেকে গোল্ড মেডেল পেয়ে স্নাতক এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক থেকে স্কলারশিপ নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছিলাম। আপাতত আবার বিদ্যাপীঠের কথায় ফেরা যাক।

বাবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সই করে আমাকে বললেন যে আমি বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়ে গিয়েছি, এরপর থেকে আমাকে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে হবে। ভাবছিলাম, কি ভাবে ব্যাপারটা সম্ভব হলো! বাবাই বললেন যে ওঁদের সব আসন ভর্তি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে দু-চারটি আসন খালি হয়ে যায়। বাবা একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মারফত জানতে পেরেছিলেন যে সেই রবিবার স্পট অ্যাডমিশন হবে, উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে না জানিয়ে আমাকে নিয়ে পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। সেদিন বুঝিনি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে একমাত্র মা, বাবাই বুকের রক্ত দিয়ে সন্তানকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসতে পারেন, অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। যাই হোক, আমার একটু মন খারাপ হয়েছিল, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। মহারাজেরা আমাকে দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার ট্রাঙ্ক, বিছানাপত্তর হস্টেলে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা চলে যাবার পর নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছিল। আমার এখনও মনে আছে যে তখন আমার নিজের অজান্তেই চোখটা একটু ভিজে গেছিল। একজন বন্ধু আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, বলল দুঃখ করিস না, খুব শিগগিরই সব ঠিক হয়ে যাবে। আশ্চর্য, তাই হয়েছিল, আমি সব ভুলে পড়াশোনা এবং খেলাধুলা নিয়ে মেতে উঠেছিলাম।

বিদ্যাপীঠে আমার নতুন জীবন শুরু হলো। ভোর পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে ভজন ঘরে যেতাম। সেখানে ঠাকুর মা স্বামীজীর ছবি ফুল দিয়ে সাজানো থাকতো। ধুপ-দীপ জ্বেলে আরতি এবং ভজন হতো। তুলসীদা আমাদের গানের মাস্টার ছিলেন। ওঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভজন গাইতাম। আমার গলা খুব বেসুরো ছিল, সেইজন্য বেশির ভাগ সময় আমি মনে মনে গাইতাম, অন্যের যাতে অসুবিধা না হয়। ভজন ঘরে ধুতি পরে যেতে হতো, অন্যথা হবার উপায় ছিল না। আমাদের অখণ্ড নীরবতা পালন করতে হতো, কথা বলা বারণ ছিল। ধরা পড়লে বিদ্যাপীঠের কোর্টে তার বিচার হতো। আমি কোন দিন ধরা পড়িনি, তাই শাস্তির বিধান সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। ভজন থেকে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে বিছানা-পত্তর পরিষ্কার করে হাফ প্যান্ট ও জামা পরে হয় খেলার মাঠে নয় পিটি করতে যেতে হতো। ঘন্টা খানেক খেলাধুলার পর আমরা খাবার ঘরে প্রাতরাশ করতে যেতাম। ততক্ষণে সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা হয়ে গিয়েছে। এরপর আমরা হয় স্টাডি হলে নয় কোচিং-এ যেতাম, তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন মাস্টারমশাই থাকতেন। বেশিরভাগ দিনই রাম-দা স্টাডি হলের দায়িত্বে থাকতেন। রাম-দা অর্থাৎ ইদানিং কালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়।

সকাল দশটায় সেল্ফ স্টাডি শেষ করে আমরা স্নান করতে যেতাম। তারপর স্কুল ইউনিফর্ম পরে খাবার ঘরে দুপুরের খাবার খেয়ে স্কুলে যেতাম। সকাল এগারোটায় স্কুল শুরু হতো, সম্ভবত বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলতো। স্কুল শুরু হবার আগে দুটো হস্টেলের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল সেখানে সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতাম। তারপর, ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে সেদিনের জরুরি খবরগুলো পড়ে শোনান হতো। এক একদিন এক একজনের ওপর দায়িত্ব পড়ত। সাধারণত ক্লাসের প্রথম দিকে যারা থাকত, তাদের ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া

হতো। এই খবর পড়ার জন্য একটা খাতা থাকত, সেই খাতায় জরুরি খবরগুলো লিখে মুখস্থ করে নিতে হতো। প্রার্থনার পরে গড় গড় করে মুখস্থ বলে যেতে হতো। একবার আমার ওপর এই দায়িত্ব পড়েছিল। আমি বলতে বলতে বেশ কয়েকবার আটকে গিয়েছিলাম। হিরন্ময়ানন্দজী সেদিন উপস্থিত ছিলেন, আমি তো ভয়ে কাঁপছি। উনি আমার থেকে খাতাটা চেয়ে নিয়ে সবকটা খবর পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে পড়ে শোনালেন। আমার ভয় হচ্ছিল যে সেদিন কতই না দুর্ভোগ পোহাতে হবে, আশ্চর্য উনি কিন্তু কিছুই বললেন না। সেদিন ওঁর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা হয়েছিল তা আজও অমলিন আছে। একেই বলে মহান আত্মা, অবশ্য আমাদের সময়ে সব মহারাজেরাই অমায়িক ছিলেন; কালীপদদা, চন্দনদা, অনিলদা, ভান্ডারী মহারাজ, বিষ্ণুচৈতন্য মহারাজ পরে স্বামী রমানন্দ) সবাই অতি উচ্চ মাপের সাধু ছিলেন।

স্কুলের পর আমরা স্কুল ইউনিফর্ম ছেড়ে খেলার পোশাক পরে খাবার ঘরে টিফিন খেয়ে খেলার মাঠে যেতাম। কেউ কেউ জিমনাসিয়ামে যেত। খেলাধুলা হয়ে গেলে হাত মুখ ধুয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ঠাকুর ঘরে যেতাম।। প্রার্থনার পরে যাদের কোচিং থাকতো তারা কোচিংএ যেত, অন্যেরা পড়ার ঘরে যেত। যতদুর মনে হচ্ছে রাত নটার মধ্যে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যেত। এরপর আরও ঘন্টাখানেক পড়াশোনা করে আমরা শুতে যেতাম। ভোর পাঁচটা থেকে আবার সেই একই রোজনামচা শুরু হয়ে যেত। উৎসব পার্বণের দিন বিশেষ পুজা, হোম, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো কখনো-কখনো ভক্তিমুলক বা শিক্ষামূলক সিনেমাও দেখানো হতো। কোন সিনিয়র দাদা প্রজেকশন রুমে থাকতেন, বিশেষ করে অনুপমদার কথা মনে আছে।

আজকে এতদিন পরেও বিদ্যাপীঠের শিক্ষার কথা মনে আছে। বিদ্যাপীঠে শিক্ষক দাদারা বাহ্যিক জগতের জ্ঞান আর মহারাজরা চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পারি যে তাঁদের আন্তরিক প্রয়াসের ফলে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর ঝড় তুফান সহ্য করে আজও মাথা উঁচু করে বেঁচে আছি। পেরুমলদা যে অঙ্ক শিখিয়েছিলেন, ত্রিভঙ্গদা যে পদার্থবিজ্ঞান শিখিয়েছিলেন, মিহিরদা যে রসায়নবিদ্যা শিখিয়েছিলেন তার শক্তিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এর দুরূহ গণনা করতে কোন বেগ পেতে হয়নি। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে অনেক কঠিন কঠিন অঙ্ক করতে হয়েছে, কিন্তু বিদ্যাপীঠে শেখা অঙ্কের ভিতটা শক্ত থাকার জন্য সে সব বাধা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে গিয়েছি। আমার মনে হয় যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন তারা সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন। মহারাজদের শিক্ষার ব্যাপারে রমানন্দ মহারাজের (তখন ব্রহ্মচারী) কথা কখনো ভুলব না। কোন রবিবার দুপুরে উনি হয়তো দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, বাইরে পুরুলিয়ার গায়ে ফোসকা পড়ে যাবার মতো রোদের তাপ। আমি গিয়ে ওনার দরজা খটখট করতাম, গীতার কোন একটা শ্লোক বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আশ্চর্য উনি বিরক্ত না হয়ে বুঝিয়ে দিতেন, উনি আমাদের গীতা পড়াতেন। এখনো মনে পড়ে, গীতার এই শ্লোকটার কথা, 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। প্রশ্ন করেছিলাম, উদ্দেশ্য ছাড়া কি কর্ম করা যায়, উত্তর পেয়েছিলাম, উদ্দেশ্য ছাড়া কর্ম করা যায় না, তা ঠিক, কিন্তু কর্মের ফলাফলে উদাসীন থেকে অবশ্যই কর্ম করা যায়, যেমন ঠাকুর, মা, স্বামীজি করেছেন এবং গীতা সেটাই করতে বলছেন। আমি আজও সেই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি, এ জীবনে পারব বলে মনে হয় না। তবুও গীতাকে প্রণাম জানিয়ে, ঠাকুর, মা, স্বামীজীর চরণে সবার মঙ্গল কামনা করে আমার লেখনীকে এখানেই থামিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ, নমস্কার!

লেখক অবসর প্রাপ্ত স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়র

স্বামী বিবেকোনন্দ ও ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চা

জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য (১৯৭১)

শারীরিক অসুস্থতা যে দু-জন অসাধারণ মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারে, এ উদাহরণ স্বপ্নেও বিরল। কিন্তু, ঘটনাটি ঘটেছিল একটি জাহাজ-যাত্রাকালে।

জাহাজটি ছিল "Empress of India", যার উচ্চ-শ্রেণীতে যাত্রা করেছিলেন দুই মানব-প্রেমী, ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভার। দু জন যাত্রীর একজন ছিলেন ভারতবর্ষের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এবং অপরজন, তখনকার দিনের বিশিষ্ট শিল্পপতি জামসেদজী টাটা।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী জাহাজে উচ্চ-শ্রেণীতে যাত্রা করবেন কেন? বলা বাহুল্য স্বামীজীর বয়স চল্লিশ স্পর্শ' করার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন এবং ঐ তরুণ বয়সে তার শরীরে বাসা বেঁধেছিল একত্রিশ রকমের রোগ। এই সমস্ত রোগের মধ্যে, শিকাগো যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে চরম আক্রমণ করল পেটের গণ্ডগোল। এমতাবস্থায়, তার পক্ষে জাহাজের ডেকে যাত্রা করা অসম্ভব। এই সময় ক্ষেত্রীর মহারাজ তাঁকে জাহাজের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে, যাত্রার সুব্যবস্থা করে দেন, সেই যাত্রায়, স্বামীজী তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন জামসেদজী টাটাকে। এ যেন বহু বছর আগে কোথাও লেখা ছিল।

দুজন অসামান্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ জাহাজের ফার্স্ট-ক্লাসে আমেরিকা যাচ্ছিলেন। দু-জন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুই ব্যক্তিত্ব, যাঁদের স্বাভাবিকভাবে এক মতে উপনীত হওয়া অচিন্ত্যনীয়। একজন-স্বামী বিবেকানন্দ, সর্বত্যাগী হিন্দু সন্ন্যাসী, যিনি পৃথিবীর অভিধাপে 'ভারতবর্ষ' শব্দের পরিভাষাটিই বদলে দিয়েছেন।

তখন, আধুনিক ভারতবর্ষে, উচ্চশিক্ষা এবং উদ্যোগ শিল্প নিয়ে নানা ভাবনা চিন্তা চলছে। এই প্রসঙ্গে নিয়মিত কাজ করে চলেছেন বোম্বাইয়ের ধনী শিল্পপতি মিঃ জামসেদজী টাটা। এই শিল্পপতি তখন ভারতবর্ষে একটি বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন। এই প্রয়াসকে ভারতবর্ষের প্রগতির পক্ষে একটি বিরাট জাগরণ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সে যাই হোক, আমাদের আলোচনায়, জাহাজে স্বামীজীর সফর-সঙ্গী হয়েছিলেন বোম্বাইয়ের এই শিল্পপতি জামসেদজী টাটা। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে জানতে পারি, আলোচ্য সফরকালে, এই দুই ব্যক্তিত্ব নানাবিধ কথোপকথনে ব্যস্ত থাকতেন। এই রকম কথা প্রসঙ্গে, একদিন স্বামীজী টাটাকে প্রস্তাব দিলেন, জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রয় করে, জাপানের অর্থভান্ডার বৃদ্ধি না করে, নিজের দেশে দেশলাই উৎপাদনের ব্যবস্থা করলে, তার নিজের লাভ হবে, দেশের কিছু অর্থ সাশ্রয় হবে; সর্বোপরি দেশের লোকের কর্ম সংস্থান হবে।

মিঃ টাটার, এ প্রস্তাব খুব একটা মনঃপুত হয়নি–তার দুটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, টাটার, জাপানী দেশলাইয়ের সে সময় বিশাল এক বাজার ছিল; যেহেতু, আর কোনও ব্যবহারযোগ্য দেশলাই সে সময়ে বাজারে ছিল না। দ্বিতীয়ত, টাটার মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পপতি তিরিশ বছর বয়সী একজন অখ্যাত ভারতীয় সন্ন্যাসীর উপদেশ মানতে বাধ্য নন। মনে রাখতে হবে, তখনও, স্বামীজী, আজকের বিবেকানন্দের পরিচিতি লাভ করেননি। অবশ্য, পরবর্তীকালে, ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে জানা যায় যে, মিঃ টাটা তাঁকে বলতেন, তিনি (মি. টাটা), জাপানে অনেক মানুষকে বলতে শুনেছেন যে, বুদ্ধের চেহারার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ছিল।

স্বামীজী এবং টাটা জাপানে অবস্থানকালে, নানা কারণে একাধিকবার মিলিত হয়েছিলেন; কিন্তু তা ছিল

স্বল্পস্থায়ী। এই দুই ব্যক্তিত্বের পরিচয় ব্যাপ্তি লাভ করে জাহাজে, তাদের ইয়াকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভার যাত্রাকালে।

আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী তাঁর পরম বন্ধু ক্ষেত্রীর মহারাজার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রোমা রোলাঁর লেখা থেকে জানা যায়, মহারাজা, তাঁর দেওয়ানের সাথে, স্বামীজীর বোম্বাই যাবার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় মহারাজা স্বামীজীকে, লাল সিল্কের আলখাল্লা, গেরুয়া পাগড়ী এবং 'বিবেকানন্দ' নামটি দেন, যেই নামে তিনি পৃথিবীতে অমর হয়ে গেলেন।

স্বামীজী, ৩১ মে ১৮৯৩, বোম্বাই ছেড়ে সিংহল, পেনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং ক্যান্টন হয়ে নাগাসাকিতে পৌঁছালেন। সেখান থেকে ওসাকা, কিয়োটো এবং টোকিও হয়ে য়োকোহামা পৌঁছালেন। য়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভার পর্যন্ত জাহাজ যাত্রা শেষে, ট্রেনে করে জুলাই মাসের মাঝামাঝি শিকাগো পৌঁছালেন।

য়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভার জাহাজ-যাত্রার সময় স্বামীজীর সহ-যাত্রী ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত মানবতাবাদী শিল্পপতি জামসেদজী টাটা। এই সময় এবং এর পর ট্রেনে শিকাগো পর্যন্ত যাত্রায় স্বামীজীর সফর-সঙ্গী ছিলেন মিঃ টাটা। দীর্ঘ সময়ের যাত্রাকালে, এই দুই স্বদেশ-প্রেমিকের আলোচনা হত নানা প্রসঙ্গে; কিন্তু, বেশীর ভাগ আলোচনাই কেন্দ্রীভূত থাকত ভারতবর্ষ এবং ভারতের উন্নতি-সাধনকে ঘিরে।

এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান শিক্ষা এবং উদ্যোগস্থাপন। মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর বয়স ঐ সময় তিরিশ; দেহত্যাগের নয় বছর আগে। জামসেদজী টাটার মত একজন মানবহিতৈষী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে কাছে পেয়ে, স্বামীজী শিল্প-শিক্ষার পরিকল্পনা এবং ভারতবর্ষে ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে বিশদ আলোচনা করে তাঁর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে।

শিল্পপতি টাটার মনে এই প্রস্তাব কতখানি রেখাপাত করেছিল, তা প্রমাণ করে, ২৩ নভেম্বর ১৮৯৮ তারিখে, স্বামীজীকে লেখা তাঁর একটি পত্র, দুজনের জাহাজে সাক্ষাতের পাঁচ বছর পর স্বামীজীর পূর্ব-প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে, শিল্পপতি যা লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ "ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন বা পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাবরাজির কথা আমি স্মরণ করছি।..... আর, এই অভিযানে বিবেকানন্দের তুল্য মহানায়ক কে হতে পারেন! আপনি কি এই পথে আমাদের জাতীয় ঐতিহাসিক নবজীবন দান করবার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন?"

এই প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় বলছেন, "টাটা বুঝেছিলেন তাঁর পরকিল্পনা সফল করতে টাকাই যথেষ্ট নয়- মানুষ চাই- আর মানুষকে আহ্বান করে জাগাতে তাঁর কাছে বিবেকানন্দের চেয়ে বড় সেনাপতি কেউ ছিলেন না।"

মনে রাখতে হবে, জামদেসজীর এই পত্র প্রাপ্তির পর, আরো চার বছরেরও কম সময় স্বামীজী জীবিত ছিলেন। এই সময়ে, স্বামীজী নানাবিধ রোগে জর্জরিত এবং শরীরের দিক থেকেও বেশ ক্লান্ত। এতদ্ব্যতিত এই সময় স্বামীজী তার স্বপ্নের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা নিয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বয়ং হয়তো অনুভব করতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীতে, তাঁর সময় সীমিত এবং সমস্ত কাজ ত্বরায় সমাপন প্রয়োজন আছে। তিনি তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতাকে বললেন জামসেদজীকে সাহায্য করতে।

টাটার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে, ভগিনী নিবেদিতা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন বিশেষ করে এই জন্য যে, তাঁর প্রভু স্বয়ং স্বামীজী ছিলেন, এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রাণপুরুষ।

ঝাঁপিয়ে তো পড়লেন, নিবেদিতা; কিন্তু, কাজটা যে খুব সরল ছিল, তা না। বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হল তাঁকে এবং এই কাজে অন্যান্য যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের। প্রথমত আপত্তি উঠল স্থানীয় সরকারী স্তর থেকে। মতানৈক্য এতদূর গড়ায় যে, টাটা শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার কর্মকর্তাদের মতামত সংগ্রহের

চেষ্টা করেন। সমস্যার সমাধানে, নানা কাজে, নানাভাবে সাহায্যে আসেন নিবেদিতা। নিবেদিতা এই সময় একটি ভোজসভার আয়োজন করেন, সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম-কর্তাদের নিয়ে, একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে। টাটার পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছিল, যার প্রভাব আমরা আজ পর্যন্ত অনুভব করি। অদূর ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়িত হয়ে কিরূপ নিয়েছে, আজ আমরা তার প্রমাণ পাই। কিন্তু স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির দিকে যেতে থাকে এবং টাটার পত্র প্রাপ্তির তিন বছর নয় মাসের মাথায়, ৪ জুলাই ১৯০২, স্বামীজী ইহলোক ছেড়ে চিরতরে চলে গেলেন রামকৃষ্ণলোকে। নিবেদিতা এবং টাটার, বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। সমস্ত প্রশাসনিক অন্তরায় কাটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসার আগেই, ১৯ মে ১৯০৪ জামসেদজী টাটা না ফেরার দেশে চলে গেলেন। আবার ঠিক সাত বছর পরে ১৩ই অক্টোবর ১৯১১, ভগিনী নিবেদিতা পাড়ি দিলেন রামকৃষ্ণলোকে। ইতিমধ্যে, ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হল টাটা বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

পৃথিবীতে জামসেদজী টাটার নাম যতদিন থাকবে, টাটার স্বপ্নের এবং টাটা নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠাতা ততদিন পৃথিবীতে থাকবে। তার সাথে স্বামীজীর নাম এবং ভগিনী নিবেদিতার নামও জুড়ে থাকবে। দীর্ঘ জাহাজ যাত্রার মধ্যে দুজন মানুষের কথোপকথন একটা চিন্তাধারাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত Tata Institute of Science যা পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করে Indian Institute of Science (১৯১১) হিসাবে। আজ এই প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের অন্যতম গৌরব। পরবর্তী পদক্ষেপে টাটার প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয় Tata Institute of Social Science এবং Tata Institute of Fundamental Research, যা ভারতবর্ষের বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

* The Life of Swami Vivekananda By his Eastern and Western Disciples Vols. I & Il - Advaita Ashrama
* যুগনায়ক বিবেকানন্দ-(তিন খণ্ড) স্বামী গম্ভীরানন্দ - উদ্বোধন
* চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ – স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত
++ অচেনা অজানা বিবেকানন্দ - শংকর

লেখক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, কে. কে. ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুল

প্রাণ

ডা. নবারুণ ঘোষাল (১৯৭৬, মাধ্যমিক)

প্রাণ কী? এই নিয়ে মানুষের কৌতূহল সেই আদি যুগ থেকে। অন্যান্য প্রাণীর এই চিন্তা মাথায় আসেনা।কারণ তাদের চিন্তার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান করে বাঁচতে হয়না। খাদ্যবস্তু অথবা কোনো শত্রু অথবা যৌনসঙ্গী সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় রয়েছে, তাদের সাহায্যেই তাদের বেঁচে থাকা চলে, বংশবিস্তার চলে। তাদের পরিকল্পনা সবই চলে কোনো মূহুর্তে তাদের ইন্দ্রিয়ের নাগালের মধ্যে থাকা জিনিসগুলোকে নিয়ে।

কিন্তু মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে থাকা জিনিস সম্পর্কেও পরিকল্পনা করে তাকে নিজের বেঁচে থাকার জন্য ব্যবহার করতে পারে।এটি মানুষের একটি বিশেষ ক্ষমতা, যাকে 'কল্পনা' বলা হয়।এছাড়া মানুষের আর একটা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন অঙ্গ আছে, তা হল তার স্বর যন্ত্র।এইযন্ত্র যতরকম শব্দ বের করতে পারে, পৃথিবীর আর কোনো প্রাণী তা পারেনা।এই শক্তিশালী স্বরযন্ত্র তাকে চিন্তাপ্রকাশ করার এক শক্তিশালী মাধ্যম উপহার দিয়েছে, যার নাম ভাষা।ভাষার সাহায্যে মানুষ একাধিক মস্তিষ্কের চিন্তাকে যুক্ত করে আরও অনেক বেশি পরিকল্পনা করতে পারে, অনেক বেশি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। পরবর্তীকালে মানুষ তার কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মস্তিষ্কের চিন্তাকে লিখে প্রকাশ করতে শিখেছে, যাতে স্বরযন্ত্রের ব্যবহার না করেই চিন্তাকে প্রকাশ করা যায়, অনেক বেশি ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং রেকর্ড করে রাখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কল্পনা এবং শক্তিশালী ভাষা --- এইদুটি বৈশিষ্ট্য মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে আলাদা করেছে, নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম করেছে।

ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে থাকা জিনিস নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্রানীটি স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা করবে প্রাণের প্রক্রিয়া নিয়ে। একজন মানুষ আমার পাশে বসে চা খাচ্ছিল, চা খেয়ে উঠে গিয়ে রাস্তা পেরোতে গেল, আর ট্রাকের চাকার তলায় চাপা পড়ে নির্জীব বস্তুতে পরিণত হল। এই পরিবর্তনটা ঠিক কী? কী সেই বৈশিষ্ট্য, যা একটি জীবিত বস্তুকে একটি নির্জীব বস্তুর থেকে পৃথক করে? মানুষ এর নাম দিয়েছে 'প্রাণ'। আরও একধাপ এগিয়ে, মানুষ কল্পনা করেছে 'আত্মা' নামে আর একটা বস্তুর, যা শরীরের মধ্যে থেকে শরীরকে চালনা করে। যেহেতু মৃত্যু কে এড়িয়ে চলা প্রতিটি প্রাণীর চরিত্র, সুতরাং এই কল্পনা প্রবণ প্রাণীটি কল্পনা করেছে যে সে মৃত্যুর পরেও এই আত্মার রূপ ধরে বেঁচে থাকবে।

আসুন, আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এই প্রাণের মূলগত ধারণায় পৌঁছতে চেষ্টা করি। অনেক সময় আমরা 'প্রাণশক্তি' (vital energy) কথাটা ব্যবহার করি। আমরা মনে করি, এইশক্তিই জীবিত বস্তুকে নির্জীব বস্তুর থেকে আলাদা করে। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের বইয়ে আমরা যে শক্তিগুলির উল্লেখ পাই, তাতে এই শক্তিটির উল্লেখ নেই। তাহলে এ কীরকম শক্তি, পদার্থ বিজ্ঞানীরা যার সন্ধান পাননি?

আসলে প্রাণ কোনো শক্তি নয়, এটি একটি বৈশিষ্ট্য, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে। ধাতুর বৈশিষ্ট্য হলো, তার পরমাণুর বাইরের দিকের কিছু ইলেকট্রন পরমাণুর সীমান্ত ছাড়িয়ে মুক্ত হয়ে বিচরণ করে, যারা বিদ্যুতের সংস্পর্শে এলে পরমাণুর আকর্ষণ ছাড়িয়ে চলতে শুরু করে। যার জন্য ধাতু বিদ্যুতের সুপরিবাহী। চুম্বকের বৈশিষ্ট্য হলো, সে লোহা, নিকেল ইত্যাদি বস্তু কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। এছাড়া চুম্বককে কোনো ধাতুর কাছে নিয়ে গিয়ে নাড়ালে তা সেই ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন গুলির মধ্যে

গতির সঞ্চার করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে।

তেমনি, যাকে আমরা জীবিত বস্তু বলি, তারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন বলে দুই ধরণের রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যাদের শৃঙ্খলাকার অণুগুলি পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল গুলির প্রতিরূপ সৃষ্টি করে। যে বস্তুর মধ্যে এইভাবে নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রতিরূপ তৈরি হয়, তাকে আমরা জীবিত বস্তু বলি। যে বস্তুর মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রতিরূপ তৈরির প্রক্রিয়া চলে না, তাকে আমরা নির্জীব বস্তু বলি। তাহলে এককথায়, জীবিত বস্তুর বৈশিষ্ট্য হল তার নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রতিরূপ সৃষ্টি।

পৃথিবীর আবহাওয়া ঠান্ডা হবার পর থেকে পৃথিবীর জলে উপস্থিত অ্যামোনিয়া, কার্বনডাই অক্সাইড, মিথেন এইসব রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ার ফলে নানান রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরির উপাদান গুলি সম্ভবত অনেক পরে তৈরি হয়েছে, হয়তো কোটি কোটি বছর পরে। যদিও আজ ল্যাবরেটরিতে অজৈব উপাদান থেকে নিউক্লিক অ্যাসিডের শৃঙ্খল তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু পৃথিবীর আদিম আবহাওয়ায় নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুগুলি কিভাবে তৈরি হয়েছিল, তা এখনও বিস্তর গবেষণার বিষয়।

যাই হোক, প্রকৃতিতে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হওয়া হল জীবিত বস্তু তৈরি হওয়ার পূর্ব শর্ত মাত্র। বর্তমানে আমরা জীবিত বস্তুগুলিকে যেভাবে পাই, তাতে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি বিশেষ আন্তঃ সম্পর্ক রয়েছে। নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল গুলি তৈরি হয় চার ধরণের নিউক্লিওটাইড অণু সিঁড়ির মতন জোড়া লেগে লেগে। এই সিঁড়িতে চার ধরণের নিউক্লিওটাইড অণুগুলির পারম্পরিক বিন্যাস অনুযায়ী একটি জীবিত বস্তুর কোষের মধ্যে কুড়ি ধরণের অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু মালার মতন সজ্জিত হয়, যে মালা গুলিকে প্রোটিন অণু বলা হয়। উল্টো দিকে, এক একটা মালার মতন প্রোটিন অণু গুটিয়ে গিয়ে এবং একাধিক প্রোটিন অণুর সাথে মিলে নানা আকৃতির বস্তু কণা গঠন করে, যেগুলো দিয়ে 'কোষ' নামের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়, যা ঐ বিশেষ নিউক্লিক অ্যাসিডের শৃঙ্খলটিকে বারবার বিভাজিত হয়ে নিজের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

তাহলে কোনো বস্তুকে জীবিত বস্তু বলতে হলে তার আবশ্যিক শর্ত হলো তার কোষের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন অণুগুলির একটা বিশেষ আন্তঃ সম্পর্ক, যেখানে নিউক্লিক অ্যাসিডের নিউক্লিওটাইড বিন্যাস অনুযায়ী প্রোটিন অণুগুলি তৈরি হবে এবং সেই প্রোটিন অণুগুলি সেই নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল গুলির প্রতিরূপ তৈরি করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

বোঝাই যাচ্ছে, এই আন্তঃ সম্পর্ক একদিনে তৈরি হয়নি। কোটি কোটি বছর ধরে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন অণু গুলি তৈরি হয়েছে আর নষ্ট হয়ে গেছে, যত দিন না তারা কাছাকাছি এসে নিজেদের মধ্যে এই আন্তঃ সম্পর্ক তৈরি করে জীবিত বস্তু তৈরি করতে পেরেছে। অতএব, আমরা মাত্র কয়েক শতাব্দীর বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্জীব বস্তু থেকে জীবিত বস্তু তৈরি করতে পারিনি বলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, আমরা এর মধ্যেই নির্জীব বস্তু থেকে প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করতে পেরেছি। প্রকৃতির কয়েক কোটি বছরের কাজ করতে আমাদের হয়তো আর কয়েক দশক অথবা কয়েক শতাব্দী লাগতে পারে।

নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খলগুলির বিভাজনের সময় তার নিউক্লিওটাইড এর বিন্যাস অনেক সময়েই পরিবর্তিত হয়, যার ফলে তা আর কোষের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সংকেত বহন করতে পারে না। ফলে সেই কোষটির মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কখনো কখনো নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিবর্তন সত্ত্বেও কোষটি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। আমাদের দেহ কোষের এরকম পরিবর্তনের ফলে টিউমার বা ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। আর জনন কোষে এরকম পরিবর্তনের ফলে আমাদের বাচ্চাদের শরীরে পরিবর্তন ঘটতে পারে। সেই পরিবর্তন সত্ত্বেও

যদি সেই বাচ্চা তার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, তা হলে তার পরের প্রজন্মের বাচ্চাদের শরীরে সেই পরিবর্তনটি থেকে যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এইরকম সব পরিবর্তন একটু একটু করে জমা হতে হতে এক সময় একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর চেহারা এত বেশি পাল্টে যায় যে তখন আর তাকে তার আগের প্রজাতি হিসেবে চেনা যায় না। তখন তাকে একটি নূতন প্রাণী বা উদ্ভিদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এবার এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা 'প্রাণ' শব্দের একটি সংজ্ঞা তৈরি করতে চেষ্টা করি।

প্রাণ হল একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিবেশের মধ্যেকার কতক গুলি সম্মিলিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ, যে বিক্রিয়াগুলির দ্বারা সে তার বাইরের পরিবেশের সাথে কিছু নিরন্তর বিনিময় প্রক্রিয়া চালিয়ে তার নিজের মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের নিউক্লিক অ্যাসিডের শৃঙ্খলের বিভাজন সুনিশ্চিত করতে পারে। এই স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিবেশটিকে একটি জীবিত বস্তু বলা হয়।

যখন সেই পরিবেশটির মধ্যে তার নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, তখন তা নির্জীব বস্তুতে পরিণত হয়, এবং তার বিভিন্ন উপাদান আশে পাশের অন্যান্য নির্জীব বস্তুর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে মিশে যায়।

চুম্বকত্ব যেমন চুম্বকের বৈশিষ্ট্য, প্রাণ তেমনি জীবিত বস্তুর বৈশিষ্ট্য। চুম্বকের মধ্যে ইলেকট্রন গুলির সজ্জা যেমন চুম্বকত্বকে ধরে রাখে, জীবিত বস্তুর মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজন তেমনি প্রাণকে ধরে রাখে। চুম্বককে গরম করলে যেমন ইলেকট্রন গুলির সজ্জা নষ্ট হয়ে গিয়ে তার চুম্বকত্ব চলে যায়, জীবিত বস্তুকে গরম করলে তেমনি নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজন বন্ধ হয়ে গিয়ে তার প্রাণ চলে যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, মস্তিষ্কের মৃত্যু, এগুলো তাহলে কি? প্রথমেই বলি, এই কথাগুলো আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারে বলে থাকি। কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়ার প্রাণ, একটা গাছের প্রাণ আর একজন মানুষের প্রাণের মধ্যে একটা মূল বিষয় আছে, তা হল তাদের নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজন। একটা ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজন বন্ধ হয়ে গেলে তাকে মৃত বলা হয়। একটি বহু কোষী উদ্ভিদের সবগুলো কোষে নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজন বন্ধ হয়ে গেলে সেই উদ্ভিদটিকে মৃত বলা হয়। মানুষ একটি পরজীবী বহুকোষী প্রাণী। তার সমস্ত কোষে নিউক্লিক অ্যাসিড শৃঙ্খল গুলির একই বিন্যাস থাকে, কারণ তার গোটা শরীরটা প্রাথমিক কোষ থেকে বিভাজিত হতে হতে তৈরি হয়েছে। তার প্রতিটি কোষে সেই নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজনের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য তাকে বাইরে থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করতে হয়, যেমন অক্সিজেন, বিভিন্ন ধাতু আর অধাতু। এছাড়া তাকে উদ্ভিদ বা অন্যান্য প্রাণীর শরীর থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড, বিভিন্ন ধরণের চিনি, ফ্যাটি অ্যাসিড ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হয়, কারণ সে উদ্ভিদের মতন করে অজৈব বস্তু থেকে এসব তৈরি করতে পারে না।

মানুষ ফুসফুসের মাধ্যমে অক্সিজেন সংগ্রহ করে, পরিপাক যন্ত্রের সাহায্যে অন্যান্য বস্তু গুলি হজম করে এবং শোষণ করে। তার কোষে কোষে নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে এইসব উপাদান রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে কোষ গুলিতে পৌঁছয়। এই রক্ত পাম্প করে হৃদযন্ত্র। কাজেই, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেলে এইসব উপাদান আর কোষগুলিতে পৌঁছতে পারেনা, তখন সেই কোষগুলিতে আর নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজনের পরিবেশ বজায়থাকেনা। এরফলে সমস্ত দেহ কোষের মৃত্যু ঘটে। মস্তিষ্কের কোষগুলিতে এইসব উপাদান না পৌঁছলে তাদের মৃত্যু ঘটে, ফলে চেতনা লুপ্ত হয়। কিন্তু অনেক দেহকোষ তখনও জীবিত থাকে। তাদেরকে যদি কোনো জীবিত মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়, তাহলে সেই দেহের রক্ত সরবরাহের মাধ্যমে ঐ সব উপাদান পেয়ে আবার তাদের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এইভাবে চোখের

কর্নিয়া, লিভার, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, কিডনি ইত্যাদি অন্য মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপিত করে সেই অঙ্গ গুলিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, যদিও তাদের আসল মালিকের মৃত্যু আগেই ঘটে গেছে।

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, জীবিত বস্তুর আসল পরিচয় হল তার মধ্যে তার নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভাজনের পরিবেশ বজায় থাকা। জীবিত বস্তু এক বিশেষ ধরণের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মধ্যে আত্মার সন্ধান করতে যাওয়া বৃথা। প্রাণ হল সেই জীবিত বস্তুর মধ্যে ঘটে চলা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ।

লেখক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক

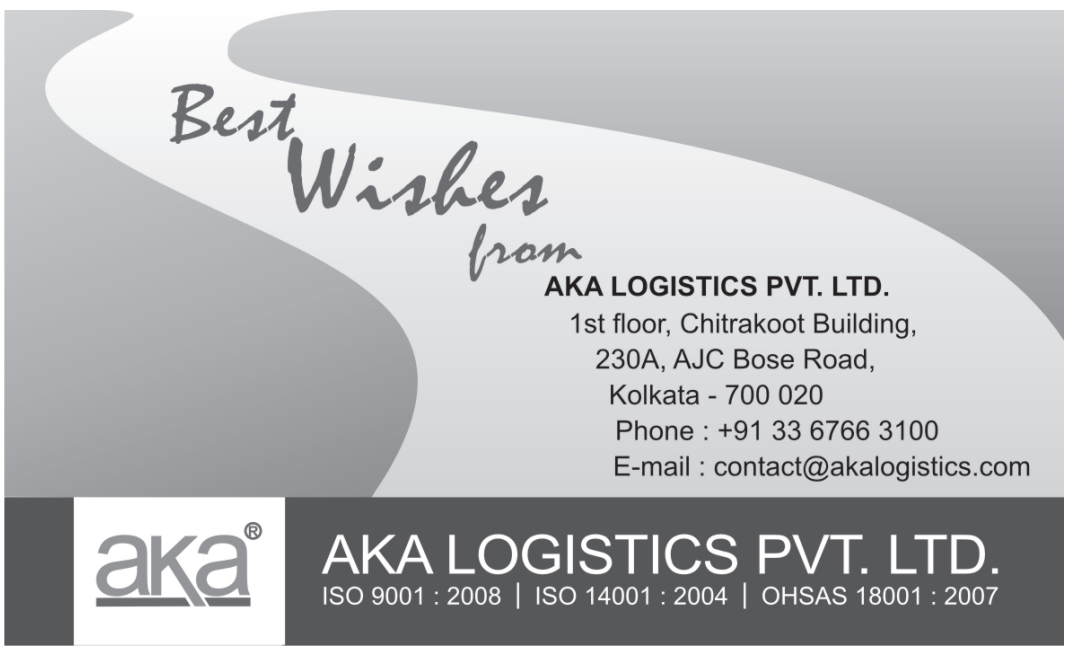

রহস্যময়ী রূপকুণ্ড

ডা. শান্তনু মিত্র (১৯৭৬, মাধ্যমিক)

রুট ম্যাপ

'উও দেখিয়ে, হমলোগো কা কালকা যানে কা রাস্তা' - গাইড নারায়ণের বাড়িয়ে দেওয়া আঙুলের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাই! ধূ ধূ বরফের ঢালের মধ্যে রাস্তা কোথায়? এ কি ধরনের রসিকতা?

সবেমাত্র মিনিট পনেরো হল হাঁচোড়-পাঁচোড় করে আমরা পাঁচজন, নারায়ণের সাথে পাথরনাচুনিয়া থেকে কৈলু বিনায়ক টপে উঠেছি। শ্বাস স্বাভাবিক হয়নি, সামনে ফুটে ওঠা দৃশ্যের বিস্ময়ের ঘোর থেকে বেরোতেই পারি নি, এর মধ্যে আবার কালকের সামিটের রাস্তা! বাঁ দিকে চোখ তুললে, বাঙালীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল শৃঙ্গ নন্দাঘুন্টি, ডানদিকে মৃগথুনী, মাইকতোলি। আর সামনের সম্পূর্ণ দৃশ্যপট জুড়ে বিশালাকৃতি ত্রিশূল। তারই কোল ঘেঁষে একদিকে ইঙ্গিত করে আছে নারায়ণের আঙুল।

নিচের উপত্যকা থেকে হু হু করে উঠে আসছে সাদা মেঘের দল, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢাকা পড়ে যাবে চারপাশ। তড়িঘড়ি শাশ্বতর ক্যামেরার টেলিলেন্সে চোখ রাখতেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আর অজান্তেই নিজের শিরদাঁড়া বরাবর এক হিমশীতল অনুভূতি গড়িয়ে গেল। উপরে নিচে দুই ৪৫ ডিগ্রি বরফের ঢালের মাঝখান চিরে সরু ফিতের মত যেটা পড়ে আছে, সেটাই কালকের রাস্তা! পিঁপড়ের আকৃতির কিছু নড়াচড়া দেখে বোধ হয় আজকের যাত্রীরা এখনও ঐ রাস্তায় আছে। নারায়ণ তখনও উৎসাহ ভরে দেখিয়ে চলেছে আরো এগিয়ে কেমন করে ঐ রাস্তা ছেড়ে ৭০ ডিগ্রি খাড়াই এক বরফের ঢাল বেয়ে উঠলেই ওপাশে রূপকুণ্ড।

রহস্যময়ী রূপকুন্ড বা skeleton lake। এই হাই অল্টিটিউড ট্রেকের চিরকালীন আকর্ষণ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর রহস্যে মোড়া রূপকথা ঘিরে। ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এক গ্লেসিয়াল লেক, তার চারপাশে পড়ে থাকা হাজার বছরের পুরনো নরকংকালের অবশিষ্ট, পৌরাণিক মতে শিবের ত্রিশূল-সৃষ্ট দেবী পার্বতীর স্নানের হ্রদ, অথবা উপকথা অনুসারে দেবীর শাপে পাথর হয়ে যাওয়া সপার্ষদ রাজা, এর যে কোনো একটি কারণই আমাদের পাহাড়-প্রেম কে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট হত। আমরা পাঁচ বন্ধু প্রায় ছ'বছর ধরে এই ট্রেক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে এ পথে এগিয়েছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে চলা ইন্ডিয়াহাইকস্‌এর ২৭ জনের এই দলটি পুরো ছন্নছাড়া। বেশির ভাগ যেমন একদম আনকোরা ট্রেকার, তেমনি তীর্থযাত্রীও(!) বাদ নেই। স্বাভাবিক কারণেই দ্বিতীয় দিনের পর থেকে দলের সদস্য সংখ্যা কমতে আরম্ভ করেছে।

এই ধরনের এজেন্সিদের যেটা লক্ষ্য থাকে, শেষ মুহূর্ত অবধি দল বাড়িয়ে যাও। বাড়তে বাড়তে ঊর্ধসীমা

২০ থেকে এখন ২৭। স্বাভাবিকভাবে কাঠগোদামের বাস থেকে শুরু করে বেসক্যাম্প লোহাজং এ থাকার জায়গা অবধি গাদাগাদি। ৮০০০ ফুট লোহাজং থেকে শুরু করে চতুর্থ দিনের সকালে আমরা ১৪৫০০ ফুট উচ্চতায় কৈলু বিনায়ক টপে দাঁড়িয়ে। ২ কিমি দূরে শেষ ক্যাম্প বগুয়াবাসা। সেখান থেকে রূপকুণ্ড আনুমানিক ৪ কিমি। দলের আরো সক্ষম চার/পাঁচজন আমাদের আগেই বগুয়াবাসার দিকে এগিয়ে গেছে।

আমরা প্রাণভরে এখান থেকে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করে, কৈলু বিনায়কের পূজো দিয়ে এগোলাম আবার। আবহাওয়া দ্রুত খারাপ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগের ঝকঝকে আকাশ এখন ঘন মেঘে ঢাকা। ক্যাম্পে পৌঁছনোর আগেই মিহি তুলোর মত বরফের গুঁড়ো উড়তে শুরু করলো। আমরা গতি বাড়ালাম।

সামিট ও তারপর

তুষার ধ্বস প্রবণ এলাকা

বাড়ানো পা'টা নিজের দিকে টেনে নিয়ে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে আমি নারায়ণ কে বললাম, এই পর্যন্তই, এখান থেকে আমি ফিরবো। দলের স্বার্থে বোঝা হয়ে আরো এগোতে আমি রাজি নই। রাতের আকাশে এখনও তারারা জেগে। ইতস্তত চোখে পড়ছে গতিমান টর্চ, কারো মাথায়, কারো হাতে। কাল একরাশ চিন্তা ভাবনা আলোচনার পর যখন আমরা স্লিপিং ব্যাগে ঢুকলাম, তখন দল আরো ভেঙে গেছে। পুণা থেকে আসা অনুজা'রা তিনজনের মধ্যে দু'জনের জ্বর বলে আর এগোতে চায় না। ভোর সাড়ে তিনটেয় উঠে ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রস্তুতি সেরে আমরা বাকি দল নেমে পড়েছি সর্দার সিং আর নারায়ণের সঙ্গে। হুনিয়াথর ক্যাম্প থেকে এক কিমি পথ আসতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। বোল্ডার জোন, সরু রাস্তা, বাঁ পাশে খাদ, তাও আধঘন্টায় পেরিয়ে এসেছি। তারপরেই সামনে শুরু এই অন্তহীন বরফের পথ। শক্ত, পিছল বরফে আইস এক্স দিয়ে পথ কাটতে কাটতে এগোচ্ছে সর্দার। তার পিছন পিছন দলের সক্ষম ট্রেকাররা। এমন কি তারাও টালমাটাল খাচ্ছে। আমাদের শাশ্বত, সুমন, শরদিন্দুরা মোটামুটি সামলাচ্ছে, ভোলা ও একরকম। আমি বরফে প্রথম পা বাড়িয়েই বুঝতে পেরেছি আমার জুতোজোড়া একেবারেই অনুপযুক্ত এ পথের জন্য। তাই বেঁকে বসেছি আর যাবোনা বলে। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে শারীরিক দিক দিয়ে আমি সবথেকে কমজোরী, বয়সটাও অর্ধশতক পার হয়েছে। শুধুমাত্র অসম্ভব মনের জোর, আর তীব্র ভালোবাসায় এতোটা পথ এগিয়েছি। এখন এখান থেকে ফিরে যেতে হলেও আমার মনে কোনো গ্লানি থাকবে না। ট্রেক আমার কাছে একটা গন্তব্য জয় নয়। প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত এখানে আমার কাছে দেবতা দর্শনের সমান। প্রথম দিন লোহাজং থেকে দিদিনার পথে নামার সময় যে আকাশ, যে হাওয়া, যে সমস্ত মানুষ আমাকে স্বাগত জানিয়েছিল, তাদের ভিতর দিয়েই আমার সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে। আলী বুগিয়ালের ঐ অপরূপ সৌন্দর্য, বৃষ্টি ধোওয়া বেদিনী বুগিয়াল থেকে অস্তগামী সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত ত্রিশূল, ঘোড়ালোটানিতে ভয়ংকর শিলাবৃষ্টির জেরে তিন ঘন্টা আটকে থাকা, আর এই অসম্ভব ছন্নছাড়া দলটির প্রত্যেকটি সদস্য, এই সবের মধ্যে দিয়েই আমার ট্রেক সার্থক হয়ে গেছে। বাকি যা পাওয়া, সেটা উপরি। নারায়ণ সহজ, সরল গ্রামের মানুষ। এত জটিল মনস্তত্ত্বের ধার ধারে না। আমাকে পিছিয়ে আসতে দেখে ও জোরের সঙ্গে জানালো যে আমাকে ও রূপকুণ্ড অবধি নিয়ে যাবেই! এই ভালোবাসার জোরের কাছে হার স্বীকার করতেই হয়। আর এ আমাদের ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতাদের করা প্রতিশ্রুতি নয়!! পাহাড়ি মানুষের জবান।

শুরু হল এরপর সেই অসম মরণপণ লড়াই। পা টিপে টিপে, কখনও আছাড় খেয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে আমার উপর দিকে উঠে চলা। আর নারায়ণ, কখনও পিছন থেকে ঠেকনা দিয়ে, সামনে থেকে হাত ধরে টেনে, অথবা খাদের দিকে পুরো শরীর দিয়ে ঢালের মত আড়াল করে আমায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া! মৃত্যুভয় কে যেমন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেছি, ঈশ্বরের উপস্থিতিও তেমনি প্রত্যক্ষ করেছি। রূপকুন্ডের ছবি নয়, মনের মধ্যে শুধুই সেই প্রিয় মানুষগুলোর মুখ ভাসছে, যাদেরকে ছেড়ে এ পথে এসেছি! বুকের মাঝে কাঁপুনি যেমন জাগছে, চোখ জুড়িয়ে যাওয়া এই ভয়ংকর সৌন্দর্য তেমনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। ঘন্টাখানেক পরে একটু যুদ্ধবিরতি, দম নেওয়ার মত একটু ফাঁক, চোখ তুলে চারপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করার মত একটু নিশ্চিন্দি। আর তার সঙ্গে অফুরন্ত ফোটোসেশন! রূপকুণ্ডের উপরে জিয়ুনার কলের মাথায় সূর্যের প্রথম টিকা, অনবদ্য। দূরে, উল্টোদিকের নীলকণ্ঠ, চৌখাম্বা উদ্ভাসিত ভোরের মায়াবী আলোয়। নিচে, পার হয়ে আসা বিস্তীর্ণ বরফের প্রান্তরে ইতস্তত পিঁপড়ের মতো নড়াচড়া করা আমাদের দলের বাকিরা।

পর্বতারোহী দল

এইসব ছেড়ে বাস্তবের দিকে চোখ ফেরাতেই হয়, আর তখনই বুকের ধুকপুকুনি বাড়তে থাকে। সামনে পরপর সেই ৭০ ডিগ্রি কোণের ঢালদুটো। সর্দার একটু রেইকি করে এসে আমাদের তাড়া লাগালো। রওয়ানা দিলাম আমাদের দলটা। প্রথম ঢালের নিচে দাঁড়িয়ে আমার মুখ দেখে নারায়ণ যা বোঝার বুঝে নিলো। আমার হাতটা কঠিন মুঠোয় চেপে বললো 'ছোড়না নহী, কিসী ভী হালৎ মে, অউর রুকনা নহী।' তারপর এক হ্যাঁচকা টান মেরে দৌড় দিল উপর দিকে! আমি কিছু বোঝার আগেই দেখলাম নারায়ণের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে আমি উপরে উঠছি। ধকধক ধকধক শব্দে হার্ট যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজের মুখের চেহারা তো দেখতে পাচ্ছি না! কোনরকমে মুখ দিয়ে বেরোলো, 'রুকো, রুকো, নহীঁ তো মর জাউঙ্গা।' নারায়ণের দয়া হল। সে দৌড় থামালো। হ্যা হ্যা করে হাপরের মত শ্বাস ফেলতে ফেলতে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ঢালটার অর্ধেকের বেশি আমরা উঠে এসেছি! বাকি ঘোর কাটিয়ে বাস্তবে ফেরার আগেই নারায়ণের দ্বিতীয় হ্যাঁচকা দৌড়, আর মিনিট খানেকের ভিতরেই আমরা ঢালের উপরে! আস্তে আস্তে দম ফেরার সাথে সাথে ঠিক কি ম্যাজিকটা ঘটলো সেই উপলব্ধিটা মাথার মধ্যে ঢুকছিলো। সামনের ঢালটা আর সরাসরি নয়, বাঁদিক দিয়ে ঘুরে বড় ইউ টার্ন নিয়ে আমরা পার হলাম। আর তার পরেই সেই স্বপ্নের মুখোমুখি। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে তার তিন/চারশো ফুট নিচে রহস্যময়ী রূপকুণ্ড, skeleton lake। ডানদিকে কয়েকশো ফুট উপরে জিয়ুনার কলের বরফে পিছলে পড়ছে ভোরের সোনালী ঝিলিক। এক অপার্থিব স্বর্গীয় অনুভূতির সাক্ষী আমরা।

এক অদ্ভুত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি নিচে ঐ প্রায় জমে যাওয়া ছোট্ট হ্রদটির দিকে। কত রূপকথা, উপকথা, কল্পনা, গবেষণা এই প্রাকৃতিক সৃষ্টিকে ঘিরে। শিবঠাকুরের তৈরি পার্বতীর স্নানের জন্য এই জলাধার, যেখানে

নিজের রূপ দেখে দেবী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন! লেকের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা তিনশোরও বেশি মানুষের হাড়, কখনও বা ছেঁড়া কাপড়-জামার অংশ সহ, ইত্যাদি থেকে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন গল্প। দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী, অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার কোন তীর্থযাত্রীর দল। বা নন্দাদেবীর রোষে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সেই উদ্ধত রাজা ও তার দলবল! কোনো গল্পটাই শেষমেশ ধোপে টেঁকে না। অবশেষে বিজ্ঞানের হাত ধরে যে সত্য উঠে এলো তা হল, এক ভিন্ন প্রদেশের তীর্থযাত্রীরা, সঙ্গে যাদের মেয়ে ও শিশুরাও ছিলো, আর স্থানীয় মালবাহকের দল, এক বিধ্বংসী শিলাঝড়ের সামনে এই দুর্গম আশ্রয়হীন প্রান্তরে ভয়াবহ মৃত্যুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ। আজ এখানে পৌঁছতে পারার বিস্ময়কর ভালোলাগার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে এসব চিন্তা ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রায় তিন ঘন্টার দুরন্ত চেষ্টায় আমাদের ১৯ জন এই শেষ লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে সবাই। কেউ কেউ বরফে গ্লিসেডিং করে নেমে যাচ্ছে রূপকুণ্ডের পাশে, কেউ গড়াগড়ি দিচ্ছে বরফে, হাসছে, কাঁদছে! কেউ আবার মুগ্ধ আকর্ষণে তাকিয়ে আছে জিয়ানুর কলের দিকে, পা বাড়ালেই হয়! সর্দাররা বারবার মানা করছে, বরফের গভীরতা বিপজ্জনক আজ ওদের মতে। আর চলছে মুহূর্মুহু ক্যামেরার শাটার টেপা। নিজেদের স্মৃতিটুকু ধরে রাখা যাবে, তা বাদে বাকি এই অবিস্মরণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ক্যামেরাতে ধরা অসম্ভব। আর আমার কি অবস্থা! এই বিরাটত্বের সামনে এসে দাঁড়াতে পেরে আমি সম্পূর্ণ মূক, স্তব্ধ হয়ে গেছি। একদিকে নিজের ক্ষুদ্রতাকে উপলব্ধি করা, অন্যদিকে এক বিশাল মহিমার কাছে এসে পৌঁছতে পারার অবর্ণনীয় আনন্দ। পাহাড়ের রীতি অনুযায়ী স্থানীয় দেবতা নন্দাদেবীর পূজো দিলাম আমরা ধূপ জ্বালিয়ে এক ছোট্ট অস্থায়ী পাথরের মন্দিরের সামনে। বিস্ময় ফুরোনো তখনও বাকি। গোটা দলটা যখন সামিট করার আনন্দে মত্ত, তখন আমাদের সাপোর্ট স্টাফদের তিনটি ছেলে এসে পৌঁছলো। হাতের ক্যাসারোলে আলুর পরোটা, আচার!! আমরা ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরে এই সব বানিয়ে তারা বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছে এখানে, কারো কারো পায়ে আবার হাওয়াই চপ্পল! রূপকুণ্ড কে সাক্ষী রেখে আলুর পরোটা দিয়ে প্রাতরাশ! মরার আগে অবধি এ স্মৃতি ভোলা যাবে না।

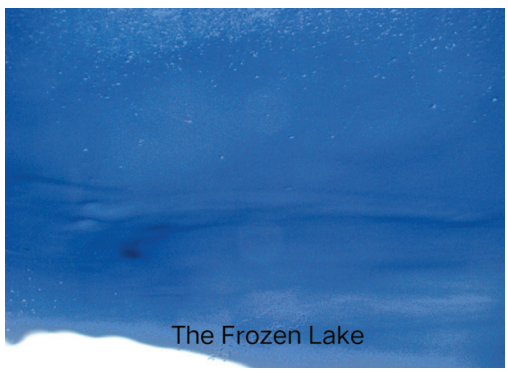
The Frozen Lake

নামার পথে দম নিতে যখনই থেমেছি, পিছনের দিকে চোখ চলে গেছে। অন্যদের কথা জানি না, ঐ অপার্থিব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েও আমার মনে হয়েছে কি করে এই রাস্তা পার হয়ে আমি পৌঁছলাম ওখানে! এক এক করে অ্যাভালান্স জোন গুলো পার হয়ে সর্দারদের মুখে হাসি ফুটলো। খাবার জল শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, মুখের ভিতরটা শিরিষ কাগজের মত শুকনো। ভয়ে, উত্তেজনায়, পরিশ্রমে ভিতর অবধি ভিজে একসা। চার প্রস্থ জামা-কাপড়ের একদম ভিতরের টি শার্টটা নিংড়োলে এক মগ জল বেরোবে নির্ঘাত! পথে বরফ গলা একটা জলের ধারা দেখে সেখানেই মুখ লাগিয়ে আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটালাম সবাই। হুনিয়াথরের ক্যাম্পে পৌঁছে তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে আবার পথে নেমে পড়া। সময় যে নেই, দুপুর বারোটা বাজে প্রায়, এখনও ১৫ কিমি হেঁটে বেদিনী ক্যাম্পে পৌঁছতে হবে। অনুজা রা অপেক্ষা করছিলো। আমাদের ওষুধে সমতা ও পল্লবী ভালোই আছে। সবাই একসঙ্গেই বেরোলাম ফেরার পথে।

সত্যি, কি পাই আমরা এরকম সব পিছুটান কেটে পাগলের মত দৌড়ে পথে বেরিয়ে পড়তে? প্রকৃতির সৌন্দর্য? ঈশ্বরের স্পর্শ? ট্রেক জয় করার শ্লাঘা? অথবা কেবল দৈনন্দিন সাংসারিক বিরক্তি থেকে পালানো?! মনের

ভিতর একরাশ প্রশ্ন নিয়ে যন্ত্রের মত এগিয়ে চলি বেদিনী বুগিয়ালের দিকে। আস্তে আস্তে দেখি কখন যেন একলা হয়ে গেছি চলার পথে, সঙ্গের সাথীরা কেউ এগিয়ে গেছে, কেউ বা পিছিয়ে পড়েছে! চারপাশের অনন্ত নিস্তব্ধতার মাঝেই খুঁজে পাই উত্তর। মানুষ কে জানার, নিজেকে জানার, এর থেকে বড় সুযোগ বা অবকাশ আর কোথায় পাবো!

গত পাঁচ/ছ বছর ধরে ঘুমে-জাগরণে যে রহস্যময়ী রূপকুণ্ডের পথ স্বপ্ন দেখাত বারবার, আজ সেই স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফিরে চলেছি। ফিরে চলেছি তাদের কাছে, এই স্বপ্নের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাদের আত্মত্যাগ সবথেকে বেশি। আমার কোনো ট্রেকেই সঙ্গে না থেকেও, আমার বউ, মেয়ে আমার সবচেয়ে বড় সঙ্গী। ওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাইনা।

ট্রেকের গল্প, উত্তেজনা ফুরিয়ে গেছে। এখন শুধু মনের জোরে ক্লান্ত পা দুটোকে টানতে টানতে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া। জানা ছিলো না, সেখানেও অপেক্ষা করে আছে এক মধুর বিস্ময়। রাত চারটেতে যে অভিযান শুরু করেছিলাম, ক্লান্তি অবসাদে মাখামাখি হয়ে বিকেল চারটের সময় যখন আমি বেদিনী ক্যাম্পে এসে ঢুকলাম, হাততালি আর উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিল আমার সতীর্থরা সবাই। না, প্রায় সবাই! এই দলটি তে আমি অন্যতম বয়ঃজ্যেষ্ঠ। যারা অনেক আগেই ট্রেকের পথ ছেড়েছিল, যেভাবে তারাও আমায় অভ্যর্থনা জানালো, যেন আমার এই সার্থকতা তাদেরও নিজস্ব জয়। মৃত্যুভয়ের মুখ থেকে সফলতার এই শিখরে ফেরার আনন্দ-উজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষী হিসেবে আমার অভিব্যক্তি ধরা পড়লো শাশ্বতর ক্যামেরায়। আর আমার অন্তর চির কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে রইলো এক সার্থকনামা মানুষের কাছে; নারায়ণ সত্যিই ঈশ্বরের স্বরূপ আমার জীবনে। জানি আজ শরীর ক্লান্ত থাকবে অসম্ভব, কিন্তু মন ছটফট করবে এক তীব্র উন্মাদনায়। আর একটু পরে সকলে মাতবে ট্রেকের শেষ রাতের ক্যাম্প-ফায়ারে। তারপর কাল আলী বুগিয়ালের দিকে না গিয়ে অন্য পথে আমরা নেমে যাব গেহরোলি পাতাল হয়ে ওয়ান গ্রামের দিকে। সেখান থেকে আরো আরো দ্রুত গতিতে সভ্যতার যন্ত্রণাময় বন্ধনের মাঝে। ঐ বাঁধনেই আবার জড়িয়ে থাকবো ততদিন, যতদিন না সেই পাগলা কুকুরটা আবার কামড়ায়! আসি, আবার দেখা হবে নিশ্চই।

বিঃ দ্রঃ - সরকারি নিষেধাজ্ঞায় বুগিয়ালে ক্যাম্পিং বন্ধ হওয়ার ফলে লেখক বর্ণিত রূপকুণ্ডের রাস্তা বর্তমানে খোলা নেই।

লেখক চক্ষু চিকিৎসক ও ভ্রমণপিপাসু

এক্সকার্সনের গল্প

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৬, মাধ্যমিক))

এখন কি অবস্থা জানিনা, আমরা যখন বিদ্যাপীঠে পড়তাম, সেই ১৯৬৯-৭৬ সালে, তখন আমাদের ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হত এক্সকার্সনে যাবার ব্যাপারে। প্রত্যেক বছরে অবশ্য আমাদের যাওয়া হত না, তবে সেই সাত বছরে, আমার মনে পড়ে, বার চারেক আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলাম।

ক্লাস ফোরে আমরা কোথাও যাইনি। সে বছর উচু ক্লাসের এক্সকার্সন হয়েছিল পাঞ্চেৎ ড্যামে, সেখানে কয়েকজন ছাত্র জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। বন্ধুদের চলে যাবার দুঃখে আর একজন রেললাইনে ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। তখন আমরা খুব ছোট, বিশেষ ডিটেইলস জানা বা বোঝার বয়স হয়নি। তবে একটা বিষাদের বাতাবরণ বিদ্যাপীঠকে বেশ কিছুদিন ঘিরে ছিল, এটা মনে আছে। তাই আমাদের কোন এক্সকার্সন হয়নি। আর ক্লাস ফাইভে, ১৯৭০ সালে, নকশাল আন্দোলনের ঢেউ বিদ্যাপীঠেও লেগেছিল, স্কুল অনেকদিন বন্ধ ছিল।

আমরা প্রথমবার গিয়েছিলাম পরেশনাথ পাহাড়ে, ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়। ডে ট্রিপ। পাহাড়ের ওপরে একটা জৈন মন্দিরে কিছু দিগম্বর সাধুকে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। এই ট্রিপের একটা গ্রুপ ফটো এখনও মাঝে মাঝে দেখি, আমাদের ব্যাচের হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপে। আমাদের সঙ্গে দয়াময়দা আর ফণীদা গিয়েছিলেন, যদ্দুর মনে পড়ে।

ক্লাস এইটে আমরা গিয়েছিলাম জয়রামবাটি, কামারপুকুর, বিষ্ণুপুর। তখনও বিদ্যাপীঠের নিজের বাস হয়নি, ভাড়া করা বাসে যাওয়া হত। তা সেই বাস দু নম্বর মাঠের মধ্যে পার্ক করা ছিল, আমরা রওনা দেবার সময় দেখা গেল, তার একটা চাকা বৃষ্টিভেজা মাঠের কাদার মধ্যে বসে গেছে। আমাদের কি মন খারাপ! এক্সকার্সনটাই না ক্যানসেল হয়ে যায়! অনেক ধস্তাধস্তি, প্যাঁচপয়জারের পরে সে বাস সচল হল, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আর একটা কথা মনে পড়ছে, বাসে জানালার ধারের সীটে বসার জন্যে কি হুড়োহুড়িটাই না হত!

রাতে ছিলাম জয়রামবাটিতে, একটা দোতলা মাটির কুঁড়েঘরে। মাটির বাড়িতে আমি কখনও থাকিনি, সেই প্রথম আর সেই শেষ। তখন জয়রামবাটি একেবারেই অজ পাড়া গাঁ ছিল। ইলেকট্রিক ছিল না, যেখানে ছিলাম। অন্ধকার রাত্রিতে গ্রামের মেঠোপথ, চারদিকে পুকুর আর ঝোপঝাড়। তার মধ্যে আবার অঞ্জনের ব্যাগ কেউ জানালা দিয়ে আঁকশি বাড়িয়ে চুরি করে নিয়েছিল। বেচারাকে দু'দিন একবস্ত্রে কাটাতে হয়েছিল। পরের দিন আমরা কামারপুকুর গিয়েছিলাম, সেটা জয়রামবাটির তুলনায় অনেক ডেভেলপড্, পাকা বাড়ি, পিচের রাস্তা। সে সব প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এখন তো নিশ্চয়ই সব পাল্টে গেছে, যদিও তার পরে আর আমার যাওয়া হয়নি। বিষ্ণুপুর হয়ে ফিরেছিলাম, অনেক ছবি তুলেছিলাম বিভিন্ন মন্দিরের। তখন আমার একটা আগফা ক্লিক থ্রি ক্যামেরা ছিল, একটা রোলে বারোটা ছবি উঠত। ভাণ্ডারি মহারাজকে দিলে উনি পুরুলিয়া টাউন থেকে ডেভেলপ আর প্রিন্ট করিয়ে এনে দিতেন। সে ক্যামেরা আর সেই সব ছবির অধিকাংশই আজ আর নেই।

তার পরের বছর, যখন আমরা ক্লাস নাইনে, গেলাম ঘাটশীলা। সেটা পুরুলিয়া থেকে খুব একটা দুরে নয়, তাই একদিনেই যাওয়া আসা। নিজেদের নতুন চকচকে বাসে যাওয়ার মজাই আলাদা। ঘাটশীলায় আমরা দেখলাম হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডের কারখানা। ওখানকার ইঞ্জিনিয়ার গাইড আমাদের খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন, কি করে আকরিক থেকে তামা তৈরি হয়। প্রসেসিংটাও দেখিয়েছিলেন, গোটা কারখানা ঘুরিয়ে। তখন আমরা ক্লাস নাইনে, একটু আধটু কেমিস্ট্রি পড়তে শুরু করেছি, তাই ওঁর কথা বেশ ভাল লেগেছিল। তবে মজাটা হয়েছিল দুপুরের স্নানখাওয়া নিয়ে। আমাদের আট-দশটা গ্রুপে ভাগ করে এক একজন বড় অফিসারের বাংলোয় পাঠিয়ে

দেওয়া হল, সেখানে স্নানটান সেরে নেবার জন্যে। আমি আর আরো কয়েকজন যে বাড়িতে গেলাম, সেটা বেশ বড় বাগানটাগান দেওয়া বাংলোবাড়ি, সাহেবি কায়দায় সাজানো। গৃহকত্রী আমাদের গাজরের হালুয়া খেতে দিলেন, সেই আমার জীবনে প্রথম গাজরের হালুয়া খাওয়া। ইন ফ্যাক্ট, গাজর দিয়ে যে হালুয়ার মত একটা মিষ্টি হতে পারে, খোয়াক্ষীর, কাজু, কিসমিস দিয়ে, সেটাই আমি আগে জানতাম না। এক এক করে আমরা ওর ঝকঝকে বিলিতি বাথরুমে স্নান করে নিলাম, ওঁর শ্যাম্পুর বোতল প্রায় নিঃশেষ করে দিয়ে। এখনও সে কথা মনে পড়লে হাসি পায়। পরে উনি নিশ্চয়ই ওঁর স্বামীকে বলেছিলেন, এ কোন দুষ্টু ছেলের দলকে বাড়ি এনেছিলে?

ফিরবার পথে আর একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ঘাটশীলা থেকে ফিরবার পথে, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বাসটা টাটা-পুরুলিয়া রোডে পড়ল। বাঁদিকে গেলে টাটা, ডানদিকে পুরুলিয়া (অথবা উল্টোটাও হতে পারে)। আমরা সবাই টাটা টাটা করে চেঁচাবার ফলেই হোক, বা ভুল করেই হোক, আমাদের বাস টাটার দিকে ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের সঙ্গে যে মহারাজ গিয়েছিলেন, মনে নেই দর্শন মহারাজ কিনা, অন্য কেউও হতে পারেন, তাঁর খেয়াল হল, আমরা ক্রমেই পুরুলিয়ার থেকে দুরে চলে যাচ্ছি। তিনি ড্রাইভার দাদাকে দিলেন এক ধমক; বাস আবার ইউ-টার্ন নিয়ে বিদ্যাপীঠের পথ ধরল।

ক্লাস টেনে আমরা গিয়েছিলাম বক্রেশ্বর হয়ে মুর্শিদাবাদ। বক্রেশ্বরে ফুটন্ত গরম জলের প্রস্রবন দেখলাম, তাতে অনেক লোক চাল ফেলে দেখছে সেটা ফুটে ভাত হচ্ছে কি না। পরিচ্ছন্নতার বালাই বিশেষ ছিল না, দেখে আশ্চর্য লেগেছিল। রাত্রে ছিলাম সারগাছি মিশনে। পরের দিন অতি ভোরে গাছ থেকে সদ্য নামানো ঠাণ্ডা খেজুরের রস খেয়েছিলাম, মনে আছে। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে তো খেজুরগাছ ছিল না, এদিকে সারগাছিতে সার সার খেজুরগাছ। সারগাছি, সেদিক দিয়ে দেখলে, সার্থকনামা। মুর্শিদাবাদে দেখলাম হাজারদুয়ারি, তাতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার দেওয়া ঝাড়লণ্ঠন, আরো কতশত জিনিসপত্র। ঝাড়লণ্ঠনটার কথা মনে আছে এই কারণে, যে পরে একবার হাজারদুয়ারি দেখতে গিয়ে সেই ঝাড়লণ্ঠনটা দেখে মনে হল, এটা আগে বিশাল বড় ছিল, এখন বোধহয় ছোট হয়ে গেছে। সেই ছোটবেলার বিস্ময়বোধটাই যে হারিয়ে গেছে! সিরাজের আর অন্যান্য নবাবদের সমাধি, মসজিদ, সবই দেখেছিলাম। ফিরবার পথে আমরা থেমেছিলাম অজয় নদের ধারে, কেন্দুলির মেলায়। তখনও মেলা শুরু হয়নি, সবে দোকানিরা তাদের পশরা সাজিয়ে বসছে। এক জায়গায় দেখলাম, ছোট ছোট মাটির তৈরি ভাঁটা, তাতে হালকা ধোঁয়ার মধ্যে বড় বড় সবুজ রঙের কলার কাঁদি। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করে জানলাম, কারবাইড দিয়ে কলা পাকানো হচ্ছে চমৎকার! মেলা দেখতে আসা লোকজন এই কারবাইড দিয়ে পাকানো কলা কিনে খাবে, তখন তার রঙ হয়ে যাবে উজ্জ্বল হলুদ।

এসব গত শতাব্দীর সত্তর দশকের কথা, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার। এখনও নিশ্চয়ই বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা এক্সকার্সনে যায়। তারা নিশ্চয়ই যাবার আগে ইন্টারনেট ঘেঁটে গন্তব্যের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সবকিছু জেনে ফেলে, ছবি দেখে ফেলে। তবে আমরা যে একটা অজানা জায়গা আবিষ্কারের মজাটা পেতাম, যে বিস্ময় আমাদের চোখে খেলা করত, সেটা কি বিদ্যাপীঠের বর্তমান প্রজন্ম পায়?

লেখক অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আধিকারিক, ভারত সরকার-এর বিদেশ বিভাগ।

কিছু মায়া রহিয়া গেল

তুহিনাভ মজুমদার (১৯৭৭)

সন্ধ্যে নামার আগে, বাবা আর ছোটো পিসেমশাই বিবেক মন্দিরের লাগোয়া মাঠ পেরিয়ে পিচ রাস্তায় উঠল। আমি দাঁড়িয়ে আছি, একা। জিমনাসিয়াম আর ছোটোদের হস্টেলের মাঠে। দেখছি বাবারা আমার থেকে দুরে হেঁটে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি, আমার চারপাশের সমস্ত দৃশ্য ক্রমশ ঝাপসা হচ্ছে। বাড়ি থেকে দুরে। মা বাবা ভাইয়েদের ছেড়ে একা একা এই প্রথম। বাবারা বাঁক ঘুরলেই বিদ্যাপীঠের মেইন গেট, আমি জানি। বাবা কি বাঁক নেওয়ার আগে একবার পিছন ফিরে দেখলো? কী জানি! তখন আমার চারপাশে নানান বয়সের বালক কিশোরদের কলরব। আমার বাড়ির স্পেনিয়াল বুদ্ধু, হেজ-এ ঘেরা আমাদের বাড়ি, সি-১০৫, মা বাবা আর ভাইয়েদের মনে পড়লো। ঠিক তখনি কে যেন আমায় হেঁকে হস্টেলে ফিরতে বলল। এই কে যেন, পরে জেনেছিলাম, খাঁদু দা। শিবানন্দ সদনের দ্বাররক্ষক। সামান্য খাটো করে পরা ধুতি, হেমন্ত মুখার্জী শার্ট আর গায়ে জড়ানো নস্যি রঙের র‍্যাপার। উঁচু ক্লাসে পৌঁছে, খাঁদুদাকে আর তত ভয় পেতাম না। খাঁদুদা কত গল্প শোনাবে আমাদের এরপর! বন্ধুর মতো।

আমি ধীরে, কোলাপসিবল গেট দিয়ে শিবানন্দ সদনে, আমার ধামে, ঢুকলাম। লম্বালম্বি ডর্মেটরি; দু পাশে সারি সারি কাঠের চৌকি, সবুজ-সাদা বেড কভারে ঢাকা। এবারে ধুতি পাঞ্জাবি পরে, প্রার্থনাঘরে যেতে হবে। বাবারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ট্রেনে বসে পড়েছে।

ধীর লয়ে গান শুরু হল। সবাই গাইছে। সঙ্গে পাখোয়াজ আর মৃদঙ্গ আর গঙ। এই গঙ আমি আগে শুনিনি। ‘খণ্ডন ভব, বন্ধন জগবন্দন’ -- এক শান্ত গম্ভীর ভাব এলো মনে। এর আগে কখনো এমন হয়নি। অন্যের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সঠিক সুরে তালে গাওয়ার চেষ্টা এই প্রথম। অন্যের সঙ্গে চলার প্রথম পাঠ।

দীর্ঘক্ষণ গঙের ধ্বনিতরঙ্গ জেগে থাকে মনে। স্টাডি হলের জানলা দিয়ে দুরে,পাঁচিলের ওপারে হঠাৎ দেখি সন্ধ্যের ট্রেন। কামরার আলো সব জ্বলছে সন্ধ্যের অন্ধকারে। সন্ধ্যের অন্ধকার বেয়ে আলোর মালা কলকাতা চলে যায়। তারপর অন্ধকার আবার। পড়ায় মন বসে না। মধুসুদন মিত্রদা-র মৃদু ধমকে পড়ায় মন দিই আবার।

অনিশ্চয় মেশানো ভয় ভেতরে জেগে থাকে। যদিও চারপাশের সবাই আমার সমান বয়সী। আজই আমার, বা আমাদের সবারই বিদ্যাপীঠে প্রথম দিন। আমরা ক্লাস ফোর। ১৯৭০-এর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ যতদুর মনে পড়ে। রাতে ঘুম আসে না। মশারির বাইরে আসি--ধীরে। প্রায় পা টিপে টিপে। ডর্মেটরির বাইরে টানা বারান্দা। সমস্ত শিবানন্দ সদন ঘুমোচ্ছে। দু একটা আলো জ্বলছে করিডরে। দুরে, করিডরের অন্য প্রান্তে আমারই মতন কে যেন দাঁড়িয়ে। একা। ভয়ে ভয়ে এগোই। আমারই বয়সী। ক্লাস ফোর। নাম-- শুদ্ধসত্ব। আমাদের মন খারাপ। বুঝতে পারি শুদ্ধসত্ব-র চোখে জল। আমি ওর কাঁধ ছুঁই। অনুভব করি, অন্যের কাঁধে হাত রাখলে নিজের মন খারাপ চলে যায়। বুঝতে পারি নিজেদের বাড়ি, ভাই, আত্মীয়দের গন্ডির বাইরে আছে এক বিপুল জগত। সেই জগতের স্বজন, বন্ধুদের হদিশ পেলাম সেই প্রথম। সে বছরের পর শুদ্ধসত্ব ফিরে আসেনি।

গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। বাড়িতে সবাই জানতে চাইছে বিদ্যাপীঠের কথা। যা ভাবছি তা বলছি না। আমি বলছি না যে, এমন একটা স্কুল আছে যেখানে রোজ বিকেলে খেলার মাঠে না গেলে শাস্তি হয়। সে তুমি যত দিগগজ ছাত্রই হও না কেন। আমি বলছি না, খাবার ঘরে খাবার নষ্ট করলে শাস্তি হয় কেননা ‘অনেক লোক ভালো করে খায় না।’ আমি বলছি না, ৮০ একরের একটা স্কুলে ২২ টা খেলার মাঠ। আমি বলছি না, এখানে ছোট ক্লাসে স্টোরি টেলিং-এর জন্য আলাদা একখানা আস্ত পিরিয়ড বরাদ্দ থাকে। আমি বলছি না এই স্কুলের প্রত্যেক শনিবারের শেষ

দুটো পিরিয়ডের নাম 'ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম'। সবাই সেই ৮০ মিনিটে যা ইচ্ছে পারফর্ম করতে পারে। আমি বলছি না এই ইস্কুলে শিক্ষক দাদাদের সঙ্গে ছাত্র ভাইয়েরা মিলেমিশে নাটক করে। আমি বলছি না আমরা শিক্ষকদের দাদা সম্বোধন করি। আমি বলছি না সেখানে কালীপদ মহারাজ নামে এক আশ্চর্য 'সন্ত' থাকেন যাঁকে আমরা নিশ্চিন্তে কালিপদদাও সম্বোধন করতে পারি। আমি ভাবছি, সত্যি তো, একটা ক্যাম্পাসে নানান ধরণের, বয়সের মানুষ, যারা কেউ কারুর মতোন নয়, সবাই নিজের মতো, অথচ, সবাই সবার সঙ্গে বাঁচছে। সবাই বন্ধু।

ফি-বছরের মতো ১৯৭০-এর গরমের ছুটির আগেও সন্ধ্যেবেলায় নাটক তারপর ফিস্ট। নাটকের নাম 'লেনিন'। চোখের সামনে সেই প্রথম অভিনীত হচ্ছে ১৯১৭-র বিপ্লব। ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরলাম। ছুটির পর সপ্তাহ দুই যেতে না যেতেই পরপর কয়েকটা ঘটনা আমাদের সবাইকে, অন্তত আমাকে, ভেতরে ও বাইরে বেশ বদলে দিল। একদিন, খেলা ও প্রার্থনার পর, স্টাডি চলছে, সদনে পিন ড্রপ সাইলেন্স বলা চলে। হঠাৎ, ক্লাস ইলেভেন, টেন-এর

দাদাদের একটি দল, স্টাডিতে ঢুকে পড়ে। একটা লিফলেট পাঠ করে তারপর। "চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান, বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।" শব্দগুলো সেই লিফলেটে ছিল কিনা আজ আর মনে পড়ে না। মূলত সমাজ, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের চারপাশে সবকিছু বদলানোর কথা আমাদের বোঝাতে চায় দাদারা। আমার হঠাৎ ছুটির আগের নাটকের কথা মনে পড়ে। তারপর সম্ভবত দুদিন পর আমাদের বাড়ি চলে যেতে বলা হয়। সব বন্ধুদের বাবা মায়েরা এসে পড়েন। একে একে হস্টেল খালি হতে থাকে। আমি আর দাদা, দাদা তখন ক্লাস ফাইভে, অপেক্ষা করছি। তিনদিন পর কাকুর সঙ্গে আমরা বাড়ি ফিরি। যেদিন আমরা ফিরছি, সেদিন আবার চাক্কা বন্ধ। অর্থাৎ, টাটানগরে রাত্রিবাস। কারণ ট্রেন চলাচল বন্ধ। সে এক অন্য অভিজ্ঞতা।

সেবার আমরা বিদ্যাপীঠে ফিরেছিলাম প্রায় মাস পাঁচ-ছয়েক পর। মনে আছে, দীর্ঘ ছুটির পর ফিরলাম যখন তখন শীত পড়ে গেছে। নভেম্বর বোধহয়। ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করেই আবার বাড়ি। আবার বাড়ি ফিরে জানতে পারি,বাবা হসপিটালে। আমাদের জানানো হয়নি বাবার হার্ট অ্যাটাকের কথা। আমাদের ৮০ একরের ক্যাম্পাসে, ১৯৭০-এর নকশালবাড়ির হঠাৎ হাওয়া, আমাকে ভেতরে ও বাইরে কিছুটা বদলে দেয়। সে বছর, পরে শুনেছিলাম ক্লাস ইলেভেনের দাদারা কেউ ফিরে আসেনি ছুটির পর। তাদের কারো কারো মুখ আমার এখনো মনে আছে। বুঝতে পারি সেই ঘটনা, কেউ আর আমরা মনে রাখতে চাইনি। আমার মনে কিন্তু অনেক প্রশ্নের তোলপাড় চলছে বুঝতে পারছি। সেইসব প্রশ্নের উত্তর কুড়িয়ে পাব হয়তো আরো কিছু বছর পর। অনেক প্রশ্নের উত্তর আবার অজানাই থেকে যাবে।

১৯৭১-এ, শিক্ষকরা 'কেদার রায়' অভিনয় করলেন। জিম্নেসিয়ামের মধ্যে, যাত্রার ঢঙে। চারপাশে দর্শক। দুর্গা (ভট্টাচার্য)-দা, সুশীল (ঘোষ)-দা আর দিলীপ (চ্যাটার্জী)-দা-র অভিনয় মনে আছে। আর তার পরের দিন জিমনেসিয়ামে, পাহাড়ি সান্যাল মশাই-এর গান "আমারো বাগানে এত ফুল/ তবু কেন চলে যায়', সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গান সম্বন্ধে বৈঠকী আলোচনা। আর পরের বছরই, ১৯৭২-এ, শান্তি (সিংহ)-দা-র উদ্যোগে কবিসম্মেলন। সমস্ত দিন ধরে সভাগৃহে চলেছিল কবিতা পাঠ। কবিরা সবাই প্রায় পুরুলিয়ার। সন্ধ্যেয় কবিতা শোনালেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রনাথ রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, পূর্ণেন্দু পত্রী- এমন সব কবিরা। এই আপাত রুক্ষ পাথুরে প্রকৃতির ভেতরে এক অন্য অজানা রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে ক্রমশ। আমি বদলাচ্ছিই।

সেই সময়ে কোনো এক ছুটির আগে, নাটকের তোড়জোড় চলছে। রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সুশীল ঘোষ-দা ডেকে পাঠালেন। সেই আমার নাটকে হাতেখড়ি। এক অদ্ভূত নেশা-নেশা ঘোরের মধ্যে কাটবে এরপর, প্রত্যেকটা দিন। কবিতা, নাটক, গান... আমাদের ক্লাসে আমি হয়ে উঠলাম মূলত হিন্দি গানের প্রধান গায়ক। সব কিশোর কুমারের গান। আমার সঙ্গী, পার্টনার ইন ক্রাইম, নিলয়। নিলয় ট্রেইন্ড গায়ক। নিলয়ই আমার ছোটোখাটো ভুলগুলো শুধরে দেয়। এই সবকিছুর মাঝে, এলেন এক ব্রহ্মচারী, শ্যামদা। আমরা ডাকতাম শ্যাম

মহারাজ। সম্ভবত বম্বের মানুষ। বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ মিশিয়ে কথা বলেন। দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান। আর গানের ভক্ত। কোনো এক রবিবার শ্যামদা আমায় ওঁর ঘরে ডাকেন। উঁচু ক্লাসের পার্থপ্রতিম (কাঞ্জিলাল)দাও আছে। রেডিওতে বাজছে মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্স। এরপর সমস্ত রোববার। অন্য সবার অজান্তে চলত সামান্য নীচু ভ্যলুমে, আমাদের তিনজনের মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্স শোনা। শ্যাম মহারাজের ওই ঘরে, একটা ছবি তোলা হয়েছিল মনে আছে। ছবিতে ছিলাম সজল, সিদ্ধার্থ আর আমি। আর আমার পাশে সেই মারফি। আমি দেখছি,স্পষ্ট- ১৯৭৩-৭৪-এর এক দুপুর, শ্যাম দা-র ঘর, দূরে একটা কদম গাছ, বৃষ্টি আর রেডিওতে Simon and Gurfunkel এর 'Bookkend'...

Time it was/And what a time it was/It was a time of innocence/A time of confidences/ Long ago, it must be/I have a photograph/Preserve your memories

[They're all that's left you

ডানা মেলে ভেসে বেড়াই সারাদিন। রেজাল্ট ভালো হয় না; যদিও পড়তে ভালো লাগে। বিশেষতঃ, সাহিত্য। আর শিক্ষক বা দাদাদের ভালোবাসা, Commitment আর প্রশ্রয়ে একসময়ে ভালোবেসেও ফেলি পড়াশুনো। আর ছিল বন্ধুদের আশ্রয়। কী সব ডানপিটে বিকেল আর শান্ত গোধুলি বাতাস। একদিন প্রবল ঝড় সঙ্গে এলোপাথাড়ি বৃষ্টি। সবকিছু ভেসে যাবে বুঝি। ঝড় থামলে কে যেন বলে সুশীল (রায়)-দা-দের ঘরের চাল ঝড়ে উড়ে গেছে। লন্ডভণ্ড অবস্থা। আমরা দৌড়োই প্রাণপণ। লন্ডভণ্ড অবস্থাই বটে। ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। দেবাশিষ অসাবধানে, হোঁচট খেয়ে একটা খোলা তারের ওপর পড়ে যায় আচমকা। দেবাশিসকে বাঁচানো যায়নি তারপর।

কিছু কিছু দুঃখ ঘা হয়ে বেঁচে থাকে আজীবন। দেবাশিসের চলে যাবার দিন চারেক পর আমরা ১৯৭৭-র ব্যাচ বিদ্যাপীঠ ছেড়ে আসি। দেবাশিসের মৃত্যুর তাই আমার কাছে অন্য মানে। বিদ্যাপীঠের পাতা পত্র, দূরের ট্রেন লাইন, মাঠ ঘাট, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘন্টাধ্বনি বাঁধা জীবন, প্রবল রোদ্দুর, বৃষ্টি আর অস্তিত্ব কাঁপানো শীত, বন্ধুত্বের ভেজা ভেজা স্পর্শ, আলোছায়াময় সন্ধ্যে, সকাল দুপুর রাত আর রাত বাড়লে দুর দূর থেকে ভেসে আসা ছৌ নাচের আসরের বাজনা, বালক কিশোরদের কলরবের মাঝে মায়ার মতো আমার অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে সেই মুত্যু। কিছু মায়া রয়ে গেল তবুও। কিছু মায়া রয়ে গেল আজীবন। না হওয়া কতকিছুই এই ক্যাম্পাসে হয়ে উঠলো...হয়ে উঠছে দেখলাম। ইচ্ছে হচ্ছে এখনি সেই বালকের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। উঠে চড়ে বসি পুরুলিয়াগামী কোনো ট্রেনে। তারপর সাইকেল রিক্সা আমায় পৌঁছে দেবে সেই তোরণে যা আমার মতে এক আশ্চর্য ''আর্টওয়ার্ক'। রিকশার সিটের পিছনে রাখা আমার নাম লেখা কালো ট্রাংক।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।

ফিরতে তো হবেই এবার। ১৯৭৭-র মে মাসের কোনো বিকেলে প্রবল বৃষ্টি নামলো। যখন, কঠোপনিষদের এই শ্লোক খোদাই করা গেট পেরিয়ে আমি ফিরছি। রিকশার সিটের পিছনে রাখা আমার নাম লেখা কালো ট্রাঙ্ক। আমার স্কুল জীবন শেষ হলো। বাকি গল্প অন্য কোনোদিন হবে হে বন্ধুরা। বস্তুত, এ গল্প ফুরোবে না। এ গল্পের শেষ নেই।

The author is a film editor, writer, director and a former Associate professor of Direction and Screenplay Writing department FTII, Pune . Presently the HOD of the Direction and Screenplay Writing department of School of Film and Television, MIT, Pune.

বিদ্যাপীঠই নাটের গুরু

সুপ্রিয় দত্ত (১৯৭৮)

চারধাম দর্শনে কে না যেতে চায়! একটু বয়স হলে'ত কথাই নেই! পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা কিন্তু তাদের ১৩ বা ১৪ বছর বয়সেই ছয়ধাম যাত্রা সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। অভেদানন্দ ধাম, অদ্ভূতানন্দ ধাম, সুবোধানন্দ ধাম, বিরজানন্দ ধাম, ত্রিগুণাতীতানন্দ ধাম আর অদ্বৈতানন্দ ধাম। ছয় ধাম মিলে এক শিবানন্দ সদন।

আমরা তখন শিবানন্দ সদন। আমরা তখন সুবোধানন্দ ধাম। আমরা তখন ষষ্ঠ শ্রেণী আমরা তখন ১৯৭৩।

ওয়ার্ডেন সুনীল দা। অঙ্কের মাষ্টারমশাই। আমরা শিক্ষকদের 'দাদা' বলেই সম্বোধন করতাম। আমাদের এক ক্লাস সিনিয়রদেরও বলতে হত 'দাদা' এবং 'আপনি'। শিক্ষকরা দাদা, অশিক্ষকরা দাদা, বিদ্যাপীঠের তাবৎ কর্মচারী, ডাইনিং হল থেকে জিমনাসিয়াম, খাঁদুদা থেকে সত্যদা, ধোপা, নাপিত, মুচি সকলেই 'দাদা'। ব্রহ্মচারী, এমনকি কিছু কিছু স্বনামধন্য সন্ন্যাসীদেরও, আমরা তাই বলতাম। শিল্প প্রতিষ্ঠানে লোকে শুনেছে নবীনবরণ উৎসব। আর আমরা, জানুয়ারি মাসের কোন এক সকালে মেতে উঠতাম, ভ্রাতৃবরণ উৎসবে। বাসন্তী ওড়না, হলুদ-চন্দন, ভালোবাসা আর ফুলে নতুনদের বরণ করে নিতাম। নতুনরা পুরোনো হলে তারা তখন দাতা। গ্রহীতা, যারা সদ্য নবীন! সেই Tradition সমানে চলেছে।

আমাদের ওয়ার্ডেন সুনীলদার কথা হচ্ছিল। লুকিয়ে বলছি, ওনার একটা ছদ্মনাম ছিল। প্যাক পুণ্য প্যাকের দুই। কেন ছিল, সেটা বিস্তারিত না বলাই ভাল। দারুণ শিক্ষক ছিলেন সুনীলদা। বকাঝকার ধার দিয়েও হাঁটতেন না। দারুণ মানুষ। জানি এ জীবনে আর দেখা হবে না, তবু এই সুযোগে ওনাকে প্রণাম জানালাম।

সুনীলদাই খবরটা দিলেন। সামনেই শিক্ষক দিবস। 5th September। নাটক হবে। বিধায়ক ভট্টাচার্য মহাশয় রচিত 'জাগোরে ধীরে'। অভিনয়ে ইচ্ছুকরা যেতে পারে। Study Hall-এ। রাতের খাবারের পর।

শিবানন্দ সদনে ছোটদের Prayer Hall-এর পাশে ৩/৪টে ছোট ছোট Study Hall ছিল। তখন জুনিয়র আর সিনিয়রদের আলাদা আলাদা Prayer Hall ছিল। উল্লেখ্য বিদ্যাপীঠের Main Gate-এ দাঁড়ালে যে অনন্যসাধারণ Prayer Hall-টা আমরা দেখি সেটা তখন under construction। তাই এই ভাগাভাগি। যাই হোক, Study হলে রাতে খাবারের পর হাজিরা দিতে হবে। মহলা রাত ৯টা থেকে। ১৫ দিন চলবে। তারপর Stage Rehearsal এবং 5th September দর্শক সমাবেশে, বিদ্যাপীঠ সভাগৃহে, সন্ধ্যেবেলা, নাটক মঞ্চস্থ হবে।

আমার প্রবল ইচ্ছে। ১৫ দিন মহলা। আছে Stage Rehearsal। আছে Final Rehearsal। বলা যায় না এই সুযোগে ২/১টা Study, off ও হয়ে যেতে পারে। স্কুলের শেষ দুটো Period ছুটিও পাওয়া যেতে পারে। মানে রুটিনটা একটু বেরুট হবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই যাব বলেই স্থির করলাম।

এদিকে মনের মধ্যে প্রচুর ভয়, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। ভয় শ্রী সুশীল ঘোষ মহাশয়কে। যিনি এই নাট্যের পরিচালক। কলারওলা সাদা হাফহাতা গেঞ্জিশার্ট, সাদা প্যান্ট (Belt ছাড়া), গলায় বাঁশি, পায়ে স্নিকার, চোখে চশমা, বাঁ হাতে একটা বড় ডায়ালের ঘড়ি। মেরুদন্ড সোজা। মধ্যদেশ সামান্য স্ফীত।

যম এবং শ্রী সুশীল ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তির নাম ছিল। সুশীলদা ছিলেন আমাদের Physical Instructor। ওটা শুধুই পদ। আসলে করতেন না, এমন কোন কাজ নেই। নাট্য পরিচালনা তার মধ্যে অন্যতম। অসাধারণ অভিনেতাও ছিলেন। Study Hall-এ ওনার উপস্থিতি মানেই সকলে চুপ, নিস্তব্ধ। আলপিন পড়লেও শোনা যেত। খুব প্রয়োজন না হলে কেউ বাথরুমের অনুমতিও চাইতে যেত না। কথাবার্তা, নিজেদের মধ্যে যেটুকু হত, সবটাই

আকারে ইঙ্গিতে, ইশারায়। পড়তে বসে কিছুতে আটকে গেলে, ভুলেও কেউ ওনাকে বিরক্ত করতে যেত না। অঙ্ক নিয়ে'ত নয়ই। সিংহের মত গাম্ভীর্য নিয়ে আমাদের সামনে বসে, একমনে কিছু একটা কাজ করে যেতেন। মুখে থাকত পান। চিবোতেন না। গালে রেখে দিতেন। ভারি মায়াময় ছিল সে পানের গন্ধ। লিখতেন, ঝর্না কলমে। অপূর্ব হাতের লেখা ছিল। লুকিয়ে যেটুকু উঁকি মেরেছি, ঐ লেখালেখির কাজগুলো ছিল মূলত নানারকম Form ভর্তি, Conduct Report তৈরী, Physical Education সংক্রান্ত কোনো কাজ, Inter Platoon tournament-এর বিভিন্ন কাজ, School team সংক্রান্ত কিছু। একটাও কথা বলতেন না। মাঝে একবার হয়ত উঠতেন। মনে হয় ধূমপানের কারণে। ফিরে এলে তামাকের গন্ধ পেতাম। একটু এদিক থেকে ওদিক করে ফেললে, শুধু তাকাতেন। মনে হত যমে মানুষে টানাটানি।

এ হেন নাট্যপরিচালকের সামনা-সামনি হতে নানা দ্বিধা, নানা ভয়, কাজ করছিল। তাই প্রথম দিনটা, যাওয়াই হয়নি। দ্বিতীয় দিন গেছি। মহলা কক্ষে কিন্তু ঢুকিনি। Study Hall-এর বাইরে, বারান্দা লাগোয়া জানলায় দাঁড়িয়ে আছি। মহলা চলছে। আমি জানি, প্রথম দিন যখন অনুপস্থিত ছিলাম, এ নাটকে অংশ নেওয়া আমার কপালে নেই। তবু Rehearsal–টা'ত দেখি। দেখতে ক্ষতি কি! আমাদের এক উঁচু ক্লাসের দাদা নাটকের প্রধান চরিত্র 'শ্যামল'-এর ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। তখন শুধু পাঠ চলছে। ওনার পড়াটা ঠিক হচ্ছিল না। সুশীলদা বার বার থামাচ্ছিলেন। থামাচ্ছিলেন আর বোঝাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই এক ভুল। এমতাবস্থায় আমার বেশ একটু বিরক্তই লাগছিল। এই সামান্য জিনিসটা পারছেন না! ধূর! এইসব আমার মাথায় চলছিল। হঠাৎই মুহূর্তে আমি একটা মারাত্মক ধ্বনিমূলক ভুল করে বসলাম। মাথার ভাবনা, শব্দে পরিণত ও প্রকাশ করে ফেললাম। বিরক্তি জানানোর শব্দ। লেখায় সে ধ্বনির অবয়ব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। খুব গোদা করে লিখলে সেটা অনেকটা 'চুক্ চুক্'-এর মত। ব্যস্ সর্বনাশ, যা ঘটার ঘটে গেল।

Indian Culture ক্লাসে, স্বামী পূতানন্দ, আমাদের Chief Warden, আমাদের শেখাতেন জনসমক্ষে আঙুল ফাটানো বা মটকানো, পাঁচজনের সঙ্গে বসে পা দোলানো, বিশ্রীভাবে বিকট আওয়াজ করে হাই তোলা, 'চুক্ চাক্' এইসব বিরক্তিসূচক শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদি ইত্যাদি, সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কখনও করতে নেই। আর সব থেকে বড় কথা সুশীলদা এই ধরণের 'চুক্ চুক্' শব্দ উচ্চারিত হলে নিজেকে ঠিক রাখতে পারতেন না। ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। যে বা যারা একান্ত অনিচ্ছায়, শুধুমাত্র reflex action-এ এ ধরণের শব্দ উচ্চারিত করেছে, শ্রী সুশীল ঘোষদার হাতে তাদের কপালে কি কি জুটেছে, তা ওনারা আজও নিশ্চয়ই স্মরণ করেন! স্মৃতিতে অবশ্যই উজ্জ্বল! এ ব্যাপারে সুশীলদারও একটা ছদ্মনাম ছিল। সেটা বলব না। যারা জানে তারা জানে। আসলে আমাদের বেশীরভাগ মাষ্টারমশাইদেরই একটা করে অন্যনাম ছিল। আমি তার কোনোটারই স্রষ্টা নই। তবু কান ধরে, এই বৃদ্ধ বয়সে এসেও ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

যেটা বলছিলাম, আমি তো সর্বনাশটা ঘটিয়ে ফেলেছি। পরিচালক পেছন ফিরে তাকালেন। চকিতে। পালাব বা জানলার নীচে বসে পড়ব, এমন সুযোগও ছিল না। হাঁটু কাঁপছে। গোটা শরীরটাই কাঁপছে। রাতে প্রচুর মাংস রুটি খাবার পরেও পেটটা মনে হচ্ছে খালি খালি। শীত শীত করছে, পুরুলিয়ার ভরা ভাদ্রেও। ভেতরে ঢুকতে আদেশ করলেন। তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। ঠাকুর মা স্বামিজীকে ডাকছি। মনে মনে বলছি হে ঠাকুর রক্ষা কর! হে ঠাকুর এইবারটি খালি বাঁচিয়ে দাও!

এরপরের ব্যাপারটা দৃশ্য বা সংলাপ আকারে লিখলে যেটা দাঁড়াবে, সেটা মোটামুটি এইরকম ঃ

সুশীলদা : কি ব্যাপার? কি একটা আওয়াজ করলে?

আমি : নিরুত্তর।

সুশীলদা : কি হল? আমি একটা প্রশ্ন করেছি! কথা কানে যাচ্ছে না? চুক্ চুক্ করে এই শব্দটা কেন করলে?

আমি : নিরুত্তর।

সুশীলদা : লজ্জা করে না। তুমি না বিদ্যাপীঠের ছাত্র! থাকতে হবে না এখানে! যাও বাইরের কোনো স্কুলে চলে যাও! আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, যেটা করলে কেন করলে?

আমি : নিরুত্তর।

সুশীলদা : কি হল? বল!!!

আমি : না..... (অতি ক্ষীণ স্বর)

সুশীলদা : কি না! বেশী লায়েক হয়েছ? পান্ডা! এ্যাঁ! তোমাকে পার্টটা দিলে তুড়ি মেরে করে দেবে! তাই তো?

আমি : না.... (আরো ক্ষীণ হয়েছে)

সুশীলদা : কি না? এইটাই'ত বোঝাতে চেয়েছ? আমার দাদা কি করছেন? এটা পারছেন না? এটা কোনো ব্যাপার! এটা'ত খুবই সহজ। আমাকে দিলে দেখিয়ে দিতাম! কি তাই তো?

আমি : (অনেক বড় কাঁপুনিসহ) নিরুত্তর।

সুশীলদা : এই একটা বই ওকে দাও ত?

(একজন বই দেয়।)

সুশীলদা ঃ নাও! পড়! দেখি তুমি কত বড় অভিনেতা! 'শ্যামল' চরিত্রটা পড়বে। বাকি যারা যে যে চরিত্র পড়ছে, তাই পড়বে। নাও শুরু কর!

কাট্ টু

5th September। শিক্ষক দিবস। Assembly Hall। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হল নাট্য 'জাগোরে ধীরে'। হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইল লিফলেটে আমাদের সকলের নাম। Makeup Artist শ্রী পাঁচুগোপাল দত্ত। কোনো প্রম্পটার নেই। পোশাক আমাদের নিজেদের। সংগীত তুলসীদা। আলো শৈলেন দা। পরিচালনা শ্রী সুশীল ঘোষ। মঞ্চে সেই আমার প্রথম অভিনয়।

ভাণ্ডারি মহারাজ মানে প্রাণগোপাল মহারাজ দুটো বড় রাজভোগ মুখে পুরে দিয়েছিলেন। কালীপদ মহারাজ পিঠে বিরাট চাপড় মেরে বলেছিলেন, দারুণ! খুব ভালো করেছ বাপু! সুশীলদা খুব হাসছিলেন। আমি এর আগে ওনাকে কখনও হাসতে দেখিনি। দীক্ষাগুরু এক। শিক্ষাগুরু অনেক। সুশীলদা, আমার অভিনয় জীবনের প্রথম গুরু। ওনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। ১৯৭৩ এর ৫ই সেপ্টেম্বর আমার জীবনের অভিমুখ নির্দিষ্ট হয়ে গেছিল। একটু এগিয়ে যাচ্ছি। ১৯৭৮ সাল। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ।

বিদ্যাপীঠের পালা সাঙ্গ করে, প্রচুর কান্নাকাটি করে, পুরুলিয়া Station-এ আমরা যারা কোলকাতায় থাকি একত্র হয়েছি। শেষ বিদায় জানাতে এসেছেন Secretary মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দ। প্রণাম করলাম। বললেন– অভিনয়টা চালিয়ে যেও। ছেড়ো না।

অনেকটা এগিয়ে একেবারে ২০২২-এ চলে এলাম। বেলুড় মঠে গেছি। আমাদের একসময়ের warden, আমাদের শিক্ষক, আমাদের পরমপূজনীয়, পরম শ্রদ্ধেয় সুভাষ মহারাজ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। প্রণাম করতেই বললেন, বেশ মোটা হয়ে গেছ। বললাম, ফুটবল হকিটা চালিয়ে গেলে এই চেহারাটা হত না মহারাজ! উনি অনেক আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন— না না অভিনয় করে যাও। চালিয়ে যাও। ওতে লোকশিক্ষে হয়। ঠাকুর বলে গেছেন।

লেখক নাটক, ফিল্ম ও সিরিয়ালে খ্যাতনামা অভিনেতা।

অবাক দুধপান

সুব্রত চক্রবর্তী (১৯৮১)

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, তখন বোর্ডিংয়ে থাকি কলকাতায়। মেস-বোর্ডিং মানেই এক কাঁড়ি হরেক মানুষের হাটখোলায় শুধু ফুলকির অপেক্ষায় রেডি বিচিত্রানুষ্ঠান। নানা লেভেলের মস্তি কুস্তি লেগেই থাকে। সেদিন সাতসকালেই তুমুল হৈচৈ-এর ঠ্যালায় ভোরাই ঘুমের সুখ বরবাদ। আমার এবং কয়েকজনের চাঁদমামা এন্ড কোং-এর সাথে ফুলটু গুলতানির অভ্যেসের জন্য রবিমামার হামা দেওয়া দেখা হয় না। সে বাদ দিলাম, সেদিন তখন অনেকেই রাতঘুমের ফিনিশিং লাইনে আসেনি, সবে নরম রোদ উঠেছে, প্রভাতী হাঁটুরে জনগণ ঘরে ফেরেনি, গাড়ি-ট্যাক্সি তখনো ধোয়া-মোছা চলছে, তখনো অনেক চায়ের দোকানে প্রথম চা নামেনি, হাতে পেপার এসে পৌঁছায়নি, আলসে ঢিলে সারা দেশ। ওইটুকু সকালের মধ্যেই সেদিন বোর্ডিং ঝনঝনে, জোর কাঁইকিচির! কারণটা কী!

না, গণেশ দুধ খাচ্ছে!

মানে!! এর জন্য আমার ঘুমটা গেল!! কে গণেশ? নতুন বোর্ডার!! পালোয়ান! বেড-টীর বদলে বেড-দুধ খায়? খাচ্ছে তো কী হয়েছে!! বেড়ালের এটো? চুরিটুরির ব্যাপার নাকি!...? উফ্, হৈচৈ-টা কেন...! সেকেন্ডের ভগ্নাংশে মাথায় এলোপাথাড়ি প্রশ্নের ছোটাছুটি! স্বপ্নালোক থেকে সরাসরি কোলে মার্কেটে আছড়ে পড়লে যা হয়! তা, মিনিমাম চোখ খুলে সব শুনে-টুনে ভ্যাবলামি কেটে গিয়ে বিরক্ত, যাঃ ফাজলামির আর সময় পেল না! কিন্তু মোটেই ফাজলামি নয় বুঝে ব্যাক্ টু ভ্যাবলামি। আধখেচড়া ঘুমের জন্য চোখের কষাটে জ্বালা-জ্বালা ভাব, বিরক্তি, আরেক খেপ ঘুমের ইচ্ছে সব ধাঁ।

সিরিয়াসলি! কারণ, এ কোনো পদবিঅলা মনুষ্য গনা গনশা নয়। ইনি আসল গণেশ, উমাপুত্র, গণপতি, সিদ্ধিদাতা, কলাবৌকে যার বৌ বলে নেহাতই ভুল জানে পাবলিক, সেই গণেশ দেবতা। আস্থা-বিশ্বাসে জমাট পাথর, পেতলের উপাস্য মুরতি। পাত্তরের দুধ তাঁর শুঁড়ে ঠেকালেই চো করে মেরে দিচ্ছেন নাকি গজানন! ব্যাপার শুনে বুঝে আমি আর রুমমেট, একজোড়া মিউট বকতিয়ার, সারফেস টেনশন-এর এক ট্যুইস্টে চাদ্দিকে নেত্তচঞ্চল বিহ্বলতা দেখে তক্তাপোষে বুরবাক স্ট্যাচু।

বাইরে, হড়পা ভক্তিরসের তোড়ে বানভাসি মেরা মহান ভারত। এমন হাতেনাতে ঐশ্বরিক মহিমা, তায় বিষ্যুদবার! সব কাজ ঘেঁটে ঘ-য়ে ঘটি, চ-য়ে চামচ, দ-য়ে দুধ।

বাংলায় গণেশ মন্দির কম, শিবমন্দির-কালীমন্দিরে ঝাঁপিয়ে হাঁপিয়ে গণেশ প্রতিমা বসিয়ে গুছিয়ে সাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হিরো-হীরালালের দল পুণ্যিধন্যি হল, আড়চোখে কিছু অপ্লিকেশনও হল, কিছু ফিরতি চাউনিতে আশা জুটল। ভগবানের অশ্রুতপূর্ব 'লীলা লাইভ'-এ অংশ নিতে যত্ত বিস্ময়াবোধক চিহ্ন, জিজ্ঞাসা চিহ্ন সব হুড়মুড়িয়ে লম্বা লম্বা লাইনে জমা হয়ে গেল। দোকান, অফিসেই ছোটমতো সিংহাসন বা কুলুঙ্গিতে গণেশ ঠাকুরের অধিষ্ঠান বেশি। সবাইকে সুযোগ করে দিতে সেখান থেকে নামিয়ে একটা কানা-উঁচু থালায় বসিয়ে অবাক দুধপানের অস্থায়ী বন্দোবস্ত হ'ল। আগাম নোটিস ছাড়াই হেভি ডিমান্ডের জন্য আফশোস করতে করতে দুধওয়ালা, ফুলওয়ালা, মিষ্টির দোকানিরা সকালসকাল একস্ট্রা লাভ তুলে একস্ট্রা গদগদ হ'ল। বিশ্বকর্মা পুজোর হ্যাংওভার কেটেছে কি কাটেনি পঞ্জিকা ছাড়াই আবার বাতাসে ধুনোর গন্ধ, থেকে থেকে শাঁখ-কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ। রাস্তায় রাস্তায় ক্রোশের কাজ করা ঢাকনা দেওয়া পুজোর থালা-ঘটি হাতে ফুলকো ফুলকো শাড়িপরা মেয়ে-বৌয়ের কলকলানি।

কাজে ঢিলে দিয়ে ছুটির মেজাজে হাসি-বিতর্কে মশগুল লোকজন। আর, আচমকা পড়ে পাওয়া একদিনের পুজো-স্পেশালে তৎকাল চান্স পেয়ে উম্মিদসে দু গুণা রিজার্ভড–ওয়েটিং– আরএসির যত্তো প্রেমিক জনগণ সেজেগুজে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এক সময় নিয়ম মেনে সন্ধ্যা হল সান্ধ্যপূজা-আরতি শেষে গণেশ ঘুমালো, ভারত জুড়ালো, শান্তি এল কৈলাসে।

শতাব্দীসেরা সেদিনের এ আজব হুজুগোৎসব কাণ্ড কার প্ররোচনায় কার দায়িত্বে কেন ঘটেছিল, তাতে কার কী-ই বা লাভ হয়েছিল সে ব্যাপারে আজও গবেট। তবে, দুটো বিষয় এখনো ভাবলে মাথায় ভূতের গাট্টা!

তখন ফেসবুক, হোয়াটস্ অ্যাপ জন্মায়ইনি, বাড়িতে ফোন লাক্সারি-প্রায় এবং সরকারি দয়ায়। কেবল একমুঠো লোকের হাতে সবে মাসদেড়েক আগে দেশে আসা আখাম্বা মোবাইল ফোন-১৬ টাকা ধরতে ১৬ টাকা করতে। কম্পিউটার তো তখনো গণশত্রু, দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে। টিভির প্রসার ঘরগোনা, চ্যানেলও করগোনা। একমাত্র রেডিওই ছিল চ্যাম্পিয়ন, কিন্তু এফএম হীন সে তখনো কপিবুক বনেদি, খুঁটে খুঁটে ভাটকথার আসর বসায় না। তাহলে! কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ আজব কথা কেমনে পশিল ভারতের মতো বিশাল দেশের কানে কানে! কেবল পশিলই না, একেবারে ঝুঁটি ধরিয়া ঝাঁকাইয়া ছাড়িল!! এমন নামুমকিন কান্ড, মুমকিন হল কী করে! হল, মেনিমুখো অশরীরী আপদ গুজব-এ ভর করে। গুজব অকল্পনীয় গতিবেগে ছোঁয়াচে। যত ইনফেকশন তত সত্যিবান। প্রযুক্তি-টযুক্তি লাগে না, লাগালে আরো শক্তিমান শুধু সঠিক রঙ্গ নির্বাচনের অপেক্ষা।

সবচেয়ে দুখদ্ ব্যাপার হল, সপ্তাহের কাজের দিনের ছন্দ চটকে নেয়ে ধুয়ে সকাল সকাল (পাছে রোদ বাড়লে অলৌকিক মায়া উবে যায়) গণেশকে দুধ খাওয়ানোর লাইনে যে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে সে তো দৈবমায়ায় আধসেদ্ধ হয়েই আছে। শুধু একবার চাক্ষুষ করা মাত্র সব পাপ তাপ চাপ সিটি বাজিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ফুল সিদ্ধ পুণ্যাত্মা হওয়ার অপেক্ষায় খাড়া। ওই তূরীয় অবস্থায় সে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না খুঁজবে, না বুঝবে। বলতে গেলে উল্টে খোরাক হয়ে গণপ্যাদানি খাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। অতঃপর বিজ্ঞান যুক্তি ইত্যাদি দুধের সাথে বয়ে গেল অথচ, শুধু যদি একটু ইচ্ছে, আগ্রহ থাকে, মনের দরজা জানালা বন্ধ করে থাকার অভ্যেস পুরোনো হলেও পাল্টানো অসম্ভব নয়। কিন্তু, জেগে ঘুমিয়ে থাকলে! মুমকিন না-মুমকিন!!

আজকাল, ওয়েল ইকুইপ্ড পোস্ট-ট্রুথ যুগে, ওয়েল প্লেড গুজবের দ্রুততা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রভাব মারাত্মক। অর্থবলে বলীয়ান দলবদ্ধ মস্তিষ্ক সুপরিকল্পিতভাবে এ খেলা খেললে ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবকিছুই খতরে মে। ২০২২-এ বসে জনগণমনে ১৯২২-এর ইতিহাস বদলে দেওয়ার চেষ্টা করা অথবা বিশ্ববিখ্যাত কৃতী মানুষের সুনামে মিথ্যে কলঙ্ক লেপে দেওয়া ইত্যাদি সিম্পলি তুড়িবৎ সহজ। রটানোটা এখন জলভাত, তাই, দেখে বা শুনে খটকা লাগা-ই হচ্ছে আসল ব্রেন বিদ্যা চেতনা অভিজ্ঞতা সব অ্যাক্টিভ থাকলে তবেই লাগে কিনা! আর খটকা লাগলে একটু খুঁড়ে দেখা, পুথি, মগজ বা গুগল। হ্যাঁ, সমস্যা হচ্ছে বিশ্বাস এবং অন্ধবিশ্বাসের তফাতটাই একটা হেঁয়ালি।

পুনশ্চ:

পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসে একটা সারল্য আছে, সদাশয়তা আছে। আর এর সুযোগ নিয়ে চালবাজ মাতব্বর ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্তজন-ই ঈশ্বরবিশ্বাসীদের ঠকায়, গাড়োল বানায় নিজেদের নানা মতলবে, ঘুরেফিরে নানা কাণ্ড কারবারে, বারবার।

লেখক বিজ্ঞাপন জগতে কর্মরত

অবলুপ্তির পথে পুরুলিয়ার জৈন ইতিহাস

তাপস দাঁ (১৯৮১)

পুরুলিয়া অনার্য ভূমি। তপশীলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এই পুরুলিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য জৈন মন্দির। জৈন ধর্মশাস্ত্র কল্পসূত্র ও আচারাঙ্গসূত্র অনুসারে জৈন ধর্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈন, যিনি জৈন ধর্মের প্রবর্তক বলে স্বীকৃত, খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পুরুলিয়াতে পদার্পণ করেন। সেই সময় এই অঞ্চল পরিচিত ছিল রাঢ়প্রদেশ বা ব্রজভূমি বলে। মহাবীর জৈন ধর্ম প্রবর্তনের জন্য ব্রজভুমিতে এসেছিলেন কিন্তু জৈন ধর্মের বিস্তার এই অঞ্চলে হয়েছে অনেক পরে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে। উত্তর ও মধ্য ভারতের জৈন ব্যবসায়ীরা বঙ্গোপসাগর থেকে নদীপথে জাহাজে পাড়ি দিতেন তাদের পসরা নিয়ে। এই অঞ্চলে অনেক নদ ও নদীর উৎপত্তি, যেমন দামোদর, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর— এই সব নদ-নদী এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে। বঙ্গোপসাগরে পৌঁছনোর জন্য ব্যবসায়ীরা নদীপথে তাম্রলিপ্ত বন্দরে যেতেন। শ্রাবক বা সরাক হল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের একটি জৈন সম্প্রদায়। সরাক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা পুরুলিয়ার প্রাচীনতম বাসিন্দা। এবং বলতে গেলে এরাই মানভূমে আসা আদি আর্য। সারক সম্প্রদায়ের বণিকরা এই অঞ্চলে এসে এখানকার অফুরন্ত খনিজ পদার্থের সন্তারে আকৃষ্ট হন এবং তাদের হাত ধরেই এই অঞ্চলের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ে জৈন ধর্ম। গড়ে ওঠে অনেক জৈন মন্দির, স্তূপ।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এই তিন জেলাতেই পাওয়া যায় জৈন প্রভাব। তবে পুরুলিয়া জেলাতেই জৈন মন্দিরের সংখ্যা সব থেকে বেশি। ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশার রাজা অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গদেব এই অঞ্চল দখল করে নেন। সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ ছিল ওর অধীনে। রাজা ছিলেন জৈন ধর্মের উপাসক। ওর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ-আনুকূল্যে গড়ে ওঠে দিগম্বর সম্প্রদায়ের অনেক মন্দির যাতে উড়িষ্যার স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব চোখে পড়ার মতো। পুরুলিয়ার অনেক গ্রামে জৈন মুর্তি আছে খোলা আকাশের নীচে কোনো আটচালার নীচে এমনকি গৃহস্থের বাড়িতেও। মুর্তিগুলি গ্রামবাসীরা পুজো করেন ভৈরব, কালভৈরব, ধর্মঠাকুর বা বিষ্ণু মূর্তি হিসেবে। সিঁদুরচর্চিত ফুলমালা

ক্ষয়িষ্ণু মন্দির গাত্র

শোভিত এই সব মূর্তি গ্রামবাসীরা পুজো করেন নিজেদের মত করে যা জৈন ধর্মের রীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শীতলপুর ও পাড়ার মন্দিরে পশুবলি ও হয়। মনস্কামনা পূর্ণ হলে গ্রামবাসীরা পশুবলি দেন। তারা জানেনই না যে এই মূর্তিগুলি অহিংসার উপাসকদের। তবে এই ভাবে পূজিত হন বলেই মূর্তিগুলি চোরাচালানকারীদের হাতে পড়েনি। এমনকি পাখবিড়রার মতো কোথাও কোথাও সরল গ্রামবাসীদের সবল প্রতিবাদের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে শবলুব্ধ গৃধ্রের মতো মূর্তি পাচারকারীর দল। অবশ্য অনেক মূর্তি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, বিশেষত ব্রিটিশ আমলে।

সাংবাদিক, সমাজতাত্ত্বিক, গবেষক শ্রী বিনয় ঘোষের পুরুলিয়ায় ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় ওনার সহযোগী ছিলেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বাংলার শিক্ষক শ্রী শান্তি সিংহ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, 'পুরুলিয়ার আনাইজামবাদ, লৌলাড়া থেকে বড়াম প্রভৃতি গ্রামে সরেজমিন সমীক্ষায় গিয়ে দেখেছি অনেক জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। তবে না জেনেই জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিশেষত আমোলক, চোবিশি, বেঁকা কিংবা চৌকো পাথরখণ্ড গ্রামের কেউ কেউ গৃহপ্রাঙ্গণে কিংবা খড়ের পালুইয়ের তলার পাটাতন হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে চলেছেন।' প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাত্র কয়েকটি মন্দিরের দায়িত্ব নিয়েছেন। বাকি অনেক মন্দির রয়েছে অযত্নে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে অবলুপ্তির দিকে।

সব মন্দির নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রধান কয়েকটি মন্দির নিয়ে অল্প কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আনাইজামবাদ

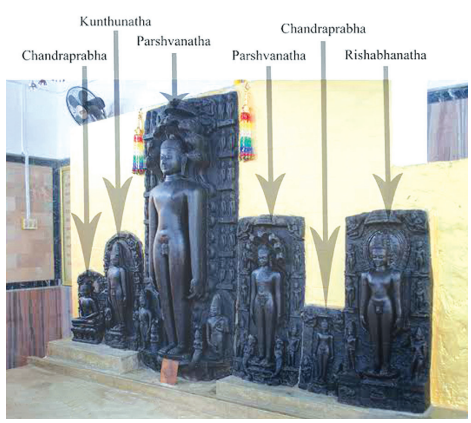

এখানে দিগম্বর সম্প্রদায়ের মন্দিরটি ১৯৭৩-এ নির্মিত। ধানবাদ জেলার খড়খড়ি সারক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই মন্দির নির্মাণ হয়েছে। কয়েক শতাব্দী প্রাচীন মূর্তি যা আশেপাশের গ্রামে সংগৃহীত হয়েছে তা এখানে সযত্নে রক্ষিত ও প্রদর্শিত কথিত আছে অর্ধশতাব্দী পূর্বে এক ঢিবি দেখে একজন সন্ন্যাসী স্থানটির প্রাচীনত্ব অনুমান করেন। খনন করার পর পাওয়া যায় তীর্থঙ্কর এর মূর্তি। এখানে চার জন তীর্থঙ্করের ছয়টি মূর্তি আছে। মন্দিরে কোনো প্রাচীন স্থাপত্য দেখা যায় না তবে মন্দির চত্বরে কিছু পুরনো স্তম্ভ ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রতি শনিবার নিকটবর্তী পুরুলিয়া ১৫ কিমি) থেকে জৈন ভক্তরা নিয়মিত ভাবে আসেন এবং ওদের রীতি অনুযায়ী উপাসনা করেন ও মূর্তিগুলি দুধ - ঘি দিয়ে পরিমার্জন করেন যার ফলে মূর্তির ঔজ্জ্বল্য একটুও ম্লান হয়নি।

বান্দা দেউল

পুরুলিয়া থেকে ৫৫ কিমি দুরে রঘুনাথপুর দুই ব্লকে এই দেউল বা মন্দির অবস্থিত। বালিপাথর (standstone) নির্মিত এই মন্দির প্রায় ৭৫ ফুট লম্বা। রেখদেউল শৈলীতে এই মন্দির সম্ভবত একাদশ শতকে নির্মিত। সামনে একটি ভগ্নপ্রায় মণ্ডপও আছে। মন্দিরের গায়ে লতাপাতা ও অন্যান্য নিখুত কারুকাজ সবাইকে মুগ্ধ করে। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই মন্দির সংরক্ষণ করছেন। চারিদিকে পলাশ গাছে ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গণ।বসন্তকালে যেন আগুন লাগে।

দেউলঘাটা

কংসাবতী নদীর তীরে আড়শা থানায় বড়াম গ্রামে দেউলঘাটা বা মন্দিরের ক্ষেত্র। এক সময় এখানে তিনটি মন্দির ছিল। বড় মন্দিরটি ধবংস হয়ে যায় ২০০২ সালে। এই মন্দিরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৬৪-৬৫ সালে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ডালটন সাহেবের লেখায়। সপ্তম বা অষ্টম শতকে মন্দিরের কাজ শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মন্দিরের ইটের গঠন দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন ডালটন সাহেব। ইটের গঠন এতই নিখুঁত যে মনে হয় যন্ত্র দিয়ে তৈরি। তিনটি মন্দিরই উচু বেদীর ওপর বসানো। এক সময় প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার মন্দিরগুলি কারুকার্যমণ্ডিত ছিল যা আজ প্রায় বিনষ্ট।গর্ভগৃহ বর্গাকার ও প্রবেশপথ ত্রিভুজাকৃতির। মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই তবে অনুমান করা হয় মন্দিরের গায়ে কুলুঙ্গিতে এক সময় তীর্থঙ্করের মূর্তি ছিল। অপরূপ প্রকৃতির মাঝে মন্দিরগুলি প্রচুর পর্যটক আকর্ষণ করে।

তেলকুপি

দামোদর উপত্যকার আদি সভ্যতার নিদর্শন দেখা যায় তেলকুপিতে। সারক বণিকরা রাঢ়ভূমের খনি থেকে পাওয়া আকরিক, বিশেষত তামা, তৈলকম্প (তেলকুপি) বন্দর হয়ে তাম্রলিপ্ত নিয়ে যেতেন। সমৃদ্ধ তেলকুপি হয়ে উঠেছিল মন্দিরনগরী। প্রত্নতত্ত্ববিদ J.D.Belgar ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৩ টি মন্দির দেখেছিলেন। ১৯৫৯ সালে DVC-র পাঞ্চেত বাঁধ তৈরির সময় জলে তলিয়ে যায় মন্দিরগুলি। বর্তমানে প্রখর গ্রীষ্মে জল শুকিয়ে গেলে দেখা যায় তিনটি মন্দির। অন্য সময় জলের ভিতর থেকে মাথা তুলে থাকে একটি বা দুটি মন্দির। মন্দিরগুলি এক কথায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে। যে কোনো সময় তলিয়ে যাবে জলের অতলে। DVC-র বাঁধ তৈরি হবার সময় স্থানীয় মানুষ মন্দির সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন করেছিলেন কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। গ্রামবাসীরা কিছু জৈন ও হিন্দু মূর্তি নিজেদের উদ্যোগে সরিয়ে এনে পার্শ্ববর্তী গ্রামে রাখেন।

পাখবিড়রা

পুরুলিয়া থেকে ৫০ কিমি দূরে পুঞ্চ থানায় পাখবিড়রা বা পাখির বাসা। গাছগাছালিতে ঘেরা জায়গাটিকে এক কথায় পুরুলিয়ার যাদুঘর বলা যায়। একই জায়গায় এত মূর্তি জেলায় আর কোথাও নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদ J.D. Belgar ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ২১টি মন্দির দেখেছিলেন। অনুমান করা হয় এখানে ২৪ জন তীর্থঙ্করের ২৪টি মন্দির ছিল। মন্দিরগুলির নির্মাণ কাল আনুমানিক দশম বা একাদশ শতাব্দী। বর্তমানে মাত্র তিনটি মন্দির অবশিষ্ট। মন্দিরের স্থাপত্য উড়িষ্যার রেখদেউল রীতির। তবে অবশিষ্ট মন্দির গুলি অনেক ঝড়ঝাপটা পার করেছে। মন্দিরের কারুকার্যে প্রতিসাম্যের অভাব। মন্দিরের কিছু অংশ হয়তো পরবর্তীকালে সংস্কার হয়েছে, কিছু অংশ কম প্রাচীন মনে হয়। এখানে মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রধান হলেন আট ফুট উচ্চতার শীতলনাথ (মতান্তরে পদ্মসম্ভব), যিনি এখন কালভৈরব রূপে পূজিত হন। তীর্থঙ্করের মূর্তির নীচে দু দিকে দুটি সিংহ থাকে ও মাঝে একটি অন্য পশু, যা থেকে কততম তীর্থঙ্কর তা শনাক্ত করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে একটি সংগ্রহশালা নির্মিত হয়েছে। এই অঞ্চলে পাওয়া অপরূপ কারুকার্যমন্ডিত বহু তীর্থঙ্কর মূর্তি, মূর্তির অংশ, অম্বিকা মূর্তি, স্তম্ভের অংশ, কলস, চৈত্য ইত্যাদি এখানে প্রদর্শিত হয়। তবে এখানে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো প্রায় অক্ষত কালো কষ্টি পাথরের তৈরি একটি স্ল্যাব, যাতে ১৫ টি উল্লম্ব স্তম্ভ ও ২৪টি সারি রয়েছে। প্রতি স্তম্ভের প্রতি সারিতে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র মূর্তি যা জৈন তীর্থঙ্করের বলে স্বীকৃত।

এ ছাড়াও পুরুলিয়ার অগণিত স্থানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য জৈন মূর্তি। সরকারের উদ্যোগে যার আশু সংরক্ষণ প্রয়োজন। না হলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই ঐতিহ্য কালের অতলে তলিয়ে যাবে।

বিভিন্ন অঞ্চলে জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

লেখক ভারতীয় রেলে আধিকারিক।

কবিতার বিদ্যাপীঠ: বিদ্যাপীঠের কবিতা

ডা. রজতকান্তি সিংহচৌধুরী (১৯৮২)

(এক)

সে ছিল গেল শতকের সত্তর দশক। টগবগ করে ফুটছে বাংলাদেশের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা, ঘরে- বাইরে একটাই ধ্বনি: 'জয় বাংলা'। নকশাল আন্দোলন আর ইমার্জেন্সির ঝাপটে দুনিয়া না হোক, গোটা রাজ্য তো থরথর কাঁপছেই।

এসবের মধ্যে থেকেও কিংবা এসবের মধ্যে থেকেই আমরা বিদ্যাপীঠের আনপড়ুয়া বৈতালিকদল কৈশোরের রহস্যময় সাহসিকতায় আমাদের সেই শিল্পশোভার সার নিবেদিতা কলা মন্দিরের গানের ক্লাসে 'বিশ্ববিদ্যার তীর্থপ্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে' গেয়ে চলেছি নিতান্ত দানা-না-বসা অপ্রস্তুত গলায়, অধিকন্তু তারস্বরে। গানের ক্লাসের চার-দেয়াল-জোড়া আমাদের শিক্ষক তথা স্বনামধন্য শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ম্যুরালে চৈতন্যলীলা - 'চৈতন্য ভাগবতে'র কবিতার উদ্ধৃতিমণ্ডিত। ক্লাসের এক কোণে নীরব সাক্ষী রবীন্দ্রস্পর্শধন্য গ্র্যান্ড পিয়ানো, যেটি বরিষ্ঠ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্ত মশাই সসম্ভ্রমে দিয়ে যান আমাদের বিদ্যাপীঠকে। ক্লাসের চৌকাঠের ঠিক বাইরে বড়ো বড়ো আম আর অর্জুন গাছের সবুজ-সবুজ শাখায় বলয়িত নীল আকাশের নীচে আমাদের শিল্পশিক্ষক পাঁচুদা, পাঁচুগোপাল দত্ত কোঁকড়া চুল আর ভারী ফ্রেমের চশমায় ঝুঁকে পড়েছেন আসন্ন সরস্বতী পুজোর জন্য সারদা-মূর্তি নির্মাণে; শিক্ষাকর্মী অঘোরদার জুগিয়ে-চলা তাল-তাল মাটি থেকে স্ফুটন-উন্মুখ দেবীমূর্তি। জমি থেকে ফুট দুয়েক উঁচু করে বাঁধানো ভিত্তিমূলের ওপর ছোট্ট বাগানে-ঘেরা এই শিল্প-সংগীত ভবনের নাম যাঁর নামে, সেই সিস্টার নিবেদিতা শিল্পের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন অবন ঠাকুর, নন্দলালের মতো শিল্পাচার্যদের। অনতি-উচ্চ তোরণশীর্ষে খাজুরাহোর সিংহের মতো সারিবদ্ধ সিংহরাজি আর ফলকে উদ্ধৃতি 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি', শিল্পকলার মাধ্যমে আত্মসংস্কৃতি কর্তব্য। রোজ দেখতে-দেখতে মন্ত্রের মতো ছেলেবেলার গড়ে-উঠতে-থাকা ব্যক্তিত্বে অক্ষয় আঁচড় বুলিয়ে গেছে।

এই নিবেদিতা কলামন্দিরেই গানের ক্লাসে প্রবীণ তুলসী-দা, যিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকেই এসেছিলেন, শৈলজারঞ্জনশিষ্য সব্যসাচী-দা, তাঁর মোহরদির ছাত্র সুকেশ-দা, উদারকণ্ঠ সমর-দার পদপ্রান্তে বসে শুধু ভক্তিগীতি নয়, রবীন্দ্রগানেরও কিছু মণিমুক্তো আমরা অর্বাচীনেরা চয়ন করতে পেরেছিলাম যথাসাধ্য। 'যথাসাধ্য' বলার একটা কারণ আছে! এই সব অনুপম কবিতার সুরারোপিত রূপ ছাত্রদের গলায় তোলার আগে শিক্ষকেরা হয় শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে, না হয় সুন্দর হস্তাক্ষরে ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর সাদা চক দিয়ে লিখে ছাত্রদের গানের খাতায় তুলে নিতে বলতেন। একদিনের ঘটনা বলি? পেয়ালা আর ঠোঁটের মধ্যিখানে অজস্র পিছলতার ব্যাপার এটা। ক্লাস ফোরে সেটাই আমাদের প্রথম গানের ক্লাস, আর সেটা সরস্বতী পুজোর আগের সময়। তুলসীদা ডিক্টেশন দিচ্ছেন বসন্ত রাগে আর তেওড়া তালে নিবদ্ধ সরস্বতী-বন্দনা, "শ্বেত শতদলে সারদা রাজে / অতি সুশীতল কান্তি বিমল নেহারি নয়ন মোহিল রে... আমরা সাধ্যমতো কপি করে চলেছি। লেখা হলে তুলসীদা দেখে সংশোধন করে দিচ্ছেন। এই করতে গিয়ে এক চিত্তির! কতই বা বয়েস তখন আমাদের। দেখা গেল, এক বন্ধু 'তুমি নারায়ণী বাগবাদিনী' অংশটিতে পৌঁছে, 'তুমি নারায়ণী বাঘ ও বাঘিনি' লিখে ফেলেছে! স্পষ্টত, 'অজ্ঞাননাশিনী বিজ্ঞানদায়িনী' দেবী তখনো জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় আমাদের মতো অজ্ঞানতিমিরান্ধজনের চক্ষুরুন্মীলন করিয়ে উঠতে পারেননি! সে-যাত্রা সঙ্গে-সঙ্গেই অবশ্য সযত্নে সংশোধন করে দিলেন তুলসী-দা।

এই প্রথম ক্লাসের পরেপরেই তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ। বিদ্যাপীঠে আমাদের চোখের সামনে মৃত্যুর প্রথম হানা।

তুলসী-দার শোকসভাতেই সভাগৃহে তরুণ সংগীতশিক্ষক সুকেশ-দা, যাঁর ছেলে অরূপেশ আমাদেরই সহপাঠী, 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই' গেয়েছিলেন। বেহাগের কোমল মিড়ে কেঁপে-ওঠা উদগত অশ্রুভারে গানের শেষ দিকে গলা বুজে এসেছিল সুকেশ-দার। সেই সন্ধ্যায় সেও এক যৌথ স্মৃতির সঞ্চয়।

ঘরছাড়া ছেলেদের মনখারাপ কাটাতে আমরা বিদ্যাপীঠের যেখানে যেটুকু পেতাম, মজা খুঁজে বেড়াতাম। কলামন্দিরে সুকেশদারই কাছে শেখা রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী গান, যা গান্ধিকেও স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে বলে পরে শোনা, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। তো, গানের পরীক্ষায় এ গান আমাদের এক তত- সংগীতমনস্ক-নয়-অথচ-ক্রিকেটে-দক্ষ বন্ধু গাইতে বসে ভারি মুশকিলে পড়ল। আর কিছু না, সে বেচারা বাউলাঙ্গ ওই রবিগানের 'ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়' অংশে এসে 'অভাগা'র বদলে বারবার "হতভাগা" গেয়ে বসছিল। দুটো শব্দে অর্থের প্রভেদ যৎকিঞ্চিৎ, তবু 'অকিঞ্চিৎকর' এ রবীন্দ্রবিচ্যুতি বেচারাকে বারেবারেই ছন্দোভ্রষ্ট তথা তালচ্যুত করে কী যে নাজেহাল করছিল ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়!

অদূরে সারদা মন্দির, বড়োদের স্কুলবাড়ি। কী আশ্চর্য তার নির্মাণশৈলী আর বর্ণিমা! মাঝখানে দেবী সরস্বতী অবতরণরতা, পাদপদ্মযুগ ঈষৎ নমিত; নীচে চতুষ্কোণ এক জলাশয়ে তাঁর আবাসস্বরূপ প্রস্ফুরণশীল পদ্মবন। পরে জেনেছি, বিদ্যাপীঠের সমস্ত স্থাপত্য-ভাস্কর্য-শিল্পকাজ যাঁর রচনা, তিনি শিল্পী সুনীল পাল, যিনি আবার সব কৃতিত্ব দিতে চান আমাদের বিদ্যাপীঠের শিল্পমনস্ক প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজিকে, 'শুধু আমিই জানি বিদ্যাপীঠের আসল আর্টিস্ট স্বামী হিরন্ময়ানন্দ।'

প্রেয়ার হলে রোজকার গানে মীরাবাঈ, তুলসীদাস, সুরদাসের ভজন থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রামপ্রসাদ, দাশরথি রায়, কমলাকান্ত, প্রেমিক, রাজা নবচন্দ্র, শ্রীরামপ্রসন্নের শান্ত পদাবলি আর মনোহরশাহি কীর্তনের সুরে আগমনী গান থেকে আধুনিক যুগের স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুলের সুরে-সিক্ত কাব্যসুধারসে অভিষিক্ত হতে বাধা ছিল না। দিগন্ত-ছোঁয়া খোলা প্রকৃতি, উদারপ্রকৃতির শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী আর একদল সহৃদয় বন্ধুর মধ্যে যেমন, তেমনি বিদ্যাপীঠে এই কবিতা, গান, ললিতকলা আর আত্মসংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের কৈশোর উদযাপন। এগুলো যে আবহমান মানবসংস্কৃতিরই এক স্ফার্ছেঁড়া আলো, সেটা বোঝবার মতো বয়স বা বোধ কোনোটাই তখনও হয়নি অবিশ্যি।

(দুই)

ক্লাস সিক্সের বাংলা ক্লাসে আধুনিক কবিতার নিতান্ত অদীক্ষিত আমাদের সেই 'আনপড়ুয়া'দের জীবনানন্দ পড়াতে এলেন আমাদের শিক্ষক তথা সাতের দশকের আধুনিক কবি শান্তি সিংহ। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়, হে, কে বাঁচিতে চায়' কিংবা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনসংগীত' (বোলো না কাতর স্বরে। বৃথা জন্ম এ সংসারে / এ জীবন নিশার স্বপন..), এমনকি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' অথবা কাজি নজরুলের 'কুলি' ক্লাস ফোর-ফাইভেও পড়ানোর সূত্রে সুপরিচিত যে শিক্ষক পড়িয়েছেন, তাঁর জায়গায় কেন যে আমাদের প্রজ্ঞাবান প্রধান শিক্ষক মহারাজের মনে হল, 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে-ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়' পড়ে থাকা আমাদের মতো চর-আগাছাদের উদ্ধার আধুনিক কবি শান্তিদার হাতেই হতে পারে, তা তিনিই বলতে পারবেন। তবে, 'কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠালছায়ায়'-এর নতুন কাব্যভাষা নিয়ে আমাদের জীবনে জীবনানন্দের আগমন ছিল বস্তুত আবির্ভাব, পরে যা জীবনপথের পাথেয়।

বাংলা কবিতার সীমা-সরহদ্দ যে রবীন্দ্রনাথের পরেও দূরবিসারী আর জীবনানন্দ যে এ প্রবাহের এক মান্য ভগীরথ, সে-বোধ অবিশ্যি ইতোমধ্যেই আমাদের ভেতরে চারিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের প্রণম্য শিক্ষকেরা।

তবে প্রণিপাতের পাশাপাশিই তো ঘাপটি মেরে পরিপ্রশ্ন থাকে! গোল বাঁধল 'রূপসী বাংলা'র ওই 'আবার

আসিব ফিরে' নাম দিয়ে সংকলিত সনেটটিরই 'হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে''. চরণে পৌঁছে। আর কিছু নয়, 'সুদর্শন' শব্দের অর্থ নিয়ে। শান্তিদা যদি বলেন, সুদর্শন মানে 'চিল', আমাদের আর এক অদীনপুণ্য শিক্ষক বলেন সমগোত্রীয়, কিন্তু ভিন্ন এক ঊর্ধ্বচারী গগনবিহারী শবগৃধ্নু শকুন্তের কথা।

এখন, তর্কযুদ্ধ অর্থে ইংরেজি 'Polemics' কথাটা যে-গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে, সেই 'polome' মানে তো রীতিমতো যুদ্ধ। বঙ্গজ ধরনে আমরা অবশ্য যুদ্ধকে রঙ্গ বলেও দেখতে অভ্যস্ত, 'রণরঙ্গ' শব্দে যার স্বাক্ষর স্বচিহ্নিত। পণ্ডিতেরা যখন তর্কযুদ্ধেও নামেন, তা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হয়।

আমাদের বিদ্যাপীঠের গগনতল যখন সেই দিব্য আলোর দীপ্তিতে বিভাসিত, তখনই শান্তিদা কলকাতায় গিয়ে তাঁর শিক্ষকপ্রতিম কবি-মনস্বী শঙ্খ ঘোষের কাছ থেকে রায় নিয়ে এলেন। জীবনানন্দের উৎসারভূমি বরিশালেরই আর এক কৃতী সন্তান শঙ্খ ঘোষ তাঁকে জানিয়েছেন, 'সুদর্শন' শব্দটি তাঁদের বরিশালে 'চিল' অর্থেই ব্যবহার করা হয়। তখন অবশ্য এসব জানতাম না, পরে শান্তিদার বয়ানেই এ কাহিনি শোনা।

বহুশাস্ত্রবিৎ হেডমাস্টার মহারাজ ব্রহ্মচারী শম্ভুচৈতন্য (পরে, স্বামী অমরানন্দ), যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেও আমাদের পড়াতেন উঁচু ক্লাসে উপনিষদের প্রাথমিক পাঠ, বলেছিলেন, 'শান্তিবাবু আপনি তো ভাটপাড়ার পণ্ডিত নয়, একেবারে কাশীর পণ্ডিতের রায় নিয়ে এসেছেন! প্রসঙ্গত, কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষও কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনী, স্টুডেন্টস হোমে আর প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের বিশিষ্ট বাংলা শিক্ষক ও বৈয়াকরণ ফণীদার সিনিয়র।

আমাদের বিদ্যাপীঠে ছিল এক চমৎকার লাইব্রেরি। বাংলার দোচালা ঘরের আদলে অনুপম স্থাপত্যশৈলীর এই লাইব্রেরি থেকে প্রতি সপ্তাহে বই তোলা ছিল, যাকে বলে, বাধ্যতামূলক। নীচু ক্লাসে স্টোরি টেলিং বা লাইব্রেরির আলাদা পিরিয়ড থাকত। ঘরছাড়া কিশোরের ছুটির দুপুরের আশ্রয় ছিল এই লাইব্রেরি। অবনীন্দ্র রচনাবলির মতো বড়ো-বড়ো বই 'বরো' করে আনা যেত না। স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে দিনের পর দিন রিডিং রুমে বসে একটু একটু করে পড়া গেছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলি থেকে 'বুড়ো আংলা'র মতো তুলনাহীন কিশোর-উপন্যাস। অবনীন্দ্রনাথের লেখাতেই পরে পড়েছি, 'শিশুকালের দিনরাতগুলোর জন্য সব মানুষের মনে যে একটা বেদনা আছে, সেই বেদনভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক, যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন।' আমাদের সাধারণ মানুষের দেখার ভেতরেও কি এই অভিনবত্ব এসে পৌঁছতে পারে না কখনো? জীবনানন্দের বিপরীত উচ্চারণেই কি আমরা বলে উঠতে পারি না—কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি?

প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক সংযোগের রাস্তাগুলোকে রুদ্ধ করতে করতে তো আমাদের চলা কেবল যে বাইরের প্রকৃতি থেকে আমাদের বিযুক্ত করে রাখে তা নয়, আমাদের স্বাভাবিক অন্তঃপ্রকৃতি থেকেও আমাদের বিচ্ছিন্ন করে। বিদ্যাপীঠের খোলা মাঠ, উদার আকাশ, সবুজ দিগন্ত শিশুকিশোরমনের স্বাভাবিক বিকাশের, সৃজনশীলতার ধাত্রী। লেখাপড়ার বাইরে খেলাধুলা, গানবাজনা, আবৃত্তি-বক্তৃতার ব্যাপারে সাধুবৃন্দ আর শিক্ষককুলের প্রণোদনা কচি মনে সুষুপ্ত অনন্ত জ্ঞান, অপার শক্তি, অদম্য উৎসাহের অঙ্কুরোদগম ঘটায়। বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তায় ছিল এই প্রকৃতিলগ্নতার কথা, 'প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়।' (উদবোধন, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৯) ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো স্বামীজির বোধেও ছিল, 'Let Nature be thy teacher'। এমার্সন থেকে মার্ক টোয়েন সবাই পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জীবনশৈলী থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন প্রকৃতিঘনিষ্ঠ সরল জীবনধারায়।

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার শিক্ষা নয়; সবার ভেতরে ক্ষমতা আছে এই বিশ্বাস থেকে স্বামীজি পতঞ্জলিকে উদ্ধৃত করে বলছেন, 'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ' (যোগ, ৪/৩), ক্ষেত্রিক বা চাষির মতো সুপরিমিত, সুনিয়ন্ত্রিত জলসেচন করাই শিক্ষকের কাজ।

আর একটা শিক্ষা ছিল বিদ্যাপীঠের, যেটা অল্প বয়সে আমাদের কারো কারো কাছে কষ্টকর ঠেকলেও পরবর্তী জীবনসংগ্রামে সহায়ক, কবিতা-সহ সব সুকুমারবৃত্তির আর মননশীলতারও উদ্দীপক। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে ছাত্রদের আহার-বিহার বা পোশাক-আশাকে কোনো বাহুল্যের জায়গা ছিল না। শিক্ষকদের দক্ষিণাও ছিল সীমিত, জীবনযাত্রা সাদাসিধে, কিন্তু মনন উচ্চতম স্তরের। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, অনুভূতি ও মননকে যদি সচেতন রাখতে হয়, "তাহলে নিজেকে অতিপ্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করা চাই।" (ছিন্নপত্র। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করছেন জার্মান মহাকবি ও চিন্তক গ্যোয়েটের চরণ, 'Entbehren sollst du, sollst entbehren', (Thou must do without, do without'), যা ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় মন্ত্রের মতো, রবীন্দ্র ভবনে সুরক্ষিত তাঁর 'সোনার তরী'র পাণ্ডুলিপির মার্জিনে এই গ্যোয়েটে-সদুক্তি বিরাজমান। পশ্চিমের ভাবুক ও কবি হেনরি ডেভিড থোরো-র 'ওয়াল্ডেন'-এর রাস্তাও এই ভোগিষ্ণু অতিপ্রাচুর্য আর জনারণ্য থেকে সরে এসে বনভূমিবেষ্টিত জলাশয়ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশে কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে চেতনা জাগ্রত রাখার রাস্তা। 'Thou must do without' তো সুখকাতর বাইরের আমি-র খোলসটাকেই খোলসা করে ঝেড়ে ফেলা ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মসুখের বাইরে ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন বলে যে কিছু একটা হতে পারে সে-শিক্ষা আমাদের বিদ্যাপীঠের।

আর এ শিক্ষার কর্ণধার বিদ্যাপীঠের সন্ন্যাসী আর শিক্ষকেরা। মহাভারত-অনুভাবিত ভাবনায় আমরা শুনেছি নাকি পাঁচটি অগ্নি আছে:

পিতা মাতা ভ্রাতা আত্মা গুরু।

শেষোক্ত এই হোমাগ্নিতে দেদীপ্য আমাদের বিদ্যালয়-জীবন, উত্তরজীবন।

(তিন)

ক্লাস সেভেনে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আর প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়— সম্পাদিত বাংলা আধুনিক কবিতার এক স্কুলপাঠ্য সংকলন 'কবিতাগুচ্ছ' আমাদের দ্রুতপঠন হিসেবে ছিল। (পরে যখন এঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ, জেনেছি, দুই কবি আপন মামাতো-পিসতুতো ভাই।)

'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।'

রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের 'আরোগ্য' বইয়ের এ কবিতা দিয়ে সুচিত এই সংকলন আমাদের হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল উত্তররৈবিক বাংলা কবিতার রহস্যচঞ্চল অন্দরমহলে। অমিয় চক্রবর্তী ('উদয়ন'), বুদ্ধদেব বসু ('বিকেল'), সুভাষ মুখোপাধ্যায় ('যত দূরেই যাই'), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('মানুষ'), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ('স্বপ্নে দেখা ঘরদুয়ার'), শঙ্খ ঘোষ ('মহিষ'), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ('বুধুয়ার পাখি'), শক্তি চট্টোপাধ্যায় ('বদলে যায়'), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ('ডাকঘরের অমল') প্রমুখের কবিতা থেকে বাংলা আধুনিক কবিতার এক রোদসীরেখার দেখা তো পাওয়া গেল এ বইয়ের সৌজন্যে অল্প বয়সেই।

'গাছের সবুজে রোদের হলুদে গলাগলি /
পাতায় পাতায় হঠাৎ হাওয়ায় বলাবলি /
উঁকি দেয় মনে ভীরু কবিতার ক্ষীণ কলি /
আহা বিকেল! সোনার বিকেল!'...

এই ছিল বুদ্ধদেব বসুর 'বিকেল' কবিতার সুচনা। পড়াতেন, শান্তিদা, কবি শান্তি সিংহ।

আর কবি-অভিনেতা-সম্পাদক দিলীপদা, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় একদিন আবৃত্তি করে শোনালেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'মানুষ', যার পুরোটাই স্মৃতিধার্য,

তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে;
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে।
তবু সে এখনো মুখ
দেখে চমকায়,
এখনো সে মাটি পেলে
প্রতিমা বানায়।

মনে আছে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'স্বপ্নে দেখা ঘরদুয়ার': 'পুকুর মরাই সবজিবাগান জংলা ডুরে শাড়ি
তার মানেই তো বাড়ি / তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ / নিকিয়ে নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টানটান'... পড়ে প্রবাসী মনটার উদাস হয়ে ওঠা আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ডাকঘরের অমল' কবিতার শেষ চরণ, 'সুধা তাকে আজও ভোলেনি।'র রোমাঞ্চের ছোঁয়া। ছিল অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'বুধুয়ার পাখি', যা তাঁর সুখ্যাত প্রথম কবিতার বই 'যৌবন বাউল'-এরও প্রথম কবিতা :

জানো এটা কার বাড়ি? শহুরে বাবুরা ছিল কাল,
ভীষণ শ্যাওলা এসে আজ তার জানালা দেয়াল
ঢেকে গেছে, যেন ওর ভয়ানক বেড়ে গেছে দেনা,
তাই কোনো পাখিও বসে না!
এর চেয়ে আমাদের কুঁড়েঘর ঢের ভালো, ঢের
দলে-দলে পাখি এসে নিকোনো নরম উঠোনের
ধান খায়, ধান খেয়ে যাবে—
বুধুয়া অবাক হয়ে ভাবে।'...

মনে রাখতে হবে, এটা সেই ভয়ংকর সত্তরের দশক। শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা'র (রচনা : ১৯৭৪-৭৬, প্রকাশ : ১৯৭৬) কবিতাগুলো লেখা হচ্ছে। নকশাল আন্দোলনের দিনে শাসকের দমনপীড়নের বিরুদ্ধে 'রাধাচুড়া' আর 'আপাতত শান্তিকল্যাণ'-এর মতো কালজয়ী প্রতিবাদের কবিতা সেন্সরড হচ্ছে ইমারজেন্সির কুয়াশাকুটিল কাঁচিতে। আর কলকাতার রাজভবনে আহূত এক বিদ্বৎসমাবেশে বন্ধুর এই কবিতা দুটিকে নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মুখের ওপর একতরফা তর্ক ছুঁড়ে দিচ্ছেন অলোকরঞ্জন, অদ্ভুত প্রতিভা আপনার! অরাজনৈতিক কবিদেরও রাজনৈতিক বানিয়ে ছাড়লেন।' তাঁর কথা শুনে ইমারজেন্সির দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্দিরাও মুখ লাল করে কক্ষত্যাগ করছেন। অনুগামী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর অলোকরঞ্জনকে বলছেন, আপনাকে কিন্তু arrest করা যায়!

আর এই সময়েই অলোকরঞ্জনের হাত থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে প্রতিবাদ ঋজু 'গিলোটিনে আলপনা'র (১৯৭৭) সমসময়লগ্ন কবিতাগুলো

এসব অবশ্য তখন সেই কিশোর বয়সে আমাদের জানবার কথা নয়, জেনেছি ঢের পরে।

উত্তরকালে শঙ্খ ঘোষ বা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। কিন্তু বলা চলে, এঁদের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হবার আগেই এই অধমের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল। আর বলা বাহুল্য, সেটা বিদ্যাপীঠের সৌজন্যেই।

ক্লাসের পড়ার বাইরেও সভাগৃহের অনুষ্ঠানে চিত্তদা, চিত্তরঞ্জন দত্তের গলায় শুনেছি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতার মন্দ্রমদির উচ্চারণ, 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?'

অথবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কলঘরে চিলের কান্না'র মতো কবিতার আবৃত্তি। ছাত্রদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার সূত্রে মুখস্থ হয়েছে সুকুমার রায় থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা। অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছেন দিনেশ দাসের মতো কবি। আমাদের বিদ্যাপীঠে ভর্তি হবারও আগে স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে কবিসম্মেলন, যাতে বাংলার অনেক বড়ো বড়ো কবি আহূত হয়ে এসেছেন শুনেছি।

শ্যামলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দত্ত থেকে সেদিনের দুই তরুণ বাগ্মী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বা শক্তিপ্রসাদ মিশ্রের মতো ইংরেজি শিক্ষকদের সৌজন্যে শেক্সপীয়ার, শেলী কীটস, ব্রাউনিং, টেনিসন, কিপলিং, রবার্ট ফ্রস্ট, উইলিয়াম হেনরি ডেভিস থেকে সরোজিনী নাইডুর চরণস্পন্দচিহ্নিত ইংরেজি সাহিত্যের কাব্যজগৎ নিতান্ত দূরের গ্রহ ছিল না। স্বপনদার ক্লাসে রবার্ট ফ্রস্টের, 'And miles to go before I sleep / And miles to go before I sleep." এর মতো লাইন এক জীবনবেদেরও দীক্ষা দিয়েছিল আমাদের মতো অদীক্ষিতদের। খুব অল্পদিনের জন্য আমাদের ক্লাস নাইনে এসেছিলেন সুসাহিত্যিক ও পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রধান রামকুমার মুখোপাধ্যায়, পড়িয়েছিলেন সরোজিনী নাইডুর 'The Song of the Palanquin Bearers', তাঁর সুরেলা উচ্চারণে 'Lightly, o lightly we bear her along' আজও কানে লেগে আছে।

আর বছর-বছর 'বিদ্যাপীঠ' ম্যাগাজিনের বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি বিভাগে ছাত্রদের কবিতা লেখার আহবান তো ছিলই, রবীন্দ্রজয়ন্তী থেকে বিজ্ঞান-দিবসের অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পড়ার সুযোগও কম আনন্দের ছিল না।

প্রিয় বিদ্যাপীঠের পাঁচালিতে পায়ে পায়ে অনেকটা পথ উজিয়ে এসেছি। ফেরা যাক শুরুর দিকে, পর্দা ওঠার দিনে। যেদিন, রঙ্গভূমির বয়ানে যাকে বলে, যবনিকা কম্পমান।

(চার)

'মুক্তি-আলোকে ঝলমল করে আঁধারের যবনিকা।'

সেই যে হারানো দিনের গানে ছিল না? তা পর্দা ওঠে পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের সেই আবাসিক বিদ্যালয়ের অভেদানন্দ ধামে। ন-বছর বয়সে ক্লাস ফোরে ভর্তি হয়েছে একটি ছেলে।

জানুয়ারির এক ঝুঁঝকো ভোরবেলা। সে তার বাড়ি ছেড়ে, মা, দিদু, ভাইবোনেদের ছেড়ে বাক্স-বেডিং নিয়ে রওনা হয়েছে তার বাবার সঙ্গে। মনটা ক-দিন থেকেই হু-হু করে ওঠে থেকে থেকে। সেখানে অবশ্য অনেক বন্ধু হবে। আর স্কুলটাও সে দেখেছে। ভারি সুন্দর। আচ্ছা, এই যে দূরদূরান্ত থেকে সব বন্ধুরা আসবে, জড়ো হবে, এক সঙ্গে খেলাধুলো, পড়াশোনা, তারপর? ক-বছর পরে আবার সব আলাদা আলাদা। আর দেখা হবে না তাদের? এই অদ্ভুত ভাবনাতেও তার মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

দেখতে দেখতে এসে গেল স্কুলে ভর্তি হবার দিন। ভোরবেলা গৃহদেবতার মন্দিরের সামনে করবী গাছটার পাতায় হাওয়ার শর্-শর্ শব্দ। 'Oh there is a blessing in this gentle breeze', কৃতজ্ঞতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা মনে পড়ল তার। বাবার মুখে শোনা।

সদর দরজার দুপাশে ভরা ঘটে আমের পল্লব। চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে দুর্গামণ্ডপ, আটচালা, কাছারিঘর, বৈরাগী পাড়ার ছায়া। দোলমঞ্চ, ফুলের-অপেক্ষায়-থাকা কোঁকড়াচুলো ঝাঁকড়ামাথা বড়োসড়ো সেই বকুল গাছটা। পেরিয়ে এল রাস্তার ধারের নাগকেশর গাছ।

শিলাবতীর পাড়ে হেলে পড়া এই বটগাছই গ্রামের সীমানা। এবার নদী পার হয়ে বাস ধরতে হবে। শীতের শান্ত শিলাবতী। হু-হু করে কেবল একটা হাওয়া দিচ্ছে। মাথার ওপর খুব ঠান্ডা একটা হিম-ঝরানো খোলা আকাশ।

চারদিক ধব্-ধব্ করছে একটা কচি আমপাতা আলোয়।

বাবার সঙ্গে বাসে চড়ে বসল সে। আরও কত নদী, পাহাড়, শহর, মাঠ, বন পেরিয়ে পুরুলিয়া। আর আকাশতলায় ছবির মতো ছিমছাম তার নতুন স্কুল।

তাদের সেই চমৎকার স্কুলে সব কাজকর্ম ছিল রুটিনে বাঁধা। মনখারাপ করবার অবকাশই বা কোথায়? সেখানে প্রত্যেক রবিবার মা-বাবাকে চিঠি লেখা ছিল অবশ্যকৃত্য। তবু এই চিঠির ফাঁকে- ফাঁকেও তো অনেক কথা জমে ওঠে। সেগুলো চিরকুটে বা খাতায় লিখে রাখা। এই অক্ষরমালা, এই মন-কেমনগুলিই তার কবিতার বীজ মনে হয়। বহু পরে দ্বিতীয় বই "মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে'-তে (২০১১) অনুসৃত এক কবিতায় সে লিখেছিল,

'সকলের কত কি যে থাকে
আমার তো বই ছিল, পড়ার এবং না-পড়ারও
আর ছিল উদার প্রকৃতি
আকাশতলায় ছাত্রাবাস
মা-বাবার আসা-যাওয়া মাসে মাসে
সপ্তাহান্তে চিঠি

বাড়ির জন্য, মা-বাবা-দিদুর জন্য, ভাইবোনেদের জন্য, তার পল্লী আর নদী শিলাবতীর জন্য নস্টালজিয়া এর উপাদান।

বন্ধু ছিল অনেক। তাদের সঙ্গে খেলার মাঠে, প্রেয়ার হলে বা পড়ার ঘরে সময় কেটে যেত। তবু সেই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না, "বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা"? এর ভেতরেই কবিতা কখন অবলম্বন হয়ে উঠেছিল।

শিক্ষকদের প্ররোচনায় আর স্কুল লাইব্রেরির সৌজন্যে বিশ্বসাহিত্যের নানা অঙ্গনের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়টা ঘটতে পেরেছিল।

ক্লাস ফোর থেকেই স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা লেখা শুরু। বিদ্যাপীঠের অতুলনীয় বন্ধুরা সযত্নে সংগ্রহে এনেছেন সেই ১৯৭৫ সালের 'বিদ্যাপীঠ' ম্যাগাজিন থেকে অধীনের কিছু বাল্যলীলাক্ষর:

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
ফল ফুল পাতা নড়ে
চাষীর হাতে লাঙল গোরু, চাষের কাজ আজ হলো শুরু
আনন্দেতে ময়ূর নাচে, লাল নীল ফুল ঝুলছে গাছে। ('বৃষ্টি পড়ে')

ম্যাগাজিনের সম্পাদক ফণী-দা, তাঁর সঙ্গে ওই নীচু ক্লাসে তখনো মুখোমুখি আলাপ হয়নি। পরে শুনেছি, ১৯৬৭ থেকে এ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়াগুড়ি অবদি "বিদ্যাপীঠ" ম্যাগাজিনের দক্ষ সম্পাদনা করে গেছেন। বিদ্যাপীঠের আর্কাইভে উঁকি দিলেই পত্রিকার সযত্নলালিত গুণমান সম্পর্কে আস্থা বজায় থাকে। ফণী-দা তো বটেই, লেখালেখি ব্যাপারটাকে শিক্ষকেরা সবাই উৎসাহ দিতেন। আর বাবা-মায়ের প্রেরণা তো ছিলই।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটির স্তব্ধ দুপুরে তার পিতামহী বা দিদুর কণ্ঠে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শোনা ছিল প্রাণের আরাম। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলিও ছিল দিদুর নখদর্পণে। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের অনেক মণিমাণিক্য তাঁর সৌজন্যেই আহরণ করা। আর তার কবিতায় প্রবহমান মিথ, পুরাণপ্রতিমাগুলিরও আদি উৎস তো তিনিই। আর রূপকথা, ছেলে-ভুলানো ছড়া, ছন্দোবদ্ধ ধাঁধা কত শুনেছে সে ওঁর কাছে।

বাবা ইংরেজি সাহিত্যের উজ্জ্বল ছাত্র। শেক্সপীয়ার, কোলরিজ, শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং, ইয়েটস, এলিয়টের সঙ্গে আলাপ তাঁরই দাক্ষিণ্যে। আজও বিরল মুহূর্তে বাবার সঙ্গে সাহিত্যালাপ সেরা বিনোদন।

আর উচ্চ চিন্তা এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির প্রতি আগ্রহ চেতনা-প্রত্যুষে জাগিয়ে তুলেছেন মা। রবীন্দ্রনাথের গান

তো ছিলই,

‘সারা আকাশ তোমার দিকে
চেয়েছিল অনিমিখে’

গানের কলি এখনো কানে ভাসে।

তাছাড়া কিশোরপাঠ্য নানা গল্প কবিতার সঙ্গেও মা আমাদের পরিচয় করিয়েছিলেন। স্কুলে যখন বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগত, ভাবতাম, মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্যই এত দূরের স্কুলে পড়াশোনা করছি। তাতে করে মনে বল আসত।

আর ছিলেন আমার প্রিয় শিক্ষককুল। প্রত্যেক ছাত্রকে নামে চিনতেন তাঁরা। খেলাধূলোয়, গানে, আবৃত্তিতে, কবিতা লেখায় উৎসাহ দিতেন।।এছাড়া সভার সূচনায়, ডাইনিং হলে অথবা পরীক্ষার হলে জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত গীতা, উপনিষদের মন্ত্র, যেগুলি তো আদতে কবিতাই।

(পাঁচ)

আবাল্য কবিতা লেখা হত। খাতায় পড়ে থাকত। ভাবতাম এরকম তো অনেকেই লেখে। মুখচোরা স্বভাবের জন্য বন্ধু বা গুণিজনদের দেখাতাম না। কাজেই লেখাটা আদৌ কিছু হচ্ছে কিনা বোঝবার রাস্তা ছিল না। হ্যাঁ, স্কুলের পরে আমাদের নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের ম্যাগাজিনেও নিয়মিত লিখেছি। কিন্তু তার বাইরে উদ্যোগী হয়ে পত্র-পত্রিকায় পাঠানো হয়ে ওঠেনি। কলেজ-উত্তীর্ণ বয়সেও।

স্নাতোকোত্তর পড়াশোনার সময় আমাকে রোজ সকালবেলা নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে কলেজ স্ট্রিটের মেডিকেল কলেজে হেঁটে আসতে হত। পথের মধ্যে নানা দৃশ্যের জন্ম হয়। একদিন দেখলাম, একজন দেহাতি শ্রমজীবী মানুষ নেবুতলা পার্কের ঘাসের ওপর উবু হয়ে বসে চিঠি লিখছেন। প্রথমে মনে, পরে কাগজে-কলমে উঠে এল কয়েকটি চরণ:

ঘাসে বসে চিঠি লিখছে দেহাতি লোক
ঘাসের উপর পা মেলেছে বোবা আলো
এদিক ওদিক ফড়িং নাচে চড়াই ওড়ে
খোলা পায়ের জুতো জোড়া ঘাসেই পড়ে।

চিঠির মধ্যে পড়ছে ঢুকে একটা-দুটো
কলের বাঁশি, গাড়ির আওয়াজ, ঘাসের কুটো
থেকে থেকে ঘাসের গোড়ায় পড়ছে এসে
মাথার ঘাম কি চিঠির থেকে শব্দ খসে।

কনুই ছুঁয়ে গঙ্গামাটি কলিকাতার
মুলুক যে তার সে-ও, আহা রে, গঙ্গাকিনার,
উবু হয়ে চিঠি লিখছে দেহাতি লোক
চিঠির উপর ঝুঁকে আছে বোবা আলো
(চিঠি?)

পরে এ কবিতা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। আস্তে আস্তে 'অনুষ্টুপ', 'কৃত্তিবাস', 'অমৃতলোক', 'সাহিত্য', 'চতুরঙ্গ' 'কবিসম্মেলন' সহ নানা বিশিষ্ট পত্রপত্রিকায় যখন কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল আর ভালোও লাগল কারো কারো, তখন চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে শেষমেশ বন্ধুদের উৎসাহে প্রথম বই প্রকাশ করবার প্রেরণা পেলাম।

এভাবেই একদিন সসংকোচে কবিতার দিকে এগোনো। প্রথম কবিতার বই 'ফেরা' প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। বইটির প্রচ্ছদ বিদ্যাপীঠে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রথিতযশা শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা। বিদ্যাপীঠের আশিস বিদ্যাপীঠ ছেড়ে আসার পরেও ছুঁয়ে আছে। সন্তান বড়ো হবার পরেও যেমন তাকে ঘিরে থাকে মাতৃস্নেহ। এরপর আরো তিনটি বই 'মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে" (২০১১), 'দেশের মাটি' (২০১৪) এবং 'কবিতা স্বয়মাগতা' (২০১৯) যথাক্রমে প্রকাশ পেয়েছে।

কবিতা তো আসলে জীবনযাপনেরই স্পন্দিত নির্যাস। মুলে তার কবিচিত্তের আকুতি। কথিত আছে, স্বাতী নক্ষত্রের জল বিরল মুহূর্তে শুক্তিতে পড়লে মুক্তোর জন্ম হয়। কবিতার জন্মকথাও তেমনই রহস্যচঞ্চল। সে আসে নিজে নিজেই।। প্রকাশিত হয় কবির সুমুখে। ঋষিকবিদের তাই দ্রষ্টা বলার রেওয়াজ। এসব ভাবনা থেকেই আমার সাম্প্রতিকতম কবিতা বইয়ের নাম রেখেছি 'কবিতা স্বয়মাগতা' (২০১৯)। এ বইয়ের একটি কবিতা দিয়েই এই অকিঞ্চিৎকর প্রতিবেদন শেষ করি? রবীন্দ্রনাথের বয়ানে ড্রামাটিক মনোলোগে লেখা কবিতাটিতে লেগে আছে বাংলা ভাগের বেদনা, রবীন্দ্রনাথের গান আর আমার গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে-চলা নদী শিলাবতী, যে নদীর নামোল্লেখ আমার নানা পর্বের বহু কবিতায় ওতপ্রোত: উবাচ

এখনো কারু কারু কানে কানে
আমার মন্ত্রণা দিয়ে থাকি
ব্যাকুল বকুলের বনতলে
কিছু কি রইবে না তার বাকি?

আমার চলা ছিল চলনবিল
পূর্ব বাংলার নদনদী
ভক্ত বাংলার ভুগোলে আজ
আমাকে খুঁজে নেবে শিলাবতী?

তোমাকে খুঁজে নেবে আমার গান
শ্রাবণবরিষণকল্লোলে
ভাঙা বুকের মাঝে গীতবিতান
পাঁজরে শুশ্রূষা এঁকে চলে।

লেখক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'অনুষ্টুপ', 'দ্য সানডে স্টেটসম্যান', 'কৃত্তিবাস' সহ নানা পত্রিকায়। চারটি কবিতার বই আছে।

বহ্নি - শিখা

চিন্ময় দাস (১৯৮৫)

"এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" - প্রথম প্রশ্ন মূলতঃ দার্শনিক; স্বভাবতই নানা মুনির নানা মত। সেই সমস্ত তত্ত্বের কচকচির মধ্যে না গিয়ে আমরা বরং দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে এ আলোচনার উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি - এ জীবন "লইয়া কি করিতে হয়?' বা কি করতে পারি? প্রাত্যহিক জীবনের হাজারো ব্যস্ততা, সাংসারিক টানাপোড়েন এসবের মধ্যে আদৌ কি কিছু করা সম্ভব? ভেবে দেখতে পারি আমাদের সাধের বিদ্যাপীঠ এ বিষয়ে কোন দিক্‌নির্দেশ করে কি-না।

অনেকের কাছেই আমাদের বিদ্যাপীঠের বহিরঙ্গ একটু আজব প্রতিপন্ন হয়। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শে পরিচালিত, সেই প্রতিষ্ঠানে একটু "ধম্মো ধম্মো" ভাব থাকবে সেটাই প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক অথচ বিদ্যাপীঠে পূর্ণাবয়ব মূর্তি পাঁচটি– শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও আছেন নিবেদিতা, ক্ষুদিরাম এবং সুভাষচন্দ্র, ফাঁসীর মঞ্চে দণ্ডায়মান ক্ষুদিরামের মূর্তি আবার দুটি। স্বাধীনতার পরে জন্ম নেওয়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বিপ্লবীদের এত মূর্তি কেন? রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রদের কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়? নতুন কোন সিডিশন কমিটির আহ্বান কি ধ্বনিত হচ্ছে? বিদ্যাপীঠ আসলে ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিত এই মহাপ্রাণদের spirit-কে ধরতে চায় এবং ছাত্রদের মধ্যে যাতে তার উন্মেষ ঘটে সে বিষয়ে বদ্ধপরিকর। ইন্ডিয়ান কালচার-এর ক্লাসে মহারাজকে মায়ের কথা উদ্ধৃত করতে শুনেছিলাম-শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) আমার যে ছেলে আমজাদ আমার সেই ছেলে। বিপ্লব বলতে যদি মানুষের মানসিকতার আমুল পরিবর্তন বোঝায়, এ তো সেই বিপ্লবের ভাষা। স্বামীজীর বিবিধ ভাষণেও নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখি। ভারতবর্ষের কথা উঠলেই তাঁর মুখ নাকি 'আরক্তিম হইয়া যাইত'- এমনটাই নিবেদিতার পর্যবেক্ষণ। নিদ্রিত ভারত জাগে বা এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ বক্তব্যগুলির মধ্যে একটা বহুধাবিভক্ত দেশের আত্মপ্রকাশের উদগ্র বাসনা ধ্বনিত হয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, স্বামীজীর এই বাসনা চরিতার্থ করার কাজে, দেশ বা জাতি গঠনের অভিপ্রায়ে তিনি যে দিক্‌নির্দেশ করে গেছেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনীরা তার কতটুকু যোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে বা পারতে চাইছে। আমাদের মনে রাখতে হবে বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা মূলতঃ পড়াশোনায় ভালো এবং এই পড়াশোনা কেন্দ্রিক আগ্রহকে সামনে রেখে তারা সফলতার সঙ্গে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। তাদের নাম, অর্থ, যশ হয়ত বেশীই, কিন্তু যেটার অভাব সেটা হল সময়। তাছাড়া প্রতিদিনকার জীবনযন্ত্রণা, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালনের পর কতটুকু অবসরই বা থাকে? দেশ বা জাতি গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা তাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে আমরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে, সততার সঙ্গে নিয়মিতভাবে করে যেতে পারি তার তুলনীয় কিছুই নয়, এবং এ বিষয়ে, বলাই বাহুল্য, বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবীদার। তবে আমাদের দাদারা বা ভাইয়েরা যে বিষয়ে অধিকতর সমীহ আদায় করতে পারে তা হল সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়া। তা সে আয়লাই হোক বা ফণী, আমফান বা ইয়াসই হোক। তার কারণ সাধারণ গরীব মানুষ এখানে বিপদগ্রস্ত। তারা কিছুটা হলেও স্বামীজীকে বোঝার চেষ্টা করেছে, যাঁর অমোঘ উক্তি– "আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিক ও নই, না, না-আমি সাধুও নই। আমি গরীব– গরীবদের আমি ভালোবাসি।" মিশনে শেখানো শিবজ্ঞানে জীবসেবা-র ভাবটি প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে। মনে রাখতে হবে

এ-কাজ শুধুমাত্র টাকা দিয়ে হয় না; দাদাদের যোগ্য নেতৃত্বে আমাদের ভাইয়েরা দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে, দুর্গত মানুষগুলোকে উদ্ধার করেছে। স্বামীজী নিশ্চয়ই প্রীত হয়েছেন, বিদ্যাপীঠের মহারাজ বা শিক্ষকরা গর্ব বোধ করছেন– একথা হলফ করে বলা যায়।

বিদ্যাপীঠ থেকে মনুষ্যত্বের পাঠ নেওয়া ছাত্ররা চায় বিদ্যাপীঠ যেন স্বমহিমায় চিরকাল বিরাজ করে কারণ তার ফল সুদুরপ্রসারী। স্বামী বিবেকানন্দকে ধারণ করে ছাত্ররা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে নতুন ভারতের জন্ম নেওয়ার পথ সুগম হবে। তাই বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীদের সম্ভবত সবথেকে বেশী বিচলিত করে বিদ্যাপীঠ সম্পর্কিত কোনো খারাপ খবর। কতখানি একাত্মবোধ থাকলে যে এটা হওয়া সম্ভব তা ঈশ্বরই জানেন। বাপ-মা ছেড়ে আসা একরত্তি ছেলেটার মননে বিদ্যাপীঠ জারিত হয়। তার জীবনের ভিত্তি ভজনঘর, সারদা মন্দির, বিবেক-মন্দির, খেলার মাঠ বা বিবিধ সদন। বিদ্যাপীঠের যে কোনো একটি ঘর চুঁইয়ে জল পড়লে সে মনে করে তার মাথায় জল পড়ছে; সে অস্থির হয়ে ওঠে। কোনো শিক্ষকের অসুস্থতার খবর পেলে সে বিচলিত বোধ করে, যেন অতি আপনজন অসুস্থ। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ফণীদা, কালীদাসদা বা পাঁচুদার ক্ষেত্রে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। এযাবৎকালে অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে বিদ্যাপীঠকে চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়েছে– আটের দশকে অবসরকারী কর্মীদের কর্মবিরতি, ২০০৭ সালে বিদ্যাপীঠের তিনটি ছেলের পুকুরে ডুবে অকালমৃত্যু এবং করোনাকালে সমস্ত কর্মীর মাসিক বেতন জোটানো সম্পর্কিত সমস্যা। বলাই বাহুল্য, বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীরা এই তিনটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশেষতঃ করোনাকালে বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষের ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে কর্মীদের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রাক্তনীদের আলোড়িত করেছে। কলকাতার প্লেগ নিবারণে অতি কষ্টে কেনা বেলুড়ের জমি বেচে দিতে চেয়েছিলেন স্বামীজী, এ যেন তারই অনুসরণ। প্রাক্তনীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে, সমগ্র করোনাকালে বিদ্যাপীঠে আর্থিক সমস্যা নিরসনে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রাক্তনীরা বিদ্যাপীঠের ফান্ডে জমা করেছে। আসলে বিদ্যাপীঠ সম্পর্কিত যে কোনো কাজে আসতে পারলে প্রাক্তনীরা নিজেদের ধন্য মনে করে। সারদা মন্দিরের সংস্কার বা শিবানন্দ সদনের ছেলেদের জন্য বাথরুমগুলোর আমূল পরিবর্তনের কাজে '৭২ সালের প্রাক্তনীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করে। বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত প্রায় আড়াই কিলোমিটার পিচের রাস্তা '৭৬ সালের কোন প্রাক্তনীর প্রচেষ্টার ফল। '৮১ -র কোনো প্রাক্তনীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যাপীঠ একটি নতুন বাস পেয়েছে। কোন প্রাক্তনী আবার অতি সাম্প্রতিককালে বিদ্যাপীঠকে একটি নতুন স্করপিও গাড়ি পেতে সাহায্য করেছে। বিদ্যাপীঠের অবসরকারী গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের জন্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছে '৮৫ র প্রাক্তনীরা। '৮৬ র কোনো প্রাক্তনীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যাপীঠের ডেয়ারীর আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। আবার বিদ্যাপীঠের কম্পিউটার ল্যাব -এর ব্যবস্থা করেছে '৮৭ র প্রাক্তনীরা। বিদ্যাপীঠের প্রধান মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়েছে '৮৮ র প্রাক্তনীদের সম্মিলিত উদ্যোগে। '৯০ -সালের প্রাক্তনীরা বিদ্যাপীঠ পরিচালিত charitable dispensary-টিকে নতুন রূপ দিতে সমর্থ হয়েছে। প্রতিটি সদনে আবাসিকদের জন্য পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে '৯২ -এর প্রাক্তনীরা। আবার সেন্ট্রাল লাইব্রেরীকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে '৯৩ -এর মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা। '৯৪ -এর প্রাক্তনীরা জিমনাসিয়াম সংস্কার ও শ্রেণীকক্ষগুলিকে smart class-এ পরিণত করেছে। তারা অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় যাদুগোড়ায় আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্মিত বিদ্যালয়ের আমূল সংস্কারেও হাত লাগিয়েছে। ২০০১ সালের প্রাক্তনীরা বিদ্যাপীঠের বেশ কিছু সদনের ছাদ সংস্কার করেছে। বিদ্যাপীঠের চৌহদ্দির বাইরেও পুরুলিয়া জেলায় প্রাক্তনীদের কর্মকান্ড দৃশ্যমান। '৮৩-এর প্রাক্তনীরা অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় যাদুগোড়ায় আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য charitable dispensary চালায়। পুরুলিয়ার গাঁ-গঞ্জে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের সুষম আহার, জামাকাপড়, শীতবস্ত্র ব্যবস্থা করে থাকে '৮৫-এর প্রাক্তনীরা। পিয়ারলেসের

সহযোগীতায় পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় বিদ্যাপীঠের বিপরিতে গড়ে উঠেছে মেয়েদের স্কুল ও কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে বিদ্যাপীঠের '৮০, '৯৮ ও '৯৬-র প্রাক্তনীরা।

এ-তো গেল সম্মিলিত প্রয়াসের ফল সমূহ। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেক প্রাক্তনী স্বকীয় চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে; বলাই বাহুল্য সবই স্বামীজীর দেশগঠনে অতি সামান্য ভূমিকা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা। কলকাতার গোলপার্কে পথশিশুদেরও নিয়ে স্কুল চালনার স্পর্ধা দেখায়, '৮০-এর প্রাক্তনী শ্রী সঞ্জয় ফৌজদার। '৮৫ সালের প্রাক্তনী শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায় সেই স্পর্ধারই আর এক জ্বলন্ত উদাহরণ। বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো পরিচ্ছন্ন,-পরিপাটি জীবন তাকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। দেশে যে কোনো সমস্যা নিরসনে 'স্বামীজীর শিক্ষা'-কেই হাতিয়ার করতে চেয়েছেন, বিদ্যাপীঠে পড়া ছাত্র সেই লক্ষ্যে শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টায় 'বিদ্যাপীঠ' নামে এক সংস্থাই খুলে বসেছে যা নিরলসভাবে সতের বছর ধরে মূলত পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে বা করতে সচেষ্ট। '৮৬ সালের প্রাক্তনী দেবব্রত ব্যানার্জী আর এক উজ্বল উদাহরণ, স্বামীজীর ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম মৌতোড় পানির (দেবব্রতর বিদ্যাপীঠের নাম) কাছে আসেনি, পানিই তাদের কাছে ছুটে গেছে– স্বামীজী তো এমনটাই বলেছিলেন। সবার পক্ষে সেকথা প্রত্যক্ষভাবে শোনা এবং তদনুরূপ কার্য করা সম্ভব হয়নি; পানি পেরেছে, সে বিদ্যাপীঠ রত্ন; সে দেখিয়ে দিয়েছে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা সার্থক। মৌতোড়-এর মত একটা পিছিয়ে পড়া গ্রামে মাছ চাষ, জৈব সার তৈরী প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে। স্বামীজীর নতুন ভারত বেরোনোর যেন সুতিকাগার সেই গ্রাম। একেই বোধহয় বলে কর্মে পরিণত বেদান্ত। '৮৮-র প্রাক্তনী অকালে প্রয়াত সঞ্জয় মাহাতো প্রচেষ্টায় পুরুলিয়ায় ডাবর গ্রামে গড়ে উঠেছে প্রভাতালয় ফাউন্ডেশান; স্থাপিত হয়েছে অনাথ আশ্রম। এছাড়াও কুষ্ঠাশ্রমের রোগীদের নিয়মিত সেবা শুশ্রুষা করে নতুন জীবনের সন্ধান দেওয়া হয়। এখন তার কর্ণধার তারই ব্যাচের কোন প্রাক্তনী।

আমাদের মনে রাখতে হবে 'বিদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনকে ১১ জন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী উপহার দিয়েছে। এরা বাবা-মা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, মোটা মাইনের চাকরি সব ছেড়েছে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর উচ্চ আদর্শকে বুকে নিয়ে। '৮৩-র মাধ্যমিক উত্তীর্ণ অমিত মহারাজ Online system-কে হাতিয়ার করে telemedicine consultation-এর ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনী বিভিন্ন বর্ষের ডাক্তাররা এই মহতী প্রচেষ্টায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে এবং এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী বর্তমানে এর সুফল পাচ্ছে। অপর একজন সন্ন্যাসীর বিবিধ কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। '৮৫ ব্যাচের সঞ্জীব মহারাজের কথা বলছি। বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত পলিটেকনিক কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে সে কলেজটিকে 'মানুষ' তৈরির কারখানায় পরিণত করেছে। রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রের রক্তদান থেকে শুরু করে আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সেবা-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া– সব কিছুর প্রেরণা সঞ্জীব মহারাজ, যে একটু একটু করে তাঁর ছাত্রদের মনে স্বামীজী-কে প্রবেশ করায়। বিদ্যাপীঠের এক শিখা আজ হাজারো আলোক বর্তিকায় পরিণত হচ্ছে। বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীদের এরকম আরও অনেক কর্মকান্ড দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। তথ্যের অপ্রতুলতা ও স্থানাভাবে সবটুকু সংকলিত করা হয়ে উঠল না।

বিদ্যাপীঠের আর এক প্রাক্তনীর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে এই নিবন্ধ শেষ করব। '৮৫ ব্যাচের এক প্রাক্তনী গ্রামের অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। এই ছেলে-মেয়েরা দুই ধরনের। একদল খুবই মেধাবী, অন্যরা ততটা মেধাবী হয়তো নয়, তবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য জান লড়াতে প্রস্তুত। বর্তমান ভারতে উচ্চশিক্ষিত মানুষজনের পাশাপাশি trained বা skilled worker-এর ভীষণই দরকার। তাই

উভয় শ্রেণীকেই কলকাতায় বা নিকটবর্তী বড় শহরে আনা হয়। মেধাবীদের নামী-দামী কলেজে ভর্তি করা হয়, থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া মেয়েদের সরকারী নার্সিং কলেজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হয়। বাকিদের Polytechnique, ITI, MSME-এর বিবিধ কোর্সে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাদের বাড়ির যা আর্থিক অবস্থা তাতে মেসে থেকে বই পত্র কিনে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এককথায় দুঃসাধ্য। বেশী নম্বর পাওয়া ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কিছু সরকারী বেসরকারী স্কলারশিপ পাওয়ানোর ব্যবস্থা হয় বটে তবে তা নিতান্তই অপ্রতুল। এই প্রতিকুলতাকে জয় করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার নাম Each one take one। ভাবনাটা অনেকটা এইরকম– যদি এক একজন সম্পন্ন ব্যক্তি এক একটি অভাবী ছাত্র বা ছাত্রীর কিছুটা দায়িত্ব নেন তবে নিশ্চিতভাবেই অদূর ভবিষ্যতে দেশটার রূপ পাল্টে দেওয়া সম্ভব। গত পনের বছর ধরে এই কাজটি করার চেষ্টা হচ্ছে, কাজের পদ্ধতিটাও নিতান্তই সাদামাঠা। প্রথমে এইসমস্ত পড়ুয়াদের পারিবারিক অবস্থা যাচাই করে তাদের ঠিকানা, ফোন নম্বর, স্কুলের নামসহ প্রাপ্ত নম্বর, বর্তমান কলেজের নাম, কোর্স এবং পারিবারিক অবস্থা বিশদে জানিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তারপর 'আমার ভান্ডার আছে ভরে, তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে'- এই মানসিকতাকে সম্বল করে ভিক্ষার ঝুলি বাড়িয়ে দেওয়া হয় পরিচিত অপরিচিত জনের কাছে। যারা donor হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন তারা সেই তালিকা থেকে উদ্দিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সন্তুষ্ট হলে নিজে থেকে তার bank details চেয়ে নেন এবং সরাসরি প্রতি মাসে সেই account-এ টাকা পাঠিয়ে দেন। শুধু টাকা পাঠিয়েই donor নিজেকে সীমায়িত রাখেন না, সারা বছর সেই ছাত্র বা ছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন, সেই পড়ুয়াও বড় শহরে এসে নিজেকে একা ভাবে না, মনে সাহস পায়। উভয়ের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর পরিণতিতে কি হয়?– এই প্রশ্নের উত্তরে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব, – ঘাটালের একটি পরিবার; মদ্যপ বাবা প্রতিদিন বাড়ি ফিরে মেয়েকে আর লোকের বাড়ি সারাদিন কাজ করে আসা পরিশ্রান্ত স্ত্রীকে ধরে মারধর করেন। সেই মেয়ে শুধুমাত্র মনের জোরে কোনোদিনও না দেখা বিদ্যাপীঠের কোন প্রাক্তনীর আশ্বাসে নার্সিং কোর্সে ভর্তি হয়, তার donorও জোগাড় হয়। চার বছর পড়ে সে যখন চাকরী পেয়ে তার donor-কে ফোন করে জানায় তখন দুজনেরই যুদ্ধ জয়ের আনন্দ, উভয়ের কান্নার ধ্বনি, চোখের জলে স্বামীজী মূর্ত হয়ে ওঠে– এভাবে পারা যায়, আর বিদ্যাপীঠের সেই প্রাক্তনী বুঝতে পারে সুভাষ মহারাজের বিদ্যাপীঠের ক্লাসের স্বামীজীকে উদ্ধত করে বলা কথাটা – 'পরের জন্যে এতটুকু ভাবলে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়'-এর তাৎপর্য। এরকম উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে বেড়ে ওঠা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব রয়েছে। দরিদ্র পরিবারের ছেলে আজ Weizmann University-তে PhD করছে Physics-এ, কোন ছাত্র নেদারল্যান্ডসের Leiden University-তে Mathematics-এ PhD শেষ করার পথে; ক্ষেতমজুরের মেয়ে Bethune College থেকে Chemistry Hons.-এ প্রথম হয়ে সম্প্রতি Cultivation of Sciences থেকে M. Sc-তে প্রথম। এক বছর বয়সে বাবাকে হারানো মেয়ে State University থেকে প্রথম হয়ে বর্তমানে Passport Office-এ কর্মরত; যে ছেলেটির বাবা মাছ ধরত সেই মা মরা ছেলে আজ Geological Survey of India-য় প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাপীঠেরই কোন প্রাক্তনীর আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতায় C.U.-তে Accountancy Hons.-এ প্রথম হওয়া ক্ষেতমজুরের ছেলে আজ C.A. করছে; পুরুলিয়ার ছেলে শচীন পরামানিক তিরুবনন্তপুরম IISER-এ অঙ্কে M.Sc. পাঠরত বিদ্যাপীঠেরই কোন প্রাক্তনীর ঐকান্তিক প্রয়াসে। ফিরিস্তি না বাড়িয়েও অন্য একটি কথা বলা যায়– এরা শুধু নিজেরাই দাঁড়ায়নি গ্রামের নীচের ক্লাসে পড়া অন্য পড়ুয়াদের অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষের জেদও সংক্রামিত হয়। যে গ্রামের ছেলে বিদেশে PhD করছে সেই গ্রামেই বাপ মরা ছেলে কোন donor-এর সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে বা পরবর্তী সময়ে ভ্যান রিক্সা চালিয়ে পরিবার প্রতিপালন

করে এমন বাবার ছেলে বর্তমানে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে চলেছে। ভেবে দেখতে অনুরোধ করব, কেমন লাগবে যদি মাসে মাসে সামান্য কয়েক হাজার টাকা খরচ করে, একটু সাহস যুগিয়ে বোঙ্গাবাড়ি গ্রামের কোন মধ্য বা নিম্ন মেধার ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে এসে MSME তে Skilled Worker-এর পাঠ দেওয়া যায়। তার ওপর সে যদি এমন পরিবারের সন্তান হয় যে পরিবারের কেউ সাত বছর ধরে বিদ্যাপীঠের ডাইনিং হলে আমাদের খাবারের বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বা গেটে কর্মরত ছিলেন বা ডেয়ারী সামলেছেন। এর থেকে বড় স্বামীজীর কাজ আর কি-বা হতে পারে!

এ লেখার উদ্দেশ্য বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীদের মাহাত্ম্য প্রচার করা নয়, বরং নবীন প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা কোনো স্কুলে পড়ে না; তারা 'স্বামী হিরন্ময়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত একটা Institution-এর সঙ্গে যুক্ত, যা একটা নির্দিষ্ট আদর্শে পরিচালিত হয়। তারা একটা Legacy বহন করে। স্বামীজী আমাদের সামনে একটা আদর্শ রেখেছেন-Be & Make, বিদ্যাপীঠে আমাদের তৈরী হতে হবে শারীরিক ও মানসিকভাবে পরবর্তীকালে সাধ্যমত নতুন ভারত-এর সন্ধানে ফিরতে হবে, যা পুরনো ঐতিহ্যকে ম্লান করে উচ্চতর সোপানে দেশটাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। স্বামীজীর কথায়– "ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে- ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনোই সন্তুষ্ট হইতে পারি না।" বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা এই জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে– এই আমাদের বিশ্বাস। "মা,- যা হইবেন? তার দায়িত্ব নিতে বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীরা প্রস্তুত এবং "আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি– এই লক্ষ্যে তারা অবিচল ছিল, আছে এবং থাকবে। ওয়াহ্ গুরু কী ফতে!

লেখক সহশিক্ষক, পাহাড়হাটি গোলাপমণি উচ্চ বিদ্যালয়, মেমারি

রামনাম

দেবাশিস ঘোষ (১৯৮৫)

ছুটির দিন। কাব্যচর্চার পক্ষে উপযুক্ত দিন। তাই মর্নিং ওয়াক সেরে ফেরার পথে পার্কের বেঞ্চিতে বসে ফোনে কবিতা লিখছিলাম। পার্কের পরিবেশটি কবিতা লেখার পক্ষে আদর্শ। লেখা যখন মিনিট পনেরো হয়েছে তখন বিপ-বিপ শব্দ ফোনে। দেখলাম ফোন এসেছে। স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করে নাম ফুটে উঠলো। কল্লোলের ফোন। আমার পুরুলিয়া বিদ্যালয়ের সহপাঠী কল্লোল। সেই ফোন না ধরে লেখা বজায় রাখলাম। মিনিট পনের পরে আবার বিপ-বিপ। আবার কল্লোল। বিরক্ত হলাম। আবার ফোন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম কাব্যসৃষ্টি। লেখা নির্বিঘ্নেই এগিয়ে চলল আরো মিনিট কুড়ি। আবার বিপ-বিপ। আবার কল্লোল। এইবার যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হলাম। বিদ্যালয়ের সহপাঠী হয়েও এত নির্মম ভাবে সে আমার ফুরফুরে মনে এমন অসময়ে বিঘ্ন ঘটাতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কবিতা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যচর্চার যবনিকাপাত ঘটালাম।

কল্লোলকে কল ব্যাক করে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বললাম, বল কী হয়েছে? কিসের এত তাড়া যে আমাকে অসময়ে মুহুর্মুহু ফোন করে যাচ্ছিস! কল্লোল দশবার সরি বলে মার্জনা চেয়ে বলল, অমিত করের শ্বশুরের সল্টলেকের ফ্ল্যাটটা বিক্রি করার কাজটা পেয়েছি। তোকে একটা সই করতে হবে। ওর শ্বশুরের একটা রিলেসনশিপ সার্টিফিকেট দরকার। আমি সার্টিফিকেট লিখে রেডি করে রেখেছি। তুই খালি একটা সই করে দিবি। রিলেসনশিপ সার্টিফিকেটটা একমাত্র সচিব স্তরের সরকারি অফিসাররাই দিতে পারে। তুই তো উপসচিব না যুগ্মসচিব। তাই তোকে ফোন করছি বারবার। প্রসঙ্গত বলি অমিতও আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তারি করে। আর কল্লোল কলকাতার আইনজীবি। কল্লোলকে বললাম, তুই অসময়ে কল করে আমার কাব্যচর্চায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিস। এইবার এমন প্রস্তাব দিলি যে আমার স্বধর্ম পালনে ব্যাঘাত ঘটাতে হবে। আমি যে কী করি তাই ভাবছি। সইএর ভার আর সইতে পারি না। দাঁড়া, একটা সই–এর গল্প বলি, শোন।

থার্ড ইয়ারের শেষে সবাই ইউনিভার্সিটির ফর্ম ফিল-আপ করতে লাগলো। আমিও ফর্ম ফিল-আপ করতে গেলাম। কিন্তু কলেজের বড়বাবু বললেন যে আমি ফর্ম ফিল-আপ করতে পারবো না। কারণ আমার লাইব্রেরি ক্লিয়ারেন্স নেই। আমি অবাক হয়ে গেলাম সেই কথা শুনে। কলেজ শুরুর দু-একদিন বাদে কোনোদিন আমি রাণীগঞ্জ কলেজের লাইব্রেরির চৌকাঠ পেরোইনি। বই নেওয়া তো দূরের কথা লাইব্রেরি কার্ড পর্যন্ত বানাইনি। বড়বাবুকে বললাম, স্যর, কোথাও একটা বড় ভুল হচ্ছে। বই বইতে আমার আজন্ম অনীহা। খামোখা কেন কলেজের বই বয়ে বয়ে দুর্গাপুরে আমার বাড়ি নিয়ে যাব? উনিও বললেন যে তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস আমি বই নিইনি। লাইব্রেরির পাশেই কলেজ-অফিস। তিনিও তিন বছরে কোনদিন আমাকে লাইব্রেরিতে ঢুকতে-বেরতে দেখেননি। বললেন, লাইব্রেরিয়ানের কাছে গিয়ে বলতে যে কোথাও ভুল হচ্ছে তাঁদের।

লাইব্রেরিয়ানের কাছে গেলাম। বললাম, স্যর, আমার লাইব্রেরি ক্লিয়ারেন্স হয়নি বলে জেনারেল অফিস আমাকে বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ফর্ম ফিল-আপ করতে দিচ্ছে না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এইটা শুনে। আমি, স্যর, লাইব্রেরির বই নেওয়া দূরের কথা এই তিন বছরে একদিনের বেশি লাইব্রেরিতে ঢুকিনি। উনিও আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, সত্যি তো, তোমার মুখ আগে কোনোদিন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। যারা বই নেয় তাদের নাম মনে রাখতে না পারলেও তাদের মুখ আমার মনে গেঁথে যায়। বোধহয় তাড়াহুড়োয় ভুলবশত এইটা হয়েছে। বললেন, এক্ষুণি তোমার ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিচ্ছি। শুধু একবার রেকর্ডটা চেক করে নিচ্ছি। উনি রেকর্ড

চেক করতে লাগলেন। আমি মনে মনে তাঁকে কুকথা বলতে লাগলাম। এঁদের মত লোকের জন্য কত মেধাবী ছাত্রকে কত গঞ্জনা সহ্য করতে হয়।

লাইব্রেরিয়ান রেকর্ড চেক করে বললেন, সত্যিই তুমি লাইব্রেরি থেকে কোনো বই এই তিন বছরে নাওনি। আমি বিজয়গর্বে মৃদু হাসলাম। আর বললাম, স্যর, ভুল হতেই পারে আপনাদের। আপনারাও মানুষ। আপনাদের কত কাজের চাপ। তবে আমি যে সত্যি বলছিলাম সেটা তো বুঝতে পারলেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আমি। মিথ্যা কথা বলি না। লাইব্রেরিয়ান বললেন আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম তুমি বই নাওনি, তুমি মিথ্যা বলো না। বই-পড়া ছেলেদের আমি দেখলেই চিনতে পারি। ৩০ বছর এইখানে লাইব্রেরিয়ানগিরি করছি। কে বই পড়ে আর কে পড়ে না তা আমাকে বলতে হয় না। আমি বললাম, স্যর, তাহলে তাড়াতাড়ি ক্লিয়ারেন্সটা দিয়ে দিন। তাড়াতাড়ি গিয়ে আজকেই ফর্ম ফিল-আপ করে দিই এবং অকারণে হঠাৎ প্রাপ্ত এই টেন্সন থেকে মুক্ত হই।

লাইব্রেরিয়ান বললেন, আচ্ছা, তুমি মটুকধারী রামকে চেনো। বললাম, স্যর, ভগবান শ্রীরাম আর জগজীবন রাম ছাড়া আমি আর কোনো রামকে চিনি না। (একটু অনৃতভাষণ হয়েছিল, বন্ধুদের সঙ্গে সুজয়ের ফাঁকা বাড়িতে বসে আর এক রামের সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল। সেই তথ্যটা বেমালুম চেপে গেলাম।) এই কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, মটুকধারী রামকে তুমি চেনো না? বললাম, না, স্যর, আমি এইরকম কারোকে চিনি না। এমনকি এইরকম নামও জীবনে প্রথম শুনলাম। উনি রেকর্ড থেকে একটা লাইব্রেরি কার্ড বের করলেন। সেই কার্ডের বাঁদিকের উপরে একটা সাদাকালো পাসপোর্ট ছবি। মেয়ে নয়, ছেলেরই। কার্ডটা আমার সামনে ধরে বললেন, একে চেনো? ভাল করে পাসপোর্ট ছবিটা দেখলাম। গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। ব্যাকব্রাশ করা চুল। এই মুখ ইতোপূর্বে যে আমি দেখিনি সেই বিষয়ে আমি ঘোরতর নিশ্চিত। বললাম, স্যর, একে চেনা দূরের কথা একে আমি দেখিনি কোনোদিন। উনি বললেন, আচ্ছা নিচের এই সইটা কার? দেখলাম কার্ডের নিচে একটা উজ্বল সই জ্বলজ্বল করছে। নিচে থেকে ক্রমে ৩০ডিগ্রি কোণ করে বাংলায় লেখা সাক্ষরটি উপরে উঠে গেছে। বললাম, স্যর, ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার; এই সই তো আমার। এমন সই নকল করা শিবের অসাধ্য। উনি বললেন, তোমার সই কোথায় আছে দেখেছো? ভাল করে দেখো। দেখলাম আমার সাক্ষরটি আছে গ্যারেন্টারের ঘরে। উনি বললেন মটুকধারী একটা বই নিয়ে গেছে ইকনমিক্সের। দাম ২০০ টাকা। বহুবার তাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বই ফেরৎ দেয়নি। সেই বই ফেরৎ না পেলে তোমার ক্লিয়ারেন্স দেওয়া যাবে না। তুমি গ্যারেন্টার। হয় তুমি ওই বইটা এনে দাও নাহয় তুমি ২০০ টাকা দাও। আমি হতভম্ব। বললাম স্যার আমাকে না আটকে আপনি মটুকের ক্লিয়ারেন্স আটকান। উনি বললেন মটুক ফার্স্ট ইয়ারের পরেই কলেজ আসা ছেড়ে দিয়েছে। সে ক্লিয়ারেন্সের পরোয়া করে না।

গভীর দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। এই অচেনা রামের জন্য অসময়ে আমার পড়াশোনার যবনিকাপাত ঘটে যাবে ভেবে বিহ্বল হয়ে গেলাম। সইটা আমার এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার এই সই কেউ জাল করতে পারবে না সেই বিষয়েও আমি নিশ্চিত। বহু গবেষণা করে আমি আমার এই সইটি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু এই সইটা আমি করলাম কবে তাই ভাবতে লাগলাম। কিছুতেই মাথায় আসছে না যে কবে একটা দাড়িওয়ালা ছেলে এসে তার লাইব্রেরি কার্ডে আমাকে গ্যারেন্টার করে চলে গেল। বিষন্ন মনে সেইদিন বাড়ি ফিরে গেলাম। বাড়ি গিয়ে সারাক্ষণ ভাবতে লাগলাম কবে আমি এই অভাবনীয় সইটি করে ফেললাম। তিন বছরের প্রতিটা ঘটনা ডে-বাই-ডে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল কলেজের দ্বিতীয় দিনে চন্দ্রানীর সঙ্গে কলেজ লাইব্রেরি যাই এবং সামনে একটা ম্যাগাজিন খুলে দুজনে নিচুস্বরে ভাববিনিময় করছিলাম। সেই মত সময়ে একজন আমার কাঁধের উপর থেকে একটি হাত বাড়িয়ে বলে, তুমি একটা সই করে দেবে এইখানে। দেখলাম হাতে তার লাইব্রেরির মেম্বার হবার কার্ড। মোক্ষম সময়ে নব-আবিষ্কৃত সই প্রয়োগের সুবর্ণসুযোগ পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। পিছন দিকে না তাকিয়ে, ছেলেটিকে

না দেখে আমি খশখশ করে সই করে দিলাম। আর আড় চোখে দেখে নিলাম চন্দ্রাণী সেই সইটা দেখছে কিনা। প্রথম দিনেই সই দিয়ে কোনো মেয়েকে ইমপ্রেস করার মত যুৎসই জিনিস আর কীই বা হতে পারে।

ঘটনা মনে পড়ল। কিন্তু এই ঘোরতর বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কী? অচেনা অজানা একটা ছেলের গ্যারেনটার হয়ে তার ঝেঁপে দেওয়া ২০০টাকার বইএর গুনাগার আমার বাবাকে দিতে হবে এই কথা বাবাকে বললে একটা মারও মাটিতে পড়বে না। অগত্যা ঠিক করলাম ঠিকানা জোগাড় করে মটুকধারী রামের বাড়ি যাব। তাকে গিয়ে বলব নির্দোষ আমাকে কী পরিমাণ লাঞ্ছনার শিকার হতে হচ্ছে তার কারণে। এবং সে যেন বইটা ফেরৎ দেয়। তাতে আমার পড়াশোনার জীবন সাডেন-ডেথ হওয়া থেকে বাঁচবে। মটুকের ঠিকানা জানতে আবার গেলাম রানীগঞ্জের ত্রিবেণীদেবী ভালোতিয়া কলেজের লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরি কার্ডে মটুকের ঠিকানা পড়া দুঃসাধ্য কাজ। এমন তার হাতের লেখা যে কী লিখেছে বুঝতে পারা কম্পাউন্ডারের পক্ষেও দুঃসাধ্য। দু'চারজনকে দেখানোর পরে একজন বলল ছেলেটির বাড়ি ময়রা কোলিয়ারি। অন্ডাল মোর থেকে উখরার দিকে কিছুটা গেলে ময়রা কোলিয়ারি।

পরের দিন চলে গেলাম ময়রা কোলিয়ারি। বাস থেকে নেমে আমার সমবয়সী কয়েকজনকে আড্ডা মারতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম তারা মটুকধারী রামকে চেনে কিনা। তারা সবাই আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর মটুককে খোঁজার কারণ জানতে চাইল। বললাম সেই আধিভৌতিক কারণ। তারপর একজন বলল, মটুককে তো পাবেন না। মটুক তো মাটির তলায়। শুনে আমি মর্মাহত। ব্যাটা আমাকে গ্যারেন্টার বানিয়ে কলেজের বই ঝেঁপে দিয়ে এই বয়সে মরেও গেল! কপাল আর কাকে বলে? আমাকে হতবাক হতে দেখে একজন বলল, পরশু আসুন। আমি আরও অবাক হলাম। পরশু মটুক কবর থেকে উঠে আসবে নাকি বহটা দিতে! ছেলেটি বলল, মটুক কয়লা খাদানে গেছে। বিকেলে বেরবে। আমরা সন্ধ্যেবেলায় মটুককে আপনার আসার কথা বলব। পরশু মটুকের ছুটি। পরশু এলে মটুকের সঙ্গে আপনার দেখা এবং কথা হয়ে যাবে। অগত্যা সেদিন ফিরে এলাম ময়রা কোলিয়ারি থেকে। মটুক মরেনি সেই সুসংবাদে মনে বল ভরসা পেলাম।

পরশু আবার গেলাম ময়রা কোলিয়ারি। বাস থেকে নেমে দেখতে পেলাম মটুকের কয়েকটা বন্ধুকে। গিয়ে বললাম মটুককে তারা বলেছিল কিনা আমার কথা। তারা বলল, মটুকের বাড়ি যান। মটুক বাড়িতে আছে। তারাই দেখিয়ে দিল কুলিলাইনের রাস্তা যেখানে মটুকের বাড়ি। গেলাম সেই বস্তিতে। কোন বাড়িটা মটুকের বুঝতে না পেরে বস্তির মাঝামাঝি গিয়ে ম্যাটুক, ম্যাটুক, তুম কিধার হো বলে চিৎকার করতে লাগলাম। এতে মটুক নয়, টুক করে এক পৃথুলা মহিলা বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে বিজাতীয় ভাষায় চেচিয়ে কিছু বলতে লাগলেন। মারমুখি সেই মহিলাকে দেখে আমি বস্তি পরিত্যাগ করলাম। ভাবলাম যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। এবং দ্রুত হেঁটে আবার বাসস্ট্যান্ডে ফিরে এলাম। বাসস্ট্যান্ডে দেখি মটুকের সেই বন্ধু দাঁড়িয়ে। পাশে দাড়িওয়ালা একটি ছেলে। পাসপোর্ট ছবির ছেলেটার মত অবিকল তার মুখ। সেই দাবিওয়ালা আমাকে বলল, আপনি দেবাশিস ঘোষ। বললাম, হ্যাঁ। শোনা মাত্রই বাসস্ট্যাণ্ডের পাশের চায়ের দোকানে আমাকে বসিয়ে নিমেষে অর্ডার দিল দোকানিকে। বাবুদা,একটা ডাবল ডিমের ওমলেট আর স্পেশাল চা এই দাদাকে দাও। তারপর বলল, আমি মটুক। জানি আপনি বই নিতে এসেছেন। বইটা আমার কাছে আছে। আপনি বসুন আমি বইটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি। কলেজ আমাকে অনেকবার চিঠি করেছিল। কিন্তু কাজের চাপে কলেজ যাওয়া হয়নি। আজ আপনি এসেছেন বই নিতে। আমি বই দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে মটুক বাড়ি চলে গেল।

ডাবল ডিমের ওমলেট বানান হল। আমার খাওয়া হল। স্পেশাল চা-ও খাওয়াও শেষ। মটুক আর ফিরে এল না। বুঝলাম আবার ঠকেছি। ২০০ টাকার বই আমাকে কিনে তো দিতেই হবে তার সঙ্গে এই ডাবল ডিমের ওমলেট আর স্পেশাল চায়ের দামও আমাকে দিতে হবে। একটি সইএর কারণে আমাকে কত কী যে সইতে হবে তা কে

জানে। চরম হতাশায় নিমগ্ন হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম। বাবুদাকে ওমলেট আর চায়ের দাম কত জানতে চাইলাম। ঠিক সেই সময় দেখলাম দূর থেকে মটুক আসছে। কাছে আসতে দেখলাম তার হাতে খবরের কাগজে মোড়া বই গোছের একটা জিনিস। তারপর একেবারে সামনে এসে বলল, সরি, বইটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই দেরি হল। এই নিন বই। দেখলাম ত্রিবেণীদেবী ভালোতিয়া কলেজ লাইব্রেরির স্ট্যাম্প মারা সেই ইকোনমিক্সের বই। মটুক বলল, আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেই বাবা মারা যাওয়াতে কোলিয়ারির এই চাকরিটা পেয়ে যাই। তাই আর কলেজে পড়া হল না। আপনি পড়াশোনা করছেন। পড়াশোনা চালিয়ে যান। জীবনে সাফল্য পাবেন। আমার শুভেচ্ছা রইল আপনার সঙ্গে। আর আমার জন্য আপনাকে এত সমস্যায় পড়তে হয়েছে জেনে আমি গভীর ভাবে দুঃখিত।

আজ যে কলকাতায় বসে করে কম্মে খাচ্ছি তা পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের কারণে শুধু নয়। ওই মুকুটধারী, সরি, মটুকধারী রামের শুভেচ্ছার জন্যও। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

কী জানি কী বুঝলো কল্লোল, বললো, তাহলে ফোন রাখি। আমি বললাম, না, সই নিয়ে যা।

লেখক পশ্চিম বঙ্গ বিধি কৃত্যক আধিকারিক। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের যুগ্ম সচিব পদে আসীন।
পশ্চিম বঙ্গ বিধি কৃত্যক (West Bengal Legal Service)

‘পানিপথ’-এর চতুর্থ যুদ্ধ

অগ্নিমিত্র বিশ্বাস (১৯৮৬)

১৯৭৯ সালে একটি ছেলে বিদ্যাপীঠে ক্লাস ফোরে ই-সেকশনে ভর্তি হলো। তার ক্লাসে যেহেতু একই নামের একাধিক ছাত্র ছিল, বন্ধুরা তার নতুন নামকরণ করল একটি ঐতিহাসিক জায়গার নাম অনুসারে, সে যেখান থেকে বিদ্যাপীঠে পড়তে এসেছিল। দুরন্ত ছেলের প্রথমে বিদ্যাপীঠ পছন্দ হয়নি। সেখানকার কড়া নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর জন্য মাঝে মাঝেই সে ওয়ার্ডেনদের বিরাগভাজন হতো। ক্লাস ৫এ উঠে সে এমন একটি গুরুতর অপরাধ করে ফেলে যাতে বিদ্যাপীঠ থেকে তার বহিষ্কার প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মহারাজদের অসীম অনুগ্রহে তাকে আবার সুযোগ দেওয়া হল। জীবনে চলার পথে বারবার এরকম কিনারা থেকে ফিরে আসা বোধহয় ছেলেটির মজ্জাগত। বিদ্যাপীঠের অনুশাসনের ভারে, আর ‘‘দুষ্টু ছেলে’ তকমা পাওয়ায় মাঝে মাঝেই জুটতো তিরস্কার এবং দৈহিক শাসন। ছেলেটার মন তাই খারাপ হয়েই থাকতো, কিন্তু বন্ধুরা সেটা টের পায়নি কখনো।

কিন্তু সবাই তো সমান নয়। ক্লাস ৮এ ওয়ার্ডেন হয়ে এলেন স্বপনদা, আর কালীপদ মহারাজের স্নেহচ্ছায়া তো ছিলই। তাঁদের অকুণ্ঠ ভালোবাসার পরশ পেয়ে ছেলেটির মনে সাহস আর আত্মবিশ্বাস, এই দুয়েরই স্ফুরণ ঘটল। তাঁরা বোঝালেন, সবার মধ্যেই নেগেটিভ এবং পজিটিভ দিক আছে। Focus on the positives। সেই শিক্ষা ছেলেটি জীবনে চলার পথে পাথেয় করে রাখলো। ছেলেটি স্পোর্টসপার্সন ছিল, খেলা ছিল তার কাছে নেশার মতন। হেন স্পোর্টস নেই যাতে সে নামেনি, ফুটবল থেকে ক্যারম, সবেতেই তার অগাধ বিচরণ বিদ্যাপীঠ ছাড়ার পর ক্লাস টুয়েল্ভেই সে একটি PSU থেকে ডাক পায়, ফুটবল টীম-এ। ছেলেটির স্বপ্ন তখন ভারতের হয়ে ফুটবল খেলবে, সে হবে এক ন্যাশনাল স্টার। কিন্তু বিধি বাম। পরিবার তার সঙ্গে সহযোগিতা করল না। তার আর ফুটবলার হয়ে ওঠা হলো না। ছেলেটি ভেঙে পড়লো। পরিবারে তার মন টিকলো না। বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরলো দেশে দেশে। ঘরের বদলে বাহিরেই সে ভালোবাসা খোঁজে। তার মনে কালিপদ মহারাজ এবং স্বপনদা যে কি বীজ বপন করলেন, তার আর সাধারণ কাজে মন লাগেনা। কে দুঃস্থ কে আতুর, কে অসহায়, তাদের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদে; নিজের কাজ ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তাদের সেবায়। নিজের সংস্থান না থাকলেও যেমন করে হোক তাকে যেন অন্যের দুঃখ দূর করতেই হবে, এই তার ধনুক-ভাঙা পণ। সে আরো বেপরোয়া, বেহিসেবি জীবন বেছে নিলো। চাকরি করল, কিন্তু কোথাও সে টিকল না।

এমনি ভাবে কেটে গেল জীবনের চল্লিশটি বসন্ত। বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করে, পরিবার থেকে দুরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। জীবনে স্থিতি নেই, শুধু আছে মানুষের সেবা করার অকুণ্ঠ বাসনা আর অতৃপ্তি। কিন্তু যার সঙ্গতি নেই, সংস্থান নেই, তার কি সামর্থ্য? এই সময় আবার পট পরিবর্তন। ঘুরতে ঘুরতে ছেলেটি এসে পড়লো বারাসাতের কাছে বামনগাছিতে। প্রতিবোধায়ন সংঘের আশ্রমে। এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তনী শ্রী শিবাজি মুখোপাধ্যায় এবং তার সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতি নীলাঞ্জনা। রামকৃষ্ণ মিশনের ‘আত্মনো মোক্ষার্থ-ং জগদ্ধিতায় চ’ এই ভাবধারাতেই এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা। ছেলেটি মাত্র এক বেলার জন্য আশ্রমটিতে এসেছিল, কিন্তু থেকে গেলো সে প্রায় তিন মাস। শিবাজিদা এবং বৌদির কাজের ধারা এবং জীবনশৈলী দেখে সে মুগ্ধ। এই তো সে চেয়েছিলো। সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই আশ্রম। ছাত্রাবাস, কোচিং সেন্টার, শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির এবং প্রকৃতির উদার পরিবেশে এ যেন বিদ্যাপীঠেরই একটি ছোট সংস্করণ। ছেলেটি ভালোবেসে ফেললো এই

আশ্রমটিকে। তার জীবনে যেন এক নতুন ঈশ্বরের সন্ধান সে পেলো। পাকাপাকি ভাবে কাজ ছেড়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আশ্রমের কাজে। নিরলস কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিলো। এ যেন এক নবজন্ম। কর্মই তার ধর্ম। বিভিন্ন ধরনের গঠন মূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে সে। আবার যোগাযোগ হয় বিদ্যাপীঠের অন্যান্য বন্ধু / দাদা/ ভাইদের সঙ্গে। যে-পরিবার থেকে সে দুরে চলে গেছিল, তার সদস্যেরা আবার তার কাছে আসেন। যে-বাবাকে এতদিন মনে হতো পাষাণসম কঠিন, সেই তিনিইএখন ছেলের কাজ দেখে আপ্লুত। বিপথগামী ছেলের এই পরিবর্তন দেখে তার আর কোনো আক্ষেপ থাকে না, বরং গর্ববোধ করেন। কঠিন কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি তখন অন্তিম শয্যায়, মারা যাবার আগে ছেলেকে আশীর্বাদ করে যান যেন এই ভাবেই যেন সকলের ভালোর জন্য সে তার জীবন নিয়োজিত করে, আর তার গ্রামকে যেন ভুলে না যায়।

ছেলেটি ফিরে আসে তার গ্রামে। ঝাড়খন্ড লাগোয়া পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ব্লকের প্রত্যন্ত একটি মানুষদের বাসস্থল থেকে একটু এগিয়ে বাউরি আর আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতে ঢুকলেই যেন খসে পড়ে উন্নত ভারতের খোলসটি। অধিকাংশ বাড়ি ঘর কাঁচা, রাস্তা উধাও, জমি এক ফসলা, আর অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত। প্রচুর পরিমাণে জমি পড়ে থাকলেও, সেই জমি অনুর্বর, কৃষিকাজের অনুপযোগী। মাছ ধরার পুকুর গুলোতে সেই আদ্যিকালের সনাতন প্রথায় মাছ চাষ, যাতে ফলন অত্যন্ত কম। জাত-পাতের বিড়ম্বনায়, উচ্চবর্ণের মানুষদের কৃষিকাজে অনীহা, আবার নিম্নবর্গের লোকেদের নেই আধুনিক পদ্ধতি তে চাষ করার জ্ঞান বা সামর্থ্য। সবার মধ্যেই যেন এক নেতিবাচক ভাব। নেশাদ্রব্যের কুপ্রভাব ও লটারি কেটে সহজে বড়লোক হবার কুঅভ্যাস প্রায় সর্বত্র। প্রতিবোধায়নের ছত্রছায়ায় এই খানেই ছেলেটি প্রতিষ্ঠা করে তার "মায়ের বাগানবাড়ি'। তার নিজের যে পৈতৃক ৯ বিঘার পুকুর এবং তার সংলগ্ন প্রায় ১০ বিঘে জমিতে আরম্ভ হলো বেদিক এগ্রিকালচার সিস্টেম এবং আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের প্রয়োগ। নানান উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষিকাজকে আকর্ষণীয় এবং লাভজনক করার চেষ্টায় ছেলেটি লেগে গেলো। 'হাই ডেন্সিটি ফিশ কাল্টিভেশন' করে এই প্রজেক্ট-টিকে স্বয়ম্ভর এবং 'সেলফ-সাস্টেইনিং' করা তার অন্যতম উদেশ্য। এই কাজে তাকে সাহায্য করছে বিদ্যাপীঠেরই কিছু ক্লাসমেট, দাদারা এবং ভাইয়েরা।

এখানেই শেষ নয়। ছেলেটির ইচ্ছে হচ্ছে সেখানে একটি 'ইন্টিগ্রেটেড ওল্ড-এইজ হোম কাম অরফানেজ' তৈরি করা, কারণ সে মনে করে এরা উভয় উভয়কে যে মানসিক সহায়তা দিতে পারে তা অন্য কোনো পরিমণ্ডলে সম্ভব নয়। এখন একটি মাল্টি-পারপাস ৩০ ফুট × ৩০ ফুট হলঘর তৈরী হচ্ছে যেখানে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের গান-বাজনা, নৃত্য-গীত, মার্শাল আর্টস, কম্পিউটার শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা (বিশেষ করে মহিলাদের), স্নাতকদের জন্য নানারকম কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতি, কৃষকদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং এবং আরও নানারকম গঠনমূলক কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে। প্রতি সপ্তাহে একটি হেলথ ক্লিনিক বসানোর ও পরিকল্পনা আছে। এছাড়াও গ্রামের যুবসমাজ কে সংগঠিত করে তাদের দিয়ে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ, যেমন ৩৪ টি দুঃস্থ পরিবারের, যাদের কোনো রোজগেরে নেই, তাদের প্রতি মাসে রেশন এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এবার শেষে আপনারা হয়তো ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করবেন এই কাজ তো অনেকেই করে, এতে কি লাভ? ছেলেটির ভাষায়, "আনন্দ পাচ্ছি বললে কম বলা হবে, আসলে এর আগে 'materialistic way of work' করতে শিখেছিলাম আর এখন 'spiritual way of doing work' শেখার চেষ্টা করছি। নিজের চেতনা, আত্ম-উন্নতির জন্য কাজ করছি।" সেই যে স্বামীজি বলরাম বসু-বাবু কে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন -ছিলেন গরু, হয়েছেন মানুষ, হবেন দেবতা - এও তাই। কাজের মাধ্যমে নিজেকে মানুষ করার চেষ্টা করছি। সে আগে জানতো 'work and worship', এখন বুঝলো তা নয়, "work IS worship"।

সেই ছেলেটি ক্লাস ফাইভে যে অপরাধ করেছিল বিদ্যাপীঠ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিদ্যাপীঠ এবং তার ওয়ার্ডেন

এর সম্মানে আঘাত করেছিল সেই ছেলেটি আজ এই লেখার মাধ্যমে মিশনের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সেই ছেলেটির পরিবার তার নাম রেখেছিলো দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরো বিদ্যাপীঠ তার নাম দিয়েছিলো 'পানিপথ' বা 'পানি'। স্বামীজি বলেছিলেন "every saint has a past and every sinner has a future" আমার এই বক্তব্য পড়ার জন্য সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার।

লেখক ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ

দেবব্রত বা পানির কর্মকাণ্ড চাক্ষুষ করতে হলে চলে আসুন মৌতর গ্রাম, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়াতে। আর পুরুলিয়া যদি নিতান্তই দূর মনে হয়, আসতে পারেন বারাসাতের কাছে গেলো প্রতিবোধায়নের বামনগাছি আশ্রমে। যোগাযোগ করুন Mob: 79801422968 / Email: pct.soonsor@qmail.com

'মায়ের বাগানবাড়ি'র কাজে আপনিও যদি শামিল হতে চান, অনুদান পাঠাতে পারেন এই ব্যাঙ্ক একাউন্টে: PRATIBODHAYAN CHARITABLE TRUST, A/C no 30051365775, IFS Code- SBIN0001798, SBI, Beliaghata Branch, Kolkata

তাই লিখি যা আসে মনে

কৌস্তভ মুখার্জী (১৯৮৬)

'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।'

পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়ে জীবনের মধ্যগগনে বিচরণ আর তাই কিছু আবোল-তাবোল লিখি নাহয়।

আমাদের ছোটবেলায় প্রাচুর্য ছিল না। বলা ভালো, প্রাচুর্যের উপায় ছিলনা। একটা পাকা বাড়ি, বাড়িতে গাবদা কালো টেলিফোন, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গাড়ি থাকলেই বড়লোক বলে গণ্য হত। পৈতেতে প্রথম ঘড়ি পেয়েছিলাম, দম-দেওয়া স্প্রিং-এর ঘড়ি। সেই ঘড়ি পরে যখন বিদ্যাপীঠে ফিরলাম তখন পারলে ঘড়ি-পরা হাতখানা সারাক্ষণ বুকের কাছে তুলে রাখি। আজকের ছেলেপুলেরা হাসবে - ব্রহ্মানন্দ সদনে একটা মাত্র অ্যালার্ম ঘড়ি ছিল বাণীব্রত নায়েকের কাছে, দম দেওয়া টেবিল ক্লক, বাজত ক্রিংঅংঅংঅং শব্দে ধাম মাথায় করে। আমি থাকতাম দোতলার তিন নম্বর ঘরে। বাণীর বেড ছিল আমার ঠিক নীচে একতলাতে। পরীক্ষার আগে রাতে আমার পায়ে একটা দড়ি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিতাম নীচে। চুক্তি ছিল বাণী রাইজিং বেল বাজার একঘন্টা আগে উঠে দড়ি টেনে আমায় তুলবে। প্রায় প্রতিদিনই বাণী ঝুলে পড়ত দড়ি ধরে। আমিও ঘুম থেকে উঠে সবাইকে ডেকে তুলে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার মেয়ের মধ্যে যে সমাজসেবার ভূতটা আছে, তা বোধহয় সেইসময়ই একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সেই যে সকালে ওঠার অভ্যেস হল তা রয়ে গেল আজ পর্যন্ত।

আমাদের ধাম পরিষ্কার করতে হত। ঝাঁট দিতে হত, মুছতে হত, নিজেদের দেখভাল নিজেদেরই করতে হত। সেই স্বাবলম্বিতা ছাড়তে পারলাম না আজও। পেশাগতভাবে একটা মাঝারি ছোট নার্সিংহোম চালাই। এই তো সেদিন একটা জরুরী রোগীকে ICU–তে তোলার দরকার ছিল আর ওয়ার্ডবয় অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। হাত লাগালাম স্ট্রেচার ঠেলতে। এই অহংবোধটাই যে ছোটবেলায় ভেঙে দিয়েছে বিদ্যাপীঠ।

ম্যানেজমেন্ট পড়ার সময় Conditional Learning বলে একটা Chapter ছিল। তাতে বলা ছিল নেগেটিভ কন্ডিশন কিভাবে মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই থিয়োরিটা হাতে কলমে বুঝেছিলাম যখন ক্লাস টেন-এ পড়ি। অজয়দা আমাদের বি সেকসনের বায়োলজি ক্লাস নিতেন আর সে-বছর মাধ্যমিকে চোখের স্ট্রাকচার খুব Important ছিল। ফার্স্ট পিরিয়ডিকাল পরীক্ষায় চোখ আঁকা এসেছিল। আর আমার আঁকা চোখ দেখে অজয়দার চোখ উলটে যাবার উপক্রম! খাতা দেখানোর সময় একটা চোখে সরষেফুল ফোটানো চড় খেয়েছিলাম অজয়দার কাছে আর তাতেই আমার চোখ মোটামুটি মাধ্যমিক পর্যন্ত সিধে হয়ে গেল।

বিদ্যাপীঠের আগে কলকাতার টাকি স্কুলে পড়তাম। হিন্দু হেয়ার, টাকি তখন কলকাতার ভালো স্কুলগুলোর থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। লেখাপড়ায় মধ্যম মানের ছিলাম চিরদিনই, এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত। কিন্তু সমস্যা হল সেই সঙ্গে একটু 'ল্যাবা'ও ছিলাম। খুব মিশতে পারতাম না কারো সঙ্গে। বিদ্যাপীঠে গিয়ে অত ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে গিয়ে মেশার অভ্যেস হয়ে গেল। আমি এখন জলের মত। যে পাত্রে রাখো না কেন সেই পাত্রের আকার ধরে নিতে পারি - ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের এক্কেবারে ছড়াছড়ি। পেশাগতভাবে পরিকল্পনামাফিক রাগ করতে বা রাগ গিলতে ওস্তাদ আমি এখন।

মানুষের জীবনে পড়াশোনার গুরুত্ব বোধহয় পঁচিশ শতাংশের বেশি নয়। পঁচাত্তর শতাংশ জীবনশৈলী। পড়তাম গোয়েঙ্কা কলেজে। বাম রাজনীতির মধ্যগগনে গোয়েঙ্কা তখনও 'ছাপু'দের (ছাত্র পরিষদ) দখলে। অধিকাংশ

সুন্দরী মেয়েরাই ছিল 'ছাপু-দের সমর্থক। তাই আমার ছাপু করাটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। কলেজের গা ঘেঁষে ছিল সে যুগের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক বাম নেতার রাজনৈতিক কার্যালয়। প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ঘর রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর পড়ত। আর প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ছুতোয় বামপন্থী 'মাকু'র দল আমাদের পাখোয়াজের মত পিটিয়ে যেত। এই পাখোয়াজ বাজানো যে শুধু কলেজের বাম ছাত্ররাই করত তা নয়, প্রায়শই বিখ্যাত হাড়কাটা গলি থেকে হাতকাটা পঞ্চুর দল হাজির হত পাখোয়াজ বাজানোর জন্য। দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি কলেজ ছাড়া হলাম। মাসখানেক বাদে আমার বাবা কিভাবে যেন ব্যাপারটা জানতে পারলেন। আর তাতেই আল্টিমেটাম কলেজ করো, নয়তো বাড়ী ছাড়। রাজনীতির জন্য তো আর বাড়ি ছাড়া যায় না তাই গুটিগুটি হাজির কলেজে। অতঃপর দল পরিবর্তন ও মধুরেণ সমাপয়েৎ। এই যাওয়া আসা যে চিরন্তন রাজনৈতিক কৌশল আমি বোধহয় তার প্রমাণ। এই ছাত্র ইউনিয়নে শেখা ম্যান ম্যানেজমেন্ট আজ লেগে যায় পেশার কারণে যখন কোনো রোগীর বিরূপ ঘটনায় জনতাকে ঠান্ডা করতে হয়। একেই বুঝি বলে 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা''! আজকের কলেজ ইউনিফর্ম পরা ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলে ভাবি যে এই পড়াশোনার সারবত্তা কি যদি না পাঠ্যবই এর বাইরে কলেজ থেকে কিছু শেখা যায়!

সে সময় TV খুললে দুটো সরকারি চ্যানেল দেখা যেত, তাতে শ্রীযুক্ত প্রণয় রায় মহাশয় (অধুনা ND TVর) সপ্তাহান্তে প্রতি শুক্রবার The World This Week বলে একটি অনুষ্ঠান করতেন। এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। আর ছিল টেনিসের গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রতিযোগিতা। সারা বছর স্টেফি, সাবাতিনিতে বুঁদ হয়ে থাকতাম। বুম বুম বেকার, ইভান লেন্ডল তো ছিলই। ঘরের মধ্যে স্টেফির একটা বিকিনি পড়া পোস্টার লাগানো ছিল। বিদ্যাপীঠের স্বপনদা কি কারণে একবার আমাদের বাড়ি এসে এই পোস্টার দেখে ভিরমি খাওয়ার জোগাড় হয়েছিলেন। ইংরিজি গান বুঝতাম না, মানে এখনও বুঝি না, কিন্তু গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড দেখতে ভুলতাম না কখনো। কত নাম হুইটনি হুস্টন, মাইকেল জ্যাকসন, রজার হুইটেকার, স্টিভি ওয়ান্ডার, লায়োনেল রিচি। এরই মাঝে আমাদের বাপিদা মানে বাপি লাহিড়ি মশাই টুক করে চুরি করে গানগুলোকে হিন্দি করে দিতেন। ব্রাদার লুগি লুগি লুগি হয়ে গেল ''জুবি জুবি জুবি'' আই জাস্ট কলড টু সে আই লাভ ইউ হল ''আতে যাতে হাসতে গাতে'', গানগুলো সব আমাদের মুখে মুখে ফিরত। আর ছিল এক হলীয় সিনেমা হল। উত্তর কলকাতা আর ভবানীপুরের হলগুলোতে বাংলা আর হিন্দি সিনেমা, আর এসপ্ল্যানেডে ইংরেজী সিনেমা। দ্য টাওয়ারিং ইনফার্নো, হোয়্যার ঈগলস ডেয়ার, কত কত ভালো সিনেমা যে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। আর টিকিটের দাম! সে তো হাতখরচ থেকেই এসে যেত। আর একটা শো হত রোববার দুপুরবেলায় জ্যাক কুস্তোর 'দ্য আন্ডার দি সী'। সেই প্রথম আমার জলের নীচের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়। কোনো এক সময় মেরিন সায়েন্স নিয়ে পড়ার বাসনাও হয়েছিল। কিন্তু হলে তো আর হবে না– যা পরীক্ষার রেজাল্ট তাতে এতদূর পর্যন্ত যে পড়েছি, এই ঢের! এর জের কিন্তু সেদিন শেষ হয়ে যায়নি। বহু বছর বাদে মধ্য চল্লিশে সার্টিফায়েড স্কুবা ডাইভার হয়ে দেশ বিদেশের সমুদ্রতলে ঝাঁপাই এখন আন্দামান, থাইল্যান্ডের কোফাঙ্গান, ইন্দোনেশিয়ার লেমবে প্রণালী, বোর্নিও কোথায় না কোথায় ডাইভ করেছি। ২০২০তে ভেবেছিলাম কোমোডো যাব, কোমোডো ড্রাগনের সঙ্গে ডাইভ করতে, বাধ সাধল কোভিড। এই বছর মালদ্বীপের ফুভামুলা যেতে পারি টাইগার শার্ক দেখতে।

আমি খুব একটা ধার্মিক নই। আমি যেটুকু হয়েছি বা হতে পেরেছি তার কৃতিত্ব আমি ঠাকুর মা স্বামীজিকে দিতে নারাজ বরং আমি তার সমস্ত কৃতিত্ব দিই মহারাজদের, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের যাঁরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আমাদের গড়ে তুলে ছিলেন। মনপ্রাণ ঢেলে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোর দাদা হয়ে উঠেছিলেন। বয়ঃসন্ধির সংকট নির্দ্বিধায় শেয়ার করতে পারতুম স্বপনদা শক্তিদার সঙ্গে। আজ এইসব মহান শিক্ষকদের অনেকেই নেই। আমার

এই তর্পণ তাঁদের প্রতি। আমার মত যারা অমলকান্তি হতে চেয়েছিল, তারা রোদ্দুর হতে পারেনি ঠিকই কিন্তু আমারই সতীর্থরা তারা তাদের সাফল্যের মধ্য গগনে। তাদের দেখলে বুকটা ৫৬ ইঞ্চি হয়ে ওঠে। তাদের ভিত এই মানুষরাই করেছিলেন। মানুষেই ভগবানের আত্মপ্রকাশ। আমাদের দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আমাদের পানিপথ ওরফে পানি) জীবন, মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশের কাহিনী। ক্লাসের সেরা স্পোর্টসম্যান এগারো বারোতে আমার চেয়েও উচ্ছন্নে গেছিল। যার হারিয়ে যাওয়ার কথা, সেই পানির একদিন উত্তরণ ঘটল– অনুঘটক কোনো এক নরেন্দ্রপুরের শিবাজিদা। আজ সে এক গ্রামকে নতুন পথে চলতে শেখাচ্ছে। তার সাফল্য আমাদের সবচেয়ে সফল বন্ধুটির সাফল্যকেও ম্লান করে দেয়। এই যাত্রায় কত যে অতি সাধারণ মানুষকে অসাধারণত্বে উত্তীর্ণ হতে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। একটি গল্প দিয়ে লেখাটায় ইতি টানি। তখন আমি সবে সবে বাবার হাত থেকে পারিবারিক নার্সিংহোমের ব্যাটনটা নিয়েছি। একটি ৩৫ বছরের মহিলা এলেন পেটের টিউমার অপারেশন করাতে। দেখেই বোঝা যায় সামর্থ্য নেই। ব্যবসায়ী আমি, বেঁকে বসলাম টাকার দাবীতে। একজন বৃদ্ধা দেখা করলেন আমার চেম্বারে। বললেন 'অপারেশনটা বন্ধ কর না বাবা, বিকেলে তুমি পয়সা পেয়ে যাবে।' জিজ্ঞেস করলাম ''আপনি রোগীর কে হন?'' উত্তর এলো রোগী তাঁর পাশের বাড়িতে থাকে। অপারেশন হল। প্রতিজ্ঞামত পঁচিশ হাজার টাকা জমা করলেন তিনি বিকেলে। ধরা পড়ল রোগীর শেষ স্টেজ ক্যানসার! পরের দিন একটি যুবতী কেঁদে পড়ল আমার কাছে। বলল যে তার মা দিল্লিতে পরিচারিকার কাজ করেন। তাঁর সঞ্চিত সমস্ত অর্থটি রোগীর চিকিৎসার জন্য তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। আমি ভাবলাম এই সুযোগে পুণ্য অর্জনের সুযোগ ছাড়ি কেন! ঠিক হল আমরা এক পয়সাও নেব না রোগীর চিকিৎসার্থে। আমার ব্যবসায়ী মন এই পুণ্য কাজের বিজ্ঞাপন করা থেকে বিরত থাকতে সায় দিল না। ভর্তি রিসেপশনে একটা খামে পুরো টাকাটা পুরে তাঁর হাতে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে সবাইকে শুনিয়ে বললাম যে মানবিকতার খাতিরে তাঁর রোগীর সমস্ত চিকিৎসা খরচ আমরা মাপ করে দিলাম। মৃদু হেসে আমার হাত থেকে খামটা নিয়ে, খামটা দিলেন রোগীর ছেলের হাতে। বললেন 'বাবা, তোর মা তো বেশীদিন বাঁচবে না, একটু যত্ন করিস, ভালো খাওয়াস ওকে।; আমার অহং কোথায় গেল তাঁরই অহংকারে।

লিখতে বসে আবোল তাবোল কত লিখে ফেললাম। লেখার যোগ্যতা বিচার না করেই। চারিদিকে শুধু সামাজিক অবক্ষয় দেখতে দেখতে তৃষিত নয়নে খুঁজি তাকে, যাঁর মধ্যে তাঁর প্রকাশ।

'সবার পিছে সবার নীচে সব হারাদের মাঝে' যাঁর অধিষ্ঠান।'

লেখক হেলথকেয়ার প্রফেসনাল

বিচার

বিস্ময় রায় (১৯৮৭)

১৯৮০ থেকে '৯০ এর মধ্যবর্তী সময়ে আমরা যখন বিদ্যাপীঠের ছাত্র, তখন প্রতি শনিবার শেষ বেলায় 'কালচারাল প্রোগ্রাম' বলে একটা পিরিয়ড থাকত। হয়তো এখনও হয়। ছাত্ররা নিজেদের ইচ্ছেমতো গান, কবিতা, আবৃত্তি, মূকাভিনয় ইত্যাদি যে যা পারত করত, শিক্ষক ও বন্ধুদের সামনে। মাঝে মাঝে মাইক্রোফোনের শব্দ ছাপিয়ে বাইরে থেকে কর্কশ কেকাধ্বনি জেগে উঠত। আমাদের গানের গুঁতো বন্দী ময়ূরটি হয়তো আর সহ্য করতে পারত না।

কিন্তু এই সি. পি. ক্লাসগুলি ছাত্রদের অনেককেই খুব 'কনফিডেন্স' জুগিয়েছে। সবসময় দরকারি কথাগুলো বলে ফেলার সাহস। কিছুটা সংস্কৃতি চেতনাও।

এছাড়া বরাবরই বিদ্যাপীঠে নাট্যাভিনয়ের একটা জোরালো পরিমন্ডল ছিল। বিভিন্ন নাটক সদলে মহড়া দিয়ে আবহ সহযোগে সভাগৃহের মঞ্চে অভিনীত হত। আজও হয়। কুশীলবরা অনেক সময় হতো বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্র ভাই বা বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা বা সহপাঠী বন্ধুরা। আর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইদের দেখতাম বিবিধ চরিত্রে। অন্তর্জাল বা দূরদর্শন বিবর্জিত সেই যুগে খেলার মাঠ ছাড়া ওই মঞ্চই ছিল আমাদের বিনোদনের মস্ত বড় উপাদান। সেসব দিনের কথা ভাবলেই মানাশিস অর্কেস্ট্রার ক্ল্যারিওনেট আর ধামসার আওয়াজ মনে ভেসে ওঠে। বর্তমানের ছাত্ররা আজও বিভিন্ন সাজে সেজে বিবিধ নাটক অভিনয় করে; নির্দেশনায় থাকেন গুরুদের কেউ কেউ। সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে!

তবে নারী চরিত্র যোগাড় করা বিদ্যাপীঠে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া আবাসিক বিদ্যালয়ে থাকাকালীন ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা থাকে অনেক রকম। মঞ্চাভিনয় করতে গিয়ে আমরাও একদিন সেসব প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছি। তাই আচমকা মনে হলো শুধুই পুরুষ চরিত্র থাকবে এমন একটি একাঙ্ক নাটক পেলে অধুনা ছাত্রদের অভিনয় করতে সুবিধা হতে পারে। এই ভাবনা থেকে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ নাটককার William Shakespeare রচিত অন্যতম জনপ্রিয় কমেডি নাটক The Merchant of Venice অবলম্বনে মূল কাহিনী সূত্র অক্ষুন্ন রেখে একটি একাঙ্ক খাড়া করলাম বাংলায়। Shakespeare সাহেব তাঁর নাটকে Blank Verse এবং Iambic Pentametre ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বঙ্গানুবাদে তা হুবহু সম্ভব না হলেও ছন্দময় কাব্যের চলনটি রাখা গেল। মিলনান্তক পঞ্চাঙ্ক মূল নাটকের সেরা ও বহুখ্যাত Court Scene কেন্দ্র করেই এই একাঙ্কটির রচনা।

নির্দেশক তাঁর সুবিধামত মঞ্চসজ্জা, আবহ সংগীত, আলোক প্রক্ষেপণ এমনকি জনপ্রিয় চলতি সুরের ব্যবহার করতে পারেন। আর এলিজাবেথীয় যুগের সাজসজ্জার আন্দাজ পাওয়া যাবে ইন্টারনেটে ঢুকে পড়লেই।

[রচয়িতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশ নিবন্ধক। কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের নিয়মিত মঞ্চ অভিনেতা। শখ : ভ্রমণ, আবৃত্তি, অভিনয়, দেশ-বিদেশের মুখোশ ও চিত্তাকর্ষক সত্য কাহিনী সংগ্রহ। যোগাযোগ : ৯০০৭৬৯৯১৭৯]

'বিচার'

ঘোষকের প্রবেশ— হাতে ভেঁপু (ভেঁপু বাদন)

ঘোঃ– শুন শুন সভ্যগণ, শুন দিয়া মন–
বিচিত্র ঘটনা আজি করিব বর্ণন। আহা করিব বর্ণন!
বার্ড অব অ্যাভন শেক্ষপীর লিখেছিলেন গল্প,
তারই থেকে টুকে নিয়ে একটুখানি, অল্প
বাংলায় নাট্যরূপ দেছেন স্যার শ্রী বিস্ময়–
আপনাগো লাইগবে ভালো নিশ্চয়, নিশ্চয়।
বাঘা উকিলরা আজ আসবে এঁটে শামলা,

ইহুদি মহাজন আর কেরেস্তানী সওদাগরে মহামতী ডিউকসভায়
এ ভেনিস নগরে লেগেছে যে জোর মামলা।

পেয়াদার প্রবেশঃ— কেন? কেন? কেন?

ঘোঃ এই মোলো যা – দেখি কিছুই জানে না।
আরে, প্রেমিক প্রবর ব্যাসানিওর
সঙ্গে রূপসী পোর্শিয়ার বে।
তা নবাব নন্দিনীর শাদী যখন
সে খরচা যোগাবে কে?

পেঃ কে যোগাবে?

ঘোঃ তাইতো কতা। তা গরীবের ছেলে ব্যাসানিও চললে তার কেরেস্তান বন্ধু আন্তোনিওর কাছে টাকা ধার করতে।

পেঃ তিনি আবার কিনি?

ঘোঃ অ মা! তাও জানো না? সে মস্ত সওদাগর গো। তার ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা। কিন্তু এখন তো আন্তোনিওর জাহাজ গেছে দূর দেশে, বাণিজ্য করতে। টাকা তো হাতে আসবে জাহাজ ভিড়লে।

পেঃ তাহলে ব্যাসানিওর কি হবে?

ঘোঃ সেই তো মুশকিল। টাকা হাতে নেই হালফিল। অগত্যা বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে আন্তোনিও চললে তার চিরশত্রু বুড়ো শাইলকের কাছে।

পেঃ কেন? কেন? কেন?

ঘোঃ এহেঃ এ ব্যাটার মাথায় গোবর। মহাজন নইলে এমন অসময়ে ধার দেবে কে? তা শাইলক তো শত্তুরকে দেখে চটে উঠবে ভাবা গিয়েছিল। হল তার উল্টো।

পেঃ সে কী?

ঘোঃ ঠিক তাই। গদ গদ হয়ে সে বললে– ''ভাই অ্যান্টনী, টাকা তোমাদের যা লাগবে নাও,
সে না হয় দেব যত চাও।''
আন্তোনিও কইলে— ''তিনমাসের মধ্যে আমার জাহাজ ভিড়বে ভিনিস বন্দরে। তখন দেব তোমার টাকা। এক্কেবারে সুদে আসলে।
শাইলক— আরে ছি ছি ছি। আমায় ভেবেছ কী? তুমি হলে বণিক প্রবর।
তোমার কাছে নেব সুদ? আমার কি মাথায় গোবর? তবে হ্যাঁ, শর্ত একটা আছে। বাপু, বলেই ফেলি তোমার কাছে। [গলা খাঁকরে] আমি ইহুদী বলে, সন্ধ্যা সকালে—শুনেছি জলস্পর্শ কর না আমায় গালাগাল না করে, তবে আমার কিন্তু সুদ চাই নে তোমার কাছে– আসল দিলেই হবে।
তাও না পারলে তবে— বুক থেকে কেটে নেব এক পাউন্ড মাংস।

পেঃ ওমা! বুড়োটা কি শয়তান গো! (চোখ গোল করে গালে হাত দিয়ে)

ঘোঃ তাহলে আর বলছি কি? তা এমন কপাল সেই জাহাজ গেছে ডুবে। এদিকে টাকার যোগাড় হতেই আনন্দে ব্যাসানিও গেছে কুমারী পোর্শিয়ার গলায় মালা দিতে। বর কনে জোড়ায় ফিরে এসে তো তাদের মাথায় হাত!

(গান) কর্জ টাকার হয়নি যোগাড়—
বুড়ো ঘুঘু শাইলক তাই করেছে যে হামলা
ডিউকের দরবারে সে ঠুকেছে যে মামলা।

ঐ আসছেন ডিউক মশাই।

পেঃ ভিনিসাধিপতি পরম বীর মহামহিম

ডিউক পধার রহেঁ হেঁয়! (ভেঁপু বাদন)

(ডিউক এসে বসলেন রাজসভায়। পেয়াদা সেলাম করে দাঁড়ালে তাঁর পিছনে। হাতে লাঠি বা বর্শা। অন্যদিকে ঘোষক। একদিক থেকে শাইলক এসে দাঁড়াল। অন্যদিকে থেকে আন্তোনিও, ব্যাসানিও ও গ্রাতিয়ানোর প্রবেশ)

ডিউক ঃ আন্তোনিও কই?

আন্তোনিও ঃ হাজির হুজুর, আপনার সামনে।

ডি ঃ তোমার জন্য মনটা আমার খারাপ। বুঝলে?
শোনো শাইলক। এসে দাঁড়াও সামনে।

শাইলক ঃ (সেলাম ঠুকে) হুজুর! ধর্মাবতার!

ডি ঃ দেখ, জাহাজডুবিতে সব গেছে লোকটার। ওকে তোমার একটুও দয়া হয় না? জানি তোমার দাবী ন্যায্য। টাকা ফেরত দিতে পারেনি সে। তাই শাস্তিও প্রাপ্য। কিন্তু ক্ষমা পরম ধর্ম। সেও তো মানুষেরই কর্ম?
দাও না লোকটাকে ক্ষমা করে। সবাই তবে তোমারই গুণ গাইবে। নইলে সে লোকটা যে মরবে।
বলতো বাবা, কি চাও তুমি? কি করবে?

শা ঃ আমি যা চাই সে কথা লেখা আছে এই চুক্তি পত্রে। কেন করব দয়া? ইহুদি বলে চিরকাল লোকটা ঘেন্না করেছে আমাকে। অকথ্য গালি দিয়েছে, এমনকি আমার পাকা চুলকেও সম্মান দেয়নি। ভাবছেন আমি কেন ধারের তিন লক্ষ টাকার বদলে চাইছি এক পাউণ্ড পচা মাংস?
আমার খুশ্। আমার মর্জি—তাই। (কাঁধ ঝাঁকায়)

ডি ঃ এত রাগ তোমার বেচারার উপর?

শাই ঃ সাপকে কেউ কখন দুবার কামড়াতে দেয় হুজুর?

আ ঃ হুজুর ভুলে যাচ্ছেন আপনি শয়তান ইহুদীর সাথে কথা কইছেন। বরং দরিয়ার ঢেউকে বলুন থেমে থাকতে সে কথা শুনলেও শুনতে পারে, কিন্তু বুড়ো সুদখোরটাকে আপনি মানাতে পারবেন না।

শাই ঃ (দাঁতে দাঁত পিষে) দেখলেন! হুজুর দেখলেন। কেন ওর বুকের মাংস আমার খুবলে নিতে ইচ্ছে করে। হতচ্ছাড়া খ্রিস্টান! শয়তান।

ব্যাসানিও ঃ (থলি তুলে ধরে) এই নাও ছ'লক্ষ টাকা। তোমার তিন লক্ষের ডবল আছে এই থলিতে। নিয়ে আমার বন্ধুকে রেহাই দাও।

শাই ঃ আমি তো কোনো অপরাধ করিনি, তবে কেন ওকে ছেড়ে দেব? তোমার তো ভাই অনেক ক্রীতদাস আছে। আমি কি বলতে পারি তাদের ছেড়ে দাও, কিংবা জামাই আদরে খাওয়াও পরাও? পারি না, কারণ সে তোমার সম্পত্তি। তেমনি অ্যান্টনীর বুকের মাংসও এমন আমার সম্পত্তি, ও আমি ছাড়ব না।

ডি ঃ ভিনিসের ডিউক হিসেবে শাইলকের দাবী মেনে নিতে আমি বাধ্য, কারণ চুক্তিপত্রে সেরকমই লেখা আছে। 'ধার নেওয়া তিন লক্ষ টাকা' সময়মত ফেরত দিতে না পারলে আন্তোনিওর বুক থেকে পুরো এক পাউণ্ড মাংস নিজের হাতে কেটে নিতে পারবে শাইলক।' ওঃ কি নিষ্ঠুর!

শাই ঃ এই যে হুজুর, বাটখারা আর দাড়িপাল্লা নিয়ে হাজির আছি আমি।
এরপরেও যদি আমার হকের মাংস না পাই,
তবে বুঝব এ রাজ্যে বিচার বলে কিছু নাই।
আমি সুবিচারের আশায় এই আদালতে এসেছি হুজুর। আমার সুবিচার চাই।

পেয়াদা ঃ জনাব, বিদেশ থেকে আপনার বন্ধু বেলারিও সাহেব এক জবরদস্ত উকিলকে পাঠিয়েছেন এই কঠিন কেসটা লড়ার জন্য।

ডি ঃ কই নিয়ে এস তাকে। নিয়ে এস!

(ঘোষক বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে এল পোর্শিয়ারূপী উকিলকে।)

ব্যাসানিও ঃ আন্তোনিও, বন্ধু এখনও আশা আছে। তুমি ভয় পেয়ো না। দেখ, ঈশ্বরের আশীর্বাদে কোন দেবদূত হয়ত বাঁচাতে এসেছেন তোমায়।

আন্তোনিও ঃ না; ভাই ব্যাসানিও, আর কোন আশা নেই। শুধু কয়েকটা মিনিট দেরি হবে মাত্র এইটুকুই।

গ্রাতিয়ানো ঃ দেখ দেখ্। বদমাশটা ছুরিতে শান দিচ্ছে। শয়তানের বাচ্চা, ওর হিংসের ধার কাছে দিয়ে কেউ যেতে পারবে না।

ব্যাসানিও ঃ মহাজন, তুমি যত টাকা চাও দেব। বিয়ের পাওয়া যৌতুক সমস্ত উজাড় করে দেব তোমার পায়ে। শুধু আন্তোনিওকে ছেড়ে দাও। (শাইলক মৃদু হেসে ছুরিতে শান দিতে থাকে)
ও ভগবান! কিছুতেই কি তোমাকে টলানো যাবে না। ঠিক আছে। যদি মারতেই হয়, আমায় মারো। আমার মাংসে মেটাও তোমার খিদে। আন্তোনিওর কী দোষ? ওকে মরতে হবে কেন? বিয়ে তো করেছি আমি। টাকার দরকার ছিল আমার।

উকিল ঃ (উকিলের প্রবেশ) সেলাম হুজুর। (এক হাঁটু গেড়ে মাথা নোওয়ায়)

ডি ঃ আপনাকে স্বয়ং বেলারিও পাঠিয়েছেন?

উ ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ জনাব। আর এই মোকদ্দমার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনাও হয়েছে যথেষ্ট।

ডি ঃ তাহলে আপনি সওয়াল শুরু করুন। দেখুন যদি এই হতভাগ্য ভিনিসবাসী আন্তোনিওকে ঐ পাষণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

উ ঃ এখানে কোনজন শাইলক আর কেই বা আন্তোনিও?

শাই ঃ আমিই সেই শাইলক।

উ ঃ তা বেশ! তা বেশ! আপনি যে ঠুকেছেন কেস্
বড়ই বিচিত্র! অভূতপূর্ব! কি হবে শেষ মেস?

শাই ঃ আমার সুবিচার চাই। (ডিউকের হাত থেকে চুক্তিপত্র গ্রহণ করে—)

উকিল ঃ হুঁ! চুক্তিটা হয়েছে বেশ পোক্ত।
জটিল সমস্যা, বিচার বড়ই শক্ত।।
(আন্তোনিওর প্রতি) এর নিচে সইটা আপনারই – তা মানেন?

আ ঃ (দীর্ঘশ্বাস) হ্যাঁ, সে কথা সবাই জানেন।

উ ঃ তবে তো ভিনিসের আইন বলে
শ্রী শাইলকেরই সত্ত্ব রক্ষিত হবে।
হুঁঃ ইহুদীকেই তবে করতে হবে দয়া।

শাই ঃ কী দায় ঠেকেছে আমার? বাওয়া?

উ ঃ ‘দা কোয়ালিটি অব্ মার্সি ইজ্ নট স্ট্রেইন্ড্
ইট ড্রপেথ্ অ্যাজ দ্য জেন্টল্ রেইন ফ্রম হেভন’
সে তো মমতা ফল্গুধারা
জোর করে কি যায় পারা
ধরে তাকে আনতে?
দয়া–সে যে রাজকীয় গুণ
রাজমুকুটের চেয়ে বেশী পায় শোভা
নরেশ্বরের শিরে
যে জন পাবে, যে জন দেবে দু’জনাই ধন্য
আর কোন ধর্ম আছে এমন অনন্য?
প্রার্থনা করি—দয়ায় রক্ষা কর আন্তোনিওরে।

শাই ঃ পাগল!
অর্বাচীনের খোসামোদে যাব গলে
আমি এমনি ছাগল?
অ্যান্টনী ভেঙেছে চুক্তি।
আর, আমি দেব তারে মুক্তি?
আহাঃ কি চমৎকার যুক্তি!
দেশের আইন যাক তার পথে।

উ ঃ বলছে আন্তোনিও—করবে না টাকা শোধ?!

ব্যাসা ঃ এই তো টাকা। সঙ্গে করে বসে আছি সকাল থেকে
নিক না কত নেবে। দুগুণ, তিনগুণ, দশগুণ!

গ্রাতি ঃ আমি রাখতে পারি বাজী তাতেও আমি রাজী,
ঐ বদমাশটার আসল মতলব ভিন্ন
আন্তোনিওকে মারতেই ওর সুখ
নিষ্ঠুরতায় নেইকো কোনোই দুখ
আইনকানুন করে ছিন্নভিন্ন
ব্যাটা নীতি কথাকে দেখাতে চায় কাঁচকলা।

উ ঃ তবে আর নেই কোনো উপায়
বেচারার প্রাণটা দেখি যায় (জনান্তিকে)
আইন তো মানতেই হবে।
জিত শাইলকেরই হবে
কেটে নাও তবে তোমার হকের এক পাউণ্ড—শুধু—

শাই ঃ ওঃ সাধু সাধু! এই না হলে অ্যাডভোকেট। দাঁড়াও না, বেরিয়েই ভরে দেব তোমার পকেট।

উ ঃ তবু একবার ভেবে দেখ। এই চুক্তিপত্র ছিঁড়ে দিয়ে তিন লক্ষের তিনগুণ বাড়ি যাও দাদা নিয়ে
সেটাই কি ভাল হবে না?

শাই ঃ পণ্ডিত উকিল বটে তুমি
তবু বলি, বয়স তোমার কম
তাহলেও সুবিচারে তুমি দড়
তবে, নিয়মমতই সব কর।
কবুল মাফিক আমার চাই সুবিচার
চাই না টাকা, অনেক আছে আমার।
কিন্তু অ্যান্টনীর পতন দরকার।

উ ঃ কিন্তু এক পাউণ্ড মাপবে কিসে?

শাই ঃ এই যে দাঁড়িপাল্লা আর সীসে (বাটখারা দেখিয়ে)

ডিউক ঃ আন্তোনিও—তুমি বলবে কিছু?

আ ঃ আর তো সহ্য হয় না হুজুর। এবার গেলেই ভাল। মিছিমিছি দাঁড়িয়ে আর প্রহসন কেন?
বন্ধু ব্যাসানিও দাও তোমার হাত (আবেগমথিত)
(উভয়ে হাত ধরল দুজনের)
দুঃখ কোরো না—এ তোমার দোষ নয়, আমার ভবিতব্য।
তোমার স্ত্রীকে জানিও আমার নমস্কার সুখে থেকো তোমরা।

কোন দুঃখ নেই, বন্ধুর উপকারে লেগে জীবন ধন্য আমার। — নাই বা বাঁচলাম।
তোমার আর রইল না ঋণ
আমার হৃদয় রক্তে সব হবে শোধ বোধ
কেঁদো না সখা, মনকে দাও প্রবোধ।

ব্যাসা ঃ বন্ধু, আমার নববধূকে আমি বোধহয় প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। কিন্তু যদি তার বিনিময়েও এই শয়তান ইহুদী তোমায় ছেড়ে দিত আমি তাতেও রাজী ছিলাম।
ও নিয়ে যাক পোর্শিয়াকে। বরং ফিরিয়ে দিক তোমার জীবন।

উকিল ঃ আপনার বউ এখানে উপস্থিত থাকলে কিন্তু একথা শুনে মোটেই খুশী হতেন না। বরং চটাচটি হয়ে যেতে পারে। আপনার ভাগ্য ভালো তিনি এখানে নেই।

শাই ঃ এই তো কেরেস্তানী স্বামীদের চরিত্র। ফুসলাবার বেলায় একরকম, আড়ালে অন্যরকম।
যাক সে কথা, ধর্মাবতার, বৃথা আলোচনায় আমরা সময় অপব্যয় করছি।
আপনি বরং শেষ রায়টা দিয়ে দিন হুজুর। দেরী হচ্ছে, এবার বাড়ি যাব।

উ ঃ শর্তানুসারে, বণিক আন্তোনিওর এক পাউণ্ড মাংস মহাজন শাইলকের ন্যায়তঃ প্রাপ্য। মহামান্য ডিউকের বিচারসভায় ভিনিসীয় আইন মোতাবেক শ্রী শাইলকের এই দাবী মঞ্জুর হল।

ডিউক ঃ অগত্যা!

গ্রাতি ঃ হায়! হায়! সব্বনাশ হয়ে গেল। (মাথায় হাত)

শাই ঃ সাবাশ সাবাশ উকিল সাহেব।
করেছেন বিচার সঠিক
যোগ্যতায় আপনি সলোমন তুল্য
কি অ্যান্টনী? বলছি বেঠিক?
তবে হুজুর আমার এক পাউণ্ড আদায় করে নিই?
(দাঁড়িপাল্লা এবং ছুরি বাগিয়ে এগোয়) [–সাসপেন্স! (বাজনায়)]

উকিল ঃ দাঁড়াও। এই চুক্তিপত্র অনুসারে কিন্তু একফোঁটা রক্তও তুমি পাবে না। পরিস্কার বলা আছে আন্তোনিওর বুকের এক পাউণ্ড মাংস তুমি সময়ে টাকা ফেরত না পেলে কেটে নিতে পারবে। কিন্তু যদি একটুও রক্তপাত হয় তবে কিন্তু ঐ চুক্তিপত্রের শর্ত খারিজ হয়ে যাবে। উল্টে ভিনিসের আইন মোতাবেক খ্রিস্টান নাগরিক হত্যার চেষ্টার জন্য তোমার সব সম্পত্তি ক্রোক হয়ে যাবে। এমনকি যাবজ্জীবন কারদণ্ডও হতে পারে।

শাই ঃ অ্যাঁ:? (থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে)

গ্রাতি ঃ (লাফ দিয়ে ওঠে) : ও : পণ্ডিত বটে উকিল সাহেব!
কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ। এই না হলে সুবিচার।

ডিউক ঃ কাটলে রক্ত পড়বে না এমন আবার হয় নাকি?

শাই ঃ বেশ। তবে আমি টাকাটার ক্ষতিপূরণ নিয়ে কেরেস্তান অ্যান্টনীকে ছেড়ে দিচ্ছি। দাও ব্যাসানিও। ঐ ন' লক্ষ টাকাই দাও।

ব্যাসা ঃ এই তো টাকা (থলি বাড়িয়ে ধরে)

উকিল ঃ দাঁড়ান। ইহুদী সুবিচার চেয়েছিল, সে তাই পাবে। আর কিছুই না। ঐ এক পাউণ্ড মাংসই তার প্রাপ্য। যাও শাইলক। কেটে নাও তোমার মাংস। ঠিক মেপে এক পাউণ্ড। দয়ার সুযোগ তুমি পেয়েও নাওনি।
এখন তোমাকে ঐ চুক্তি পত্রই মানতে হবে। একটুও এদিক ওদিক যদি হয়, তোমার সব যাবে।

গ্রাতি ঃ সাবাশ সাবাশ! ওঃ স্বয়ং সলোমন এসেছেন ধরাধামে।
মাইরি শাইলক, কী একখান দিয়েছিলে ডায়লগ।

উকিল ঃ কি ভাবছ শাইলক মশাই? যাও, নাও তোমার হকের ধন।

শাই ঃ আমার আসল টাকাটাই দিয়ে দিন তবে। চুপচাপ বাড়ি চলে যাচ্ছি আমি।

উকিল ঃ তা তো হয় না। সুবিচার চেয়েছিলে। তাই পাবে তুমি।

গ্রাতি ঃ দ্যাখ বেটা কেমন লাগে। মহাজন কুত্তা।

শাই ঃ দ্যাখো, এমনি বেয়াদবি করলে আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাকব না। চললাম বাপু, তোমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির সময় আমার নেই। মরুকগে, হতচ্ছাড়া অ্যান্টনী। ঈশ্বর ওকে পাপের শাস্তি দেবেন।

উকিল ঃ দাঁড়াও! দাঁড়াও! চললে কোথায়? মোকদ্দমা কি এতই সহজ? এ বড় জটিল মামলা। এই রাজ্যের কোন নাগরিকের জীবনহানির চেষ্টা করলে তার সব সম্পত্তি যায় ক্রোক হয়ে। অর্ধেক তার পাবে তোমার শিকার—অর্থাৎ আন্তোনিও। আর বাকী অর্ধেক জমা হবে রাজকোষে।

[শাইলক স্তম্ভিত!]

যাও, নতজানু হয়ে ডিউকের কাছে ক্ষমা চাও
যদি এ যাত্রা নিজের প্রাণটা ভিক্ষা পাও।

শাই ঃ (হতাশ) কি হবে আর বেঁচে?
সবই যদি যায়, যাক্ গা
কিসের আশায়ই বা থাকা
সবই যখন গেল পুরো কেঁচে?

গ্রা ঃ ওকে কেউ একটা দড়ি আর কলসি এনে দাও। ও ডুবে মরুক।

ডিউক ঃ আমরা খ্রিস্টান, হত্যাকে মনে করি পাপ
এ যাত্রা বাড়ি যাও বাপ
কি আর হবে কাঁটা ঘায়ে দিয়ে নুনের ছিটে?
ভবিষ্যতে যেন তোমার মুখ না দেখি আমি।
আন্তোনিওকে লিখে দিয়ে যাও তোমার যত দামী।
এবার বিদায় হও।
(টলতে টলতে শাইলকের প্রস্থান)

ব্যাসা ঃ বন্ধু উকিল সাহেব আপনার দয়ায় প্রিয় মিত্রের জীবন ফিরে পেলাম।
সেলাম—হাজার সেলাম।
যা এনেছি থলি করে ক্ষতিপূরণ বাবদ
সবই তুলে দিই আপনাকে একদম নগদ।

আন্তোনিও ঃ বন্ধু তোমার ঋণ জানি শোধ হবে না কোনদিন। কেনা রইলাম চিরদিন।

[টুপি খুলে মাথা ঝোঁকায়]

(ঘোষকের ভেঁপু বাদন, ডিউক সহ প্রহরীদের প্রস্থান)

— যবনিকা —

চরিত্র ঃ

১। ঘোষক (সূত্রধর)
২। পেয়াদা (ভিনিসের বিচার সভায়)
৩। ডিউক (বিচারক)
৪। শাইলক (ফরিয়াদী)
৫। আন্তোনিও (আসামী)
৬। ব্যাসানিও (ঐ বন্ধু)
৭। গ্রাতিয়ানো (ঐ বন্ধু)
৮। উকিল

পর্দা জুড়ে ও কার হাত?

প্রসেনজিৎ সিংহ (১৯৮৭)

বন্ধ কর, বন্ধ কর।

কালীপদ মহারাজ নীচের তলা থেকে নির্দেশ দিলেন উঁচু গলায়। বলা বাহুল্য, সেই ''গেল গেল'' উদ্বেগসমৃদ্ধ কণ্ঠে অদৃশ্য একটা এসওএস ছিল। যার অন্তলীন বার্তা 'উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট'।

কথা হল, এ তো ডেনকালির জঙ্গল নয়। প্রাচীন অরণ্যের বান্টু সর্দাররাও নেই যে বঙ্গ বাজিয়ে মেসেজ রিলে করবে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে। শেষে তা খুলি গুহায় পৌঁছবে। সেই নির্দেশ পেয়ে সেটা তামিল করার জন্য সময় অন্তত কিছুটা মিলবে। এ তো বিদ্যাপীঠের সভাগৃহ।

খুলিগুহায়, থুড়ি, প্রজেক্টার রুমে তখন কিট-কিট-কিট অনন্ত শব্দপ্রবাহ। সেলুলয়েডের রিল থেকে ফ্রেম বাই ফ্রেম আলোক প্রক্ষেপিত ছবি ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে পর্দায় ধাবমান। তৈরি হচ্ছে রূপোলি মায়া। আর প্রজেক্টারের পিছনে সেই সরল, সাদাসিধে মানুষটি।

কালীপদ মহারাজের বিপদ সংকেত কানে আসতেই একটু থতমত খেলেন তিনি। বুঝতেই পারলেন, রিয়্যাকশন টাইম বেশি নেওয়া যাবে না।

পর্দায় নায়ক-নায়িকার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে সবে। অবতারণাও বোধহয় বেশি বলা হল। উপক্রম হয়েছে মাত্র। নাকি এটাও বেশি! বেশ, বলা যাক ইয়ের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মাত্র। মানে, সংলাপে, আবহে, নায়ক-নায়িকার শরীরী ভাষায় ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছিল রোম্যান্স।

সভাগৃহের বাঁদিকের আসনে বসেন আমাদের শিক্ষকদের মা-স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা। গুরুপল্লীর সেই সব সদস্য ভাবছিলেন, বিদ্যাপীঠ সাবালক হল বুঝি! সভাগৃহের সংখ্যাগুরু যারা, সেই পড়ুয়াদের মধ্যে উশখুশ শুরু হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। কনুই ঠেলাঠেলি...ফিকফিক হাসি। আর অপেক্ষা... একটু নিষিদ্ধ কিছুর জন্য।

পাশাপাশি একটা কুস্তিও চলছিল সমান্তরালে। খোলা হাওয়ার সঙ্গে নৈতিকতার। সেটা কালীপদ মহারাজের মনে। পর্দায় আসঙ্গলিপ্সার পারদ যত চড়ছে, নৈতিকতার বজ্রমুষ্ঠি তত কঠিন হয়ে বসছে খোলা হওয়ার গলায়। তুঙ্গমুহূর্তের আগেই সে কূপোকাৎ। নৈতিকতার হাতটিকে উঁচু করে মহারাজ জানিয়ে দিলেন খেলা শেষ। অতএব... বন্ধ কর বন্ধ কর।

এদিকে কালীপদ মহারাজের হঠাৎ নির্দেশে কিংকতব্যবিমূঢ় সেই মানুষটি। যাঁর নাম শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের শৈলেনদা। তড়িঘড়ি কী করবেন বুঝতে না পেরে খপ করে চেপে ধরেছিলেন লেন্সের মুখটাই। মুহূর্তের জন্য পর্দায় দেখা গেল মোটামোটা কালো আঙুল তার ফাঁক দিয়ে তখনও যেন রোম্যান্সের উকিঝুঁকি। সঙ্গে শব্দের সহযোগিতাও রয়েছে। এত বিশদে ব্যাখ্যা করলেও পুরো ব্যাপারটাই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের। এর পরেই জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে।

তিন দশক আগে বিদ্যাপীঠের এমন টুকরো স্মৃতিতে কতটা বাস্তব আছে আর কতটা আতিশয্য সে প্রশ্ন আপাতত মুলতুবি থাক। থাকুক শুধু মজার রেশটুকু।

আসলে বিদ্যাপীঠের আনাচে কানাচে এমন অনেক বিস্মৃতপ্রায় চরিত্রেরা রয়ে গিয়েছেন, বহু মজার স্মৃতি তৈরি হয়েছে বছরে বছরে। সবকিছু সামনে আসেনি।

এই মানুষগুলোর নিঃস্বার্থ নিবেদন এই আবাসিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিতে নিঃশব্দে যোগ করেছে মাধুর্য।শৈলেনদা

তেমনই একটা নাম।

আমরা ছাত্ররা শৈলেনদাকে যতটুকু জেনেছি, তা ওই প্রজেকশন রুমের সর্বেসর্বা হিসাবেই। কিন্তু তার বাইরে শৈলেনদার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানা গেল তাঁর ছেলে মেয়ে এবং সে সময়ের সংশ্লিষ্ট কারও কারও কাছ থেকে।

শৈলেনদা আদতে বারুইপুরের মানুষ। তাঁর বাবা ছিলেন ডাকবিভাগের কর্মী। তন্ত্রসাধকও। পৌরোহিত্যও করতেন। সেই উত্তরাধিকার শৈলেনদাও বহন করেছেন। বিদ্যাপীঠের বিভিন্ন পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব তো বটেই, মঠ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁর ডাক পড়ত এই কাজে দক্ষতার জন্য। নীরব কর্মী হিসেবে সেই দায়িত্ব বহন করেছেন।

১৯৩২ সালে জন্ম। শৈশব কেটেছে বারুইপুরে। কর্মজীবনে ১৯৬১ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন বিদ্যাপীঠের করণিক হিসাবে। বসতেন সেন্ট্রাল অফিস, দেবযানে। আজীবন সেই কাজ করেছেন। তবে সেটা ছিল বিদ্যাপীঠে তাঁর বহুপ্রসারিত কর্মকাণ্ডের একটা অংশ মাত্র। আসলে কোনও দিনই তিনি ১০-৫টার কর্মী ছিলেন না। বিদ্যাপীঠের নানা কাজেই তাঁর উৎসাহ ছিল।

শুধু বিদ্যাপীঠেই নয়, আশপাশের গ্রামে তাঁকে দেখা যেত সিনেমা দেখানোর সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছে যেতে। সন্ধেবেলা সিনেমা দেখিয়ে অনেক রাত হয়ে যেত বিদ্যাপীঠে ফিরতে। শুধু তিনি একা নন, সঙ্গে থাকতেন বিদ্যাপীঠের গাড়ির চালক সুধন্যদা, জাগরণদারা। এ ছাড়া জেনারেটর, প্রজেক্টর, পর্দা, সিনেমা দেখানোর যাবতীয় জিনিসপত্র। একবার ফেরার পথে ডাকাতের হাতেও পড়েছিলেন। সে বার জেনারেটর সেট সমেত বহু কিছু কেড়ে নিয়ে যায় তারা। শৈলেনদাকেও মারধর করে। সেই অবস্থায় কোনওক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে থানায় পৌঁছন তাঁরা। এ ছাড়াও বিদ্যাপীঠের প্রতিনিধি হয়ে খরাকবলিত পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পৌঁছতেন শৈলেনদা।

বিদ্যাপীঠে নিজের কাজের বাইরে যা করেছেন সে সবকিছুরই শিকড় প্রোথিত তাঁর শৈশব কৈশোরে পুজোআচ্চার উত্তরাধিকার তো বটেই, এমনকি এই সিনেমা ঘরের মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে তাঁর ভূমিকার পিছনেও প্রথম জীবনের ভূমিকা রয়েছে। প্রথম যৌবনে বারুইপুর শো হাউসে কাজ করতেন তাঁর কয়েকজন বন্ধু। তাঁদের সঙ্গে থেকে থেকেই ফিল্মের ক্যান থেকে স্পুলে তোলা, প্রয়োজনে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার কৃৎকৌশল শিখেছিলেন। সেই বিদ্যা পরবর্তা সময়ে কাজে লেগে যায়। বিদ্যাপীঠে যখন একটি অডিয়োভিসুয়াল ইউনিট চালু হয়, অভিজ্ঞতার কারণে তিনি অগ্রাধিকার পান। আর বর্ষে বর্ষে ছাত্রদের কাছে সেই সুবাদেই গড়ে ওঠে মানুষটির বিশেষ পরিচয়।

তবে শৈলেনদা বিদ্যাপীঠে চাকরি পেয়েছিলেন, সুন্দর হাতের লেখার জন্য। হিরণ্ময়ানন্দজীই তাঁকে বহাল করেছিলেন। শৈলেনদা অবসর নেন ১৯৯২ সালে।

তার পরেও তিনি আশ্রমকর্মী হিসেবে কাজ করে যান আজীবন। ২০০৩ সালে বিদ্যাপীঠেই তাঁর জীবনাবসান হয়। সেদিনও তিনি বিদ্যাপীঠেই ছিলেন।

বিদ্যাপীঠে তাঁর চাকরির একটা প্রেক্ষাপটও আছে। যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঠিক আগের বছর তাঁর বিবাহপর্বটি।

শৈলেনদার দাদা ছিলেন পুরুলিয়ার জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। আর পাত্রীর দাদা ছিলেন পুরুলিয়া শহরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন শহরে। তা এই দু'জনের সখ্য গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। আবার এই দুজনের সংযোগ বিন্দু ছিলেন হিরণ্ময়ানন্দজী। সখ্য পরিণতি পায় আত্মীয়তায়। পরের বছরই হিরণ্ময়ানন্দজী চাকরি দেন সেদিনের ঘরপালানো যুবক শৈলেনদাকে। বিদ্যাপীঠে শুরু হয় তাঁদের দাম্পত্য।

হ্যাঁ, শৈলেনদার ছিল বাড়ি থেকে পালানোর 'ব্যামো'। মাঝে মাঝেই নিরুদ্দেশে পাড়ি দিতেন। এমনকি, পালিয়েছিলেন বিয়ের আগেও। শেষটায় তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ দাদুর তিরস্কারের ভয়ে বাড়ি ফেরেন। বসেন বিয়ের পিঁড়িতে।

সে রকমই একবার পালিয়ে গিয়ে নাম লেখালেন যাত্রাদলে। বাঁশি বাজানো শিখলেন দলের মাস্টারের কাছে। অভিনয়ও। পরে বাড়িও ফিরলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন বাঁশি। বিদ্যাপীঠে যাঁরা তাঁর বাড়ি গিয়েছেন, লক্ষ্য করেছেন বাঁশির ঝোলাটি। পরবর্তীকালে সেই বিদ্যাও কাজে লেগেছে। বিদ্যাগীঠের নাটকে অভিনয় করেছেন। যদিও তা আমাদের স্মৃতিতে নেই। সম্ভবত সেটা বিদ্যাপীঠের গোড়ার যুগের কথা।

সে সময়টা হয়ত এমনই ছিল খানিকটা। পাড়ায় দু'একটা কান্তবাবু থাকতেন। গভীর রাতে যাঁদের কর্নেটে গুঞ্জরিত সিন্ধুবারোয়াঁর সুর রসসিক্ত করে রাখত মহল্লা। দু'একটা অভিভাবকসুলভ জ্যাঠামশায় কিংবা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো দু' একটা চরিত্র যাঁদের উপস্থিতিতে বর্ণময় হয়ে উঠত সামাজিক পরিমণ্ডল। এখনকার মতো ছাঁচে ঢালা 'ভাল মন্দ'র এমন মেরুকরণে সাদা-কালো হয়ে যায়নি। দারুণ অর্থকরী কিছু না করলেও সেযুগে জীবন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে বলে ভাবা হত না। এমনই এক সামাজিক প্রশ্রয় আর গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

সে সময় শৈলেনদার বাঁশি সুন্দর কিছু মুহূর্তের জন্ম দিয়েছে। গরমের দিন। তায় রাতে লোডশেডিং। গুরুপল্লীর অধিকাংশ শিক্ষকদাদারা বিছানায় ছটফট করছেন। ভারী চেহারার শৈলেনদাও তাই। কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসতেন। কোনও খোলা জায়গায় বসে শুরু করতেন বাঁশি বাজাতে। কখনও কখনও সাক্ষী থাকত স্বচ্ছ নিষ্কলুষ আকাশের স্পৃহণীয় চাঁদ, গ্রীষ্মের পুরুলিয়ার প্রচণ্ড সূর্যের খেল খতম করে যার স্বপ্নমায়া শুরু হয়েছে। সেই নরম জ্যোৎস্নায় গুরুপল্লী হয়ে উঠত অলৌকিক, পরাবাস্তব এক অচিনপুর। গভীর রাতে গুরুপল্লীর বাতাসে ভাসত শৈলেনদার বাঁশির সুর। গুটিগুটি পায়ে বেরিয়ে আসতেন শিক্ষকদাদারা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতেন তাঁকে ঘিরে। গুরুপল্লির সহজ সরল দিনগুলোয় ভিন্নতর মাত্রা যোগ করত শৈলেনদার মিঠে বাঁশি। গুরুপল্লীর অনেক পুরনো বাসিন্দার মনে চিরদিনের মতো ভাস্বর হয়ে আছে বিদ্যাপীঠের সেই ছবি।

লেখক বর্তমানে আনন্দবাজার অনলাইনের চিফ সাব এডিটর পদে কর্মরত। সংবাদ সম্পাদনা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখেন নিয়মিত। আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, দেশ, সানন্দা, আনন্দমেলার মতো বিভিন্ন অগ্রগণ্য পত্রিকায় বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছেন।

পরশমণি

চিরন্তন কুন্ডু (১৯৮৮)

অন্তর্জালের দৌলতে মনোবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক গবেষণার কথা পড়েছিলাম যাতে দেখা যাচ্ছে মানুষের কাছে সদর্থক খবরের চেয়ে নঞর্থক খবরের অভিঘাত অনেক বেশি। ক্ষতিকারক জিনিস সম্পর্কে আমাদের সতর্ক রাখার জন্য মস্তিষ্ক নাকি নঞর্থক জিনিসপত্রকে বেশি ওজন দিয়ে থাকে। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অনেক। এমনকি সুস্থ দাম্পত্য বজায় রাখতে নাকি একসঙ্গে কাটানো ভালো সময় আর খারাপ সময়ের অনুপাত সমান হলে চলবে না, যেহেতু খারাপ সময়কে মস্তিষ্ক অনেক বেশি গুরুত্ব দেবে, তাই ভালো সময়কে হতে হবে খারাপ সময়ের অন্ততঃ পাঁচগুণ।

তাই যদি হয়, মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রবণতাই যদি হয় নঞর্থক ঘটনায় বেশি প্রভাবিত হওয়া, ভারসাম্য বজায় রাখতে মস্তিষ্ককে তাহলে যথেষ্ট পজিটিভিটির জোগান দেওয়া দরকার। এই জোগান দেবার এক অন্যতম উৎস হতে পারেন বিবেকানন্দ। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। দীর্ঘ দিনের 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতে— *'বুদ্ধদেব তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই মর্মে উপদেশ দিয়াছিলেন তোমরা, নিজেই নিজের আলোক হও, নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের মোক্ষ সাধন কর। বিবেকানন্দও ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা বিফল হয় নাই'*। স্বামীজীর অন্তরঙ্গদের অন্যতম জোসেফিন ম্যাকলাউডের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী - *"When I met the Czar of Russia, I felt, how great he is, and how small am I! But when I met Vivekananda, I felt, how great he is, and how great am I!"* রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই। অনেকেই এ বিষয়ে একমত হয়ে নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে একটু কম পরিচিত একটি বক্তব্য পান্নালাল দাশগুপ্তের। পান্নালাল দাশগুপ্ত এককালে সশস্ত্র বিপ্লবের পথের পথিক, দমদম-বসিরহাটে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার অংশীদার, পরবর্তী জীবনে এই বামপন্থী মানুষটি গান্ধীর আদর্শে গ্রামসংগঠনের কাজে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। বোলপুরের 'আমার কুটির' নামক সংগঠনের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। কী বলছেন তিনি? সরাসরি তাঁর লেখা থেকে দেখা যাক।

"যে-সময়ে বিবেকানন্দ এসেছিলেন সে সময়ে মোটামুটি ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে একটা আশাবাদ বিরাজ করতো। সে উনিশ শতকের অপটিমিজম দেখিয়ে ছিল বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ দেখিয়ে ছিল বিজ্ঞান আমাদের সমস্ত রকম দুরবস্থার নিরসন করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর কর্মবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ এত বলিষ্ঠ ছিল যে সে বলিষ্ঠতা আজকের দিনে পৃথিবীতে কোথাও দেখতে পাইনে। আজকে ভয়াবহ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে পারমাণবিক বোমা। দেখা যাচ্ছে যে গণতন্ত্র মানুষের মধ্যে সেই উদারতা সৃষ্টি করতে পারে নি। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও সাম্প্রদায়িকতা কালো-সাদায় ঝগড়া। বহুরকমের বহু কিছু অত্যাচার আমরা এখনও দেখতে পাই। এমনকি সমাজতন্ত্র এলে সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে—এ ধরনের চিন্তাও আজকের দিনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। এটাই যখন আমরা সচরাচর দেখছি তখন কখনও কখনও মনে হয় যে এতদিন ধরে যে আমরা রাজনীতি করলাম, এইযে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা গেল, যে গণতান্ত্রিক অধিকার বা সাম্যবাদের জন্য আমরা এত কিছু করেছি তার পরেও এরকম অসহায় অবস্থা যখন এসে পড়ে তখন যত কিছু নীতি বা মতবাদ সম্বন্ধে একটা সন্দেহ স্বভাবতই এসে যায়। আমি এটা হয়তো জোর করে বলতে পার ১৫-২০ বছর আগে এই সমস্ত মতবাদী রাজনীতিকেরা যতটা আত্মবিশ্বাসী

ছিলেন আজ আর ভেতরে ভেতরে তাঁরা ততটা আত্মবিশ্বাসী নন। তাতে এমন একটা নৈরাশ্য দেখা যায় যে মানুষের আদর্শের বুঝি কোন দাম নেই! বুঝি এই সমস্ত মতবাদ মানুষের কোন একটা শৌখিনতা মাত্র—সমস্তই একটা বিনষ্টির দিকে এগিয়ে চলেছে।

এমন দিনেও আমি আমার নিজের মনের দিকেও তাকিয়ে দেখি যে আমি কিন্তু একটা নৈরাশ্য বোধ করি না। কেন বোধ করি না, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দিতে পারবো না। লেনিনিজম, স্তালিনিজম, মাওবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কমিউনিজম যেন নিজের মধ্যে একটা সংকটে পড়ে গেছে। এর অন্তদ্বন্দের পাকে পড়ে আদর্শপ্রবণ ব্যক্তি ভাববেন যে এই সমস্ত কিছুরই বুঝি কোন দাম নেই এবং মানুষেরও কোন ভবিষ্যৎ নেই। যার থেকে যা পাও কেড়ে নাও, যা পার লুটে নাও, যা পার ভোগ করে নাও-আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, এমনি একটা তাড়া যেন লেগেছে। ঠিক এমনি একটা পরিস্থিতির মধ্যেও আমার মনে কোন নৈরাশ্যের স্থান নেই। কেন নেই তার অন্তত একটা যুক্তিও দেওয়া যায়। আমার এই আশাবাদের পেছনে সেদিনের ছোটবেলাকার সেই বিবেকানন্দের কথাবার্তাগুলোই বর্তমান, যার থেকে একটা অনির্বান আলোর প্রেরণা মিলতো, হয়তো সেটাকে অর্থদীপ্ত করা যেতো না। এই যে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বাণী যে তোমরা "অমৃতের সন্তান' একথাটা ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকে উপলব্ধি করি। এই যে Assertion- যা বলে 'Man has a Mission'—মানুষ কখনো শেষ হয়ে যেতে পারে না, মানুষের অস্তিত্বের একটা মূল্য আছে—এর অর্থ আছে। মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদাবোধ এই কথাগুলি দ্বারা সেদিন কৈশোরে আমার চরিত্র বা আমার মৌলিক চিন্তা যদি condition না হত, সেদিন আমার জীবনের উষালগ্নে ছোট বেলায়-শোনা স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথাগুলো যদি উজ্জ্বল হয়ে না থাকতো শুধু দিন-রাত দেশের প্রচলিত রাজনীতির উপর নির্ভর করে যদি আমার রাজনীতির /ভিত্তি ও মানসিক বিশ্বাসকে গড়তে যেতাম তবে মনে হয় যে এই অপটিমিজম আমি রক্ষা করতে পারতাম না। আরও কাজ করবার মত কোন নির্দেশিকাও খুঁজে পেতাম না। এই অর্থে আমি বলি যে আমি কীভাবে দেখি অত ভাল করে চিন্তা করে কখনও দেখিনি কিন্তু আমি জানি যে আমার অগোচরে আমার মতো এমন অনেককেই তাঁর বাণী তাঁর আইডিয়া এইভাবে প্রভাবিত করে একটা ইনস্পিরেশন সৃষ্টি করে রেখেছিল, আমাদের ভাবদিগন্তে কম্পাসের মতো কাজ করেছিল।"

বিবেকানন্দ কীভাবে আপাত-দুঃসময়েও মানুষকে শক্তি জুগিয়ে যেতে পারেন সেটা এখানে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর জীবন ও বাণীর এই সঞ্জীবনী শক্তি রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, তাঁর সশ্রদ্ধ উচ্চারণ— *"আধুনিককালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি- দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে।"* আম্বেদকর যে বিবেকানন্দকে ভারতের বিগত কয়েক শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে অভিহিত করেন, তার পেছনেও এটি একটি সম্ভাব্য কারণ।

পান্নালাল দাশগুপ্তের এই লেখা ১৯৭১ সালের। আরো সাম্প্রতিকে আসি। ১৮৯৪ সালে বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন- "I want to be a voice without a form." (অরূপ তোমার বাণী?— এইখানে একটু প্রসঙ্গ পালটে এই গানটি নিয়ে সাহিত্যিক শংকরলাল ভট্টাচার্যের একটি স্মৃতিকথা উল্লেখ করার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। শংকরলাল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'আমার গানের স্বরলিপি'র সম্পাদনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক স্মৃতিকথার অংশটি—"হাতা গোটানো, সাদা ফুল শার্ট আর ধুতিতে মঞ্চে উঠে এলেন কিছুদিন আগে তাঁর "বিশ সাল বাদ" ও "কোহরা' ছবি হিট হওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এবং টেবিলে রাখা হারমোনিয়ামে খানিক আঙুল চালিয়ে ধরে নিলেন রবীন্দ্রসংগীত "অরূপ তোমার বাণী"। ওঁর ওই অপুর্ব টেনর-ব্যারিটোন কণ্ঠস্বরে যে কী এক

নিবেদন, সেদিনটা এখনও ভুলিনি। এবং ততক্ষণাৎ ওঁর আধুনিকের ফ্যান আমাকেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত করে ফেলল। বিশেষ করে গাইছেন যখন ''নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি''। কেন জানি না আমার মনে হতে শুরু করেছে রবীন্দ্রনাথ যেন গানটা লিখেছেন সন্ন্যাসী যোদ্ধাকে মনের সামনে রেখেই। বহুদিন পর হেমন্তবাবুর সঙ্গে যখন ওঁর জীবনী লেখার কাজ করছি তখন ভীষণ খুশি হয়ে শিল্পী বলেছিলেন, ''তা-ই? মহারাজ বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই গানটাই মনে এসেছিল। কথাগুলোর জন্যই হয়তো স্বামীজিকে মনে আসে। বিবেকানন্দর বাণীর কথাই তো বলা হয়।'') শরীর যাওয়ার পরেও তাঁর বাণীমূর্তি মানুষকে আজ একশো বছরের ওপর প্রাণিত করে চলেছে। তার এক সাম্প্রতিক উদাহরণ অরুণিমা সিংহের জীবন। অরুণিমা জাতীয় স্তরের ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। ২০১১ সালের এপ্রিলে উনি ট্রেনে লখনৌ থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। ট্রেনে একদল ডাকাত ওর সোনার চেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে উনি বাধা দেন। ডাকাতেরা চলন্ত ট্রেন থেকে ওঁকে ফেলে দেয়। সেই সময় পাশের লাইনে আসা অন্য একটি ট্রেনে ধাক্কা খেয়ে উনি লাইনে পড়েন। একটি পা তখন শরীর থেকে খুলে ঝুলছে। সাত ঘন্টা লাইনে পড়ে থাকবার পর গ্রামের লোকেরা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বেরিলি ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে অ্যানাস্থেশিয়ার সুবিধে না থাকায় সেভাবেই চিকিৎসা চলে, হাঁটুর তলা থেকে ও'র একটি পা বাদ যায়। পরে এইমসে তাঁর চিকিৎসা হয়।

অরুণিমা কী করলেন? সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেন কি? পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে, কিন্তু হাসপাতালেই উনি সিদ্ধান্ত নেন ভলিবল নয়, এবার পর্বতারোহণ করবেন। এভারেস্টে উঠবেন। হ্যাঁ, এভারেস্ট। তারপর এই সংকল্প এক রূপকথার জন্ম দেয়। ২০১৩ সালের মে মাসে অরুণিমা সত্যিই এভারেস্টে ওঠেন এবং শুধু এভারেস্ট নয়, তারপর একে একে সবকটি মহাদেশের বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেন। অরুণিমা অনেকবারই বিবেকানন্দের কথা বলেছেন, বলেছেন কীভাবে তাঁর বাণী অরুণিমাকে শক্তি দিয়েছিল। আগ্রহীরা ইউটিউবে সেসব দেখতে পারেন। এভারেস্টের চূড়ায় অরুণিমা ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবি রেখে আসেন। অরুণিমা বলেছেন পথে সেই ছবি বারবার বের করে দেখা তার নিজের পক্ষে সহজ ছিল না, শেরপাকে বলতে হত বের করে দিতে। শেরপার প্রশ্ন ছিল - ''তু বারবার ইয়ে ফোটো কিউ দেখতি হো?'' অরুণিমার উত্তর - ''ইয়ে মেরা এনার্জি ক্যাপসুল হ্যায়।''

অতি স্বল্পায়ু জীবন, মহাপ্রয়াণও শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ এই সময়ে দাঁড়িয়েও এনার্জি ক্যাপসুল হিসেবে বিবেকানন্দের অস্তিত্ব এভাবেই বারবার প্রমাণ হতে থাকে। মনে হয় কী অমোঘই না ছিল বিবেকানন্দের উচ্চারণ —*"It may be that I shall find it good to get outside of my body—to cast it off like a disused garment. But I shall not cease to work! I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God."*

লেখক সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ

রাজীব বারিকের রেডিও

বিশ্বজিৎ রায় (১৯৯৩)

ক্লাস 'সেভেন এ''-র রাজীব বারিকের একটা রেডিও ছিল। ছোটো, বহনক্ষম। হোস্টেলের চৌকির ডালার তলায় রাখা ট্রাঙ্কের জামা-কাপড়ের আবডালে অনায়াসে রেখে দেওয়া যেত তাকে। কখনও কখনও যখন ব্রহ্মচর্যবায়ুগ্রস্ত সুদৃঢ় ওয়ার্ডেনের নির্দেশনামা মেনে টহলদার কর্তৃপক্ষের সেবায়ত সহপাঠীরা ট্রাঙ্ক চেক করার কাজে হাত দিত তখনও সেই হিন্দিগান শোনানো নিষিদ্ধ রেডিও তাদের চোখে পড়ত না। রাজীব বারিককে আমরা কেউ কেউ রাজীব ব্রিক বলতাম। রোগা লম্বা অঙ্ক-কুশল রাজীবের বাড়িতে বামপন্থার সুর সতেজ ছিল। আটের দশকের শেষ তখন - বামেদের সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপে, রাশিয়ায় দলগত বামপন্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোস্টেলে 'গণশক্তি' নিয়ে নানা খুচরো কৌতুক পাক খাচ্ছে। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই একঘেয়ে ভক্তিগীতি কবলিত কানে যখন রথীন ঘোষাল তার পারিবারিকতার সুত্রে শেখা গণ-সংগীতে কিম্বা সুকান্তের দীর্ঘ কবিতায় মুখর হত তখন আমাদের মন জ্যোতি বসু ও বঙ্গজ বামেদের জগৎ থেকে অন্য এক সাম্যের কথায় উদাস হয়ে যেত।

আর আমাদের মন উদাস করে দিত রাজীব বারিকের রেডিও। ইতি-উতি খবর মেলে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওয়াকম্যানের অধিকারী। সেই ব্যক্তিগত ওয়াকম্যান অবশ্য যার, একান্ত তারই। তা গণভোগে লাগে না। সাম্যের প্রথা মেনে তা মালিকের কান ছেড়ে সহপাঠীদের কানে উপনীত হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় আটক থেকে সেই ওয়াকম্যান হোস্টেলে রাতের থার্ডবেল পড়ে গেলে কেবল মালিকের কানেই সরব হয়। ক্যাসেট ভর্তি গানের উপভোক্তা সে এবং কেবল সে। রাজীব বারিকের রেডিও কিন্তু শুধু রাজীব বারিকের নয়-সে আমাদেরও। পাশ্ববর্তী ঘরে যাওয়ার অধিকার ছিল তার। কেবল বারিককে জানাতে হত। একা একা গান শুনবে এমন মালিকানায় অভ্যস্ত ছিল না সে। এক একদিন এক একজন ধার নিয়ে যেত সেই গান শোনার যন্ত্র। গান শুনে মাত্র নয়, গান শুনিয়েও যে বড়ো সুখ। একান্ত ভোগেই মাত্র সুখ নয়, ভোগের আনন্দ ভাগ করে নিয়েও সুখ। তাই ওয়াকম্যানের বুর্জোয়া পন্থা অতিক্রম করতে পেরেছিল বর্ধমানের রাজীব বারিকের রেডিও।

সে রেডিওতে আমরা অবশ্য গণ-সংগীত শুনতাম না। রাত ঘন হয়ে উঠত। থার্ড বেল পড়ে যাওয়ার পর পুরুলিয়ার বোঙাবাড়ির রামকৃষ্ণ মিশন অনেক শব্দ হারিয়ে ফেলত - আবার জাগিয়েও তুলত অনেক শব্দ। দূর থেকে শোনা যেত ধামসা-মাদলের ডাক। আর কাছের রেডিওতে হালকা স্বরে গেয়ে উঠত বিবিধ ভারতী। হিন্দি ছবির গানের সুর ভর করত আমাদের কানে। তখন আমির খান, সলমন খান উঠছেন। অমিতাভ বচ্চন তাঁর অ্যাংরি ইয়াং ম্যান ইমেজ হারাচ্ছেন। বয়স হয়েছে তাঁর সে-কথা ভুলে মারমুখী নায়কের রোলে তাঁকে বসানো হচ্ছে বটে কিন্তু কলকে পাচ্ছেন না। রাজীব বারিকের রেডিও অবশ্য এতো কিছু ভাবত বলত না-সে বাজত বিবিধ ভারতীর খেয়ালে। আর আমরা সেই বয়ঃসন্ধি পর্বে আমির খানের 'ক্যয়ামত সে ক্যয়ামত তক'-এর গান শুনে স্বর্গসুখ লাভ করতাম। হলুদ সর্ষে ক্ষেত, জুহি চাওলা, বাইক বাহিত আমির খান-এসবের সঙ্গে সাম্যবাদের কোনও যোগ ছিল না কিন্তু মনের মুক্তির যোগ ছিল। শ্যামা মাকি আমার কালো রে' কিম্বা মন চল নিজ নিকেতনে' গান হিসেবে এসবের ভাব গভীর, কিন্তু মানুষের মন, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির মন, কেবল গভীরে ডুবতে চায় না অগভীরে ভাসতেও চায়। পরমহংস এসব জানতেন। কৌতুক করে বলতেন তাঁর ভক্ত ছোকরা শিষ্যদের মাঝে মাঝে তিনি আঁশজল দেন, তাদের সঙ্গে ফিস্টনষ্টি করেন। রাজীব বারিকের রেডিও আমাদের সেই আঁশজল, ঠাকুরের ফস্টি-নষ্টি। আমাদের বশে

থাকা জীবনে অহেতুক রস।

তখন আমরা দর্শনসুখে বঞ্চিত ছিলাম বলে, এমনকী টিভি-ও দেখতে পেতাম না বলে, কানই হয়ে উঠেছিল আমাদের চোখ। রবি ঠাকুর তাঁর ‘‘মানুষের ধর্ম’ লেখায় নাক-কানকে ইন্দ্রিয় হিসেবে চোখের থেকে খাটো করে দেখেছিলেন। দেখার সুখ কানের শোনায় কিম্বা ঘ্রাণের টানে মেলে না বটে কিন্তু যখন দেখার উপায় থাকে না তখন নাক আর কানই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। শনি আর মঙ্গলবার আমাদের ডাইনিং হলে যখন মাংস রান্নার গন্ধ উঠত জেগে তখন নাকে-লাগা সেই সুঘ্রাণ প্রাত্যহিকের বাইরে নিয়ে যেত আমাদের। রাতে রাজীব বারিকের রেডিও হয়ে উঠত আমাদের আলোছায়া বয়সের ভেলা।

রেডিও তো আর এমনি এমনি চলে না-সে চলে ব্যাটারিতে। ব্যাটারি ফুরোয়, যেমন ফুরোয় অনেক কিছু। ফুরোলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারি ভরার উপায় ছিল না আমাদের। ফলে অনেক সময়েই আমাদের সেই সকলের রেডিও হয়ে উঠত নীরব, গানহারা! তখন থার্ডবেল পড়ে গেলে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। আমাদের ঘুমের মধ্যে মাঝে ভর করত রেডিও - স্বপ্নময় ঘুমে রেডিওর পেটের মধ্যে জেগে উঠত অফুরন্ত ব্যাটারি। ঠিক যেন মধুসুদন দার দই-এর ভাঁড়। রামকৃষ্ণ বলতেন মধুসুদনদার ভাঁড়ের দই ফুরোয় না। আমাদের স্বপ্নের রেডিওতেও ব্যাটারি ফুরোত না।

সময় ফুরোয়। দিন যায়। রাজীব বারিকের রেডিও থাকে, ঠিক থাকে। তার শরীরে গান, তার পেটে অফুরন্ত ব্যাটারি, তার চোখে স্বপ্ন—সে সকলের কাছে পৌঁছতে চায়, মালিকানাহীন। দলচারী সাম্যের কাণ্ডারী কিম্বা ঐকান্তিক মালিকানার পূজারী রাজীব বারিকের রেডিওকে চিনতেই পারে না।

লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

ইস্কুলবেলার শারদীয়া

অভিষেক চ্যাটার্জী (১৯৯৭)

আমাদের ইস্কুলবেলার বাংলা পরীক্ষায় খুব চালু একটা রচনার বিষয় ছিল "তোমার প্রিয় ঋতু"। অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে আমাদের অনেকেই এই বিষয়টাই বেছে নিত কারণ, কল্পনার বেলুন ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নিতে পারলে মোটামুটি জুতসই কিছু একটা দাঁড়িয়ে যেত। ষড়ঋতুর সমারোহে শরতের সমাদরের কারণটা সহজবোধ্য - এই ঋতু নিয়ে লেখার উপকরণ প্রচুর। দুর্গাপুজো তো আছেই, সঙ্গে আরও কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ অনিবার্য। শরত মানেই নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘ, সবুজ মাঠে কাশের গুচ্ছ এলোমেলো করে দেওয়া উতলা হাওয়া কিম্বা "শেফালীবনের মনের কামনা"-র খবর বয়ে আনা মৃদু গন্ধে মন কেমনকরা ভোর। শরত মানেই মাসের শেষে গম্ভীর বাবার মুখে দরাজ হাসি, জড়োসড়ো মায়ের মুখে হঠাৎ সুরেলা গুনগুন আর শারদসকালে নতুন পোশাকে কাউকে দেখতে পাওয়ার অপেক্ষায় কিশোর-কিশোরীর বুকে দুরুদুরু কাঁপুনি।

নস্টালজিয়ায় জিয়া নষ্ট হয়, তাই ধান ভানতে গাজীর গান হল অনেকক্ষণ। প্রকৃত প্রস্তাবে শরত আমাদের প্রিয় ঋতু ছিল কিনা, সেটা কিন্তু গবেষণার দাবী রাখে। লেখাপড়ার সুত্রে গরমের ছুটির পর থেকে পুজোর ছুটি পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময় আমাদের ঘরছাড়া হয়ে কাটত। কলকাতা থেকে প্রায় তিনশ কিলোমিটার দুরের বিদ্যাপীঠে বিদ্যার বোঝা পিঠে বেঁধে দিন গুজরান হত আমাদের। প্রত্যন্ত এক গ্রামের নির্জন প্রান্তরের বুকে (যা কিনা একসময়ে শ্মশান ছিল, এমনটাই জনশ্রুতি) প্রকান্ড রাজকীয় মহল্লার মত সেই ইস্কুলে কোনও রাজকুমারী সোনার কাঠি-রুপোর কাঠির মায়াবী রূপকথা সাজিয়ে ঘুমিয়ে থাকত না (গুরুপল্লী হিসেবের বাইরে)। ঘুমের প্রসঙ্গে বরং মনে পড়ে সন্ধেবেলা ধীরলয়ের ইমণ-কল্যাণে বাঁধা প্রার্থনা সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ভব-বন্ধন খন্ডন করে ঢুলতে থাকা সারি সারি হা–ক্লান্ত কিশোরের মুখ। আমাদের ইস্কুলের সীমানা ঘেঁষে চলে গেছে চক্রধরপুরগামী রেললাইন। ইস্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই আমরা সেই রেললাইন স্পষ্ট দেখতে পেতাম। ভারতীয় রেলের দুয়োরানি এই রুটে তখনও স্টিম ইঞ্জিনের রেলগাড়ি চালানোর বন্দোবস্ত ছিল। সেই রেলগাড়িতে বিজ্ঞানের জাঁকজমক ছিল না ঠিকই কিন্তু, একটা স্মৃতিমেদুরতা ছিল। আমাদের ইস্কুল যেখানে, ছোটনাগপুর মালভূমির সেই অঞ্চলে বর্ষার দাপট ছিল না, অল্পসল্প বৃষ্টি হত। তবু মাঝেমধ্যে জলে টইটম্বুর মেঘের ছায়া পড়ত বিকেলে খেলার মাঠে। কোনও মেঘলা বিকেলে যখন স্টিম ইঞ্জিনের রেলগাড়ি বাঁশী বাজিয়ে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যেত, টের পেতাম চারপাশের হাওয়া মনখারাপে ভারী হয়ে উঠছে। পায়ের ফুটবল মিসপাসে গড়িয়ে যেত ভুল ঠিকানায়।

বিষণ্ন বর্ষার রেশ মুছে দিতে রুক্ষ লালমাটির বুকে সবুজের আয়োজন নিয়ে শরৎ এসে ঝাঁপি খুলে বসত। সঙ্গে নিয়ে আসত নীল আকাশ, ভোরের শিশির, কাশের গুচ্ছ বা শিউলি ফুল। কিন্তু, সেসবের দিকে তাকানোর অবকাশ থাকত না। কারণ, শরত তার সঙ্গে নিয়ে আসত হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার বিভীষিকাকেও। সে স্ফিংসের মত গ্যাট হয়ে বসে থাকত আমাদের আর পুজোর ছুটির মধ্যিখানে। পরীক্ষার সব প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দিলে তবেই ছুটির দেশে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যাবে। বাংলা বোর্ডের পরীক্ষা মানেই মগজের সঙ্গে বিনামূল্যে হাতের ব্যায়াম। চিরকাল শুনেছি দিল্লি বোর্ড মানেই খুচরো প্রশ্নের কারবার, দেদার নম্বর। অন্যদিকে বাংলা বোর্ড মানেই গায়েগতরে শক্তিশালী উত্তর। সেইসব নধর গঠন উত্তর লিখতে গিয়ে আমাদের গলদঘর্ম অবস্থা হত। এদিকে নম্বর দিতে গেলে শিক্ষকেরা এমন ভাব করতেন, মনে হত ঠকিয়ে বা ভয় দেখিয়ে সম্পত্তি লিখিয়ে নিচ্ছি।

বাংলা পরীক্ষায় রবি ঠাকুরের "অসন্তোষের কারণ" ছিল আমাদের ঘোর অসন্তোষের কারণ। তাঁর লেখা মানেই

নামকরণ থেকে শুরু করে দাঁড়ি-কমার সার্থকতাও প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে। প্রত্যেকটা কথাই বাণীর মত। সেইসব বাণী থান ইট হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ছাত্রছাত্রীদের ঘায়েল করে চলেছে। আমরাও ছাড়ার পাত্র ছিলাম না। ওঁর প্রত্যেকটা ইটের জবাবে আমাদের পাটকেলপ্রতিম উত্তর তৈরী ছিল। আহা! সেসব যে কি অবিশ্বাস্য অ্যানালিটিকাল আবর্জনা! ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। এসব উত্তর পড়ে নম্বর দিতে রীতিমতো কলজের জোর লাগে! তার চাইতে বরং ইংরেজি ভালো ছিল। কম্যুনিস্ট সরকারের আমলে বাংলা বোর্ডে ইংরেজিকে অচ্ছুত করে রাখা হয়েছিল। কাজেই, ইংরেজি বইয়ে কিছু নিকৃষ্ট গদ্য-পদ্য পড়েই মাধ্যমিক অবধি কাটিয়ে দিয়েছি। পাঠ্য থেকে বাঁধা গতে প্রশ্ন আসত আর তার উত্তর দেওয়ার সময় ভাষার ওপর দখল দেখানোর কোনও সুযোগ বা দায়িত্ব কোনওটাই থাকত না। আমাদের ইস্কুলের ইংরেজীর শিক্ষকেরা বেশ ডাকসাইটে ছিলেন। এইসব পাঠ্য পড়াতে গিয়ে তাঁদের হতোদ্যম চেহারা এখনও চোখের সামনে ভাসে। কেলেঙ্কারি হত ইতিহাস পরীক্ষার দিন। পাতার পর পাতা লিখে কাশীদাসী মহাভারত সাইজের কিছু একটা বানিয়ে জমা দিতে না পারলে স্বস্তি নেই। আশপাশ থেকে কাউকে বাড়তি পাতা নিতে দেখলেই উদ্বেগ। পরীক্ষার শেষে দশ-কুড়িটা বাড়তি পাতা যারা নিয়েছে, তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে মাত্র চারটে বাড়তি পাতা নিয়েছে, তার চোখেমুখে ফেল করার আতঙ্ক। একবার প্রশ্ন পেয়েছিলাম - আলাউদ্দিন খিলজির শাসনব্যবস্থা। আমি হতবাক। পদ্মিনীর সঙ্গে সস্তা হিন্দী ফিল্মের আগমার্কা গা-জোয়ারী প্রেম ছাড়া ওর আর কোনও ব্যাপারে যে উৎসাহ ছিল, এটা আমি কেন, খিলজীর মা'ও বিশ্বাস করতেন না। এদিকে পড়ে গেছি শেরশাহের শাসনব্যবস্থা। কি করি - শুধু নাম বদলে হুবহু এক উত্তর লিখে দিলাম। ঐ উত্তর পড়লে খিলজীর মায়ের চোখে জল এসে যেত– ছেলে যে এত মহান, সেটা কোনওদিন টের পেতে দেয় নি! ভূগোল ছিল আমার ব্যক্তিগত বিভীষিকা। ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে একমাত্র ভরসা কন্যাকুমারী আর পারাদ্বীপ। একবার হায়দ্রাবাদের তিলক কেটেছিলাম হুগলীর কপালে। স্যার ভেবেছিলেন ভুল করে উল্টো ম্যাপ দেখছেন।

আইসল্যান্ড থেকে আন্টার্কটিকা– সর্বত্র শিল্পবিকাশের একটাই কারণ– সুলভ শ্রমিক। নব্বইয়ের দশকে যখন কাশ্মীরে প্রবল জঙ্গিহানা, সেই সময় একবার পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল 'পাকিস্তানের শিল্পবিপ্লব'। পরীক্ষকের রসবোধের প্রশংসা করতেই হয়!

যাই হোক, এমনি করেই একে একে সব বাধা উতরে শেষমেশ এসে ঠেকতাম অংক পরীক্ষায়। কেশব নাগ ছেলেবেলায় বোধহয় কখনো "প্রিয় ঋতু" রচনায় শরতকাল নিয়ে লিখে কম নম্বর পেয়েছিলেন। রাগে-দুঃখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বড় হয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের শরতকাল ছারখার করে দেবেন। এই প্রতিভাবান অঙ্কবিদ অক্ষরে অক্ষরে নিজের কথা রেখেছিলেন। তাঁর ষড়যন্ত্রেই আমরা আদার ব্যাপারী হয়েও কোনও অচেনা মুরুব্বি আর তার বিচিত্র পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের বয়স সংক্রান্ত জাহাজের খবর রাখতে বাধ্য হতাম। এছাড়াও চৌবাচ্চার দুটো নলই একসঙ্গে খুলে রাখার আহাম্মকি থেকে শুরু করে, অসাধু ফল ব্যবসায়ীর অ্যাপেলস ভার্সাস অরেঞ্জেসের লাভক্ষতির খতিয়ান কিংবা একই গাড়ির চারটে চাররকম সাইজের চাকার হযবরল গতিপথের হিসেব - এইসব ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যখন পরীক্ষার হল থেকে বেরোতাম, তখন শিউলি-কাশ নয়, চোখের সামনে থাকত সর্ষেফুলের ক্ষেত। তবুও সেই বিকেলগুলো বড় মোহময় লাগত। ইস্কুলের পাশে বরাকর রোডের ওপর দিয়ে যখন দূরপাল্লার বাস ছুটে যেত, তার হর্ণের শব্দে স্পষ্ট শুনতে পেতাম আগমনীর সুর। কারণ, অঙ্ক পরীক্ষা শেষ হলেই হাফ-ইয়ারলি শেষ, পিতৃপক্ষও। তারপর রাত ফুরোলেই মহালয়ার ম্যাজিক।

চণ্ডীপাঠের আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথা বলতে পারব না কিন্তু, স্কুলজীবন এবং তারপরে বড় হয়ে মহালয়ার ভোরে "মহিষাসুরমর্দিনী" শুনতে শুনতেই শারদীয়ার আগমন টের পেয়েছি। আমাদের ইস্কুল ছিল শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। মহালয়ার সকালে আমাদের গা ছুঁয়ে যেত এক অন্যরকম

হাওয়া। নীল আকাশে চোখ মেললে দেখতে পেতাম সাদা তুলোর মত মেঘ। মাঠে মাঠে কাশফুলের সমারোহ। এখন অবশ্য আর সেসবের বালাই নেই। মাথার ওপর এখন বারোমাস দূষিত, ধুসর আকাশ। এগারো মাস গরম, সময়-অসময়ে বৃষ্টি। খুব বেশি হলে, একমাসের জন্য গায়ের ওপর সোয়েটার, মাফলার। শহুরে সভ্যতার যন্ত্রে সব ঋতু তালগোল পাকিয়ে একাকার। তবু, কংক্রিটের জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে একচিলতে মাঠের বুকে এখনও কিছু অবাধ্য, উদ্ধত কাশের গুচ্ছ মাথা তোলে। আশ্বিনের ভোরে এখনও বাজে "মহিষাসুরমর্দিনী"। তখন বুঝতে পারি শরত এসেছে, পুজোও এলো।

লেখক সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ

স্মৃতি-স্বাদ-সঞ্চয়িতা

শিশির রায় (১৯৯৮)

মাঠে খেলা হচ্ছে, বেশ হইহল্লা। সে মাঠের ভেতরেই, খেলছে, আবার খেলছেও না। তা কী করে হয়? প্রথম দিনেই মাঠে একটা সেমসাইড গোল করে বসলে ওরকম হয়। তার পায়ে লেগে বল নিজেদেরই গোলে। কী ছেলে রে বাবা, দেখবি না নিজেদের গোলটা? বেশ বিব্রত সে, বন্ধুরাও। অবশ্য বন্ধু তখনও বলা যাবে কি? কিছু মুখ শুধু, তাকে ফেলেই ছুটে বেড়াচ্ছে মাঠময়। তাই সে, ক্লাস সেভেনে নতুন ভর্তি হয়ে আসা মুখচুন কিশোর এক, মাঠেরই ভিতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের আলোয় দেখছে চোখের বাহিরকে। কী দেখছে? মাঠের সীমানায় তারের বেড়া, সেখানে লতিয়েছে একটা জঙ্গুলে পাতাগাছ। তার ফলগুলো, ছোট ছোট পটলের মতো, লম্বাটে একটু, চওড়ায় কম—ধরে আছে, রেঙে আছে কোনও কোনওটা—টুকটুকে লাল। এমন ফল তো সে দেখেনি আগে! সে হাতে ছোঁয় লাল টুকটুকে একটা ফল, তার হাতে খসে পড়ে সেটা। এই যাঃ! স্খলনের অপরাধবোধে ছেয়ে যায় মন। খেলা তখন খুব জমেছে বিপক্ষের গোলমুখে. .. তাদের দলের গোলকিপার ছেলেটি তার অবাক, বিব্রত মুখ দেখে হেসে বলে, "ও তো কুঁদরি, চিনিস না? সব্জি হয় এখানে। একটু টক-টক খেতে। তোদের ওদিকে হয় না বুঝি? ফেলে দে ও ফল, কত দেখবি এর পর!"

বন্ধুর কথায় হাত ঝেড়ে ফেলে সে। পাকা কুঁদরি টুপ করে গড়িয়ে যায় তারঘেরা সীমান্তের দিকে। ওপারে, দুরে ট্রেন যাচ্ছে একটা। কোন দিকে যাচ্ছে? ওদিকে কি চক্রধরপুর? নাকি কলকাতা? এই ট্রেনটা কি বাড়ির দিকে যাচ্ছে? বাড়ির কাছ দিয়ে যাবে? ধুস, তা কী করে হয়। কলকাতা থেকেও তো তার বাড়ি কত দুরে। আরও দুরে, আরও পুবে, সেখানে এই ট্রেন যাবেই না। তার দিদিরা কী করছে এখন বাড়িতে? মা? মুড়ি ভিজিয়ে খাচ্ছে চায়ে? সে চোখ বুজে বাতাসের দিকে উচু করে দেয় নাক, গন্ধ নেওয়ার মতো করে টানে। মাঠে খেলাশেষের বাঁশি তার কানে পৌঁছয় না তখন। তার কানে আসে চায়ের কাপে নরম হয়ে আসা মুড়ির বিজবিজ বিজবিজ শব্দ। তার ভাল লাগে। সে জানে, মনখারাপের সময় প্রিয় কিছু কল্পনা করলে গলায় পাকানো দলাটা একটু কমে আসে। চায়ে মুড়ি ফেলে চামচ দিয়ে খাওয়া তার প্রিয়, এখানে ডাইনিং হলে এক দিন খেয়ে দেখবে সে। কিন্তু, অন্যরা যদি হাসে? এর আগে সে এত মানুষের সঙ্গে একসাথে বসে খায়নি কোনও দিন। তার বাড়িতেও তো লোক কম নয়। তা বলে একটা হলঘর-ভর্তি ছেলে, এত কলকল খলখলের মধ্যে খাওয়া... সে অবাক হয়ে দেখে এই নববিধান। একটা তাকে সারি সারি স্টিলের থালা, নিয়ে নাও যে কোনও একটা। যে ছেলেরা চটপটে বেশ, তারা পা চালিয়ে ঢুকে ভাল থালাগুলো হাতে তুলে গৌরবের হাসি হাসে। ভাল থালা মানে, কানা তোবড়ানো নয়, থালার জমিতে আঁকিবুকি নেই যেগুলোয়। একটু পরে ঢুকলে, বাঁকাটেরা থালাই তোমার ভবিতব্য। তা হোক। ক্ষতি নেই কিছু। যে শহর থেকে সে এসেছে, সেখানে বহু মানুষের হাতে তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের থালা দেখেছে সে। গরিব মানুষ তারা, ভিখিরি মানুষ। তা হোক। এখন বাড়ি থেকে এই ছ'শো কিলোমিটার দূরের এই ডাইনিং হলের টেবিলে কানা তোবড়ানো থালা সামনে নিয়ে বসে তার কেমন বাড়ি-বাড়ি, দেশ-দেশ বোধ হয়। কাউকে বলা যায় না সে কথা। অন্যরা যদি হাসে শুনে?

এই তো! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠার উপক্রম। তার পাতে এটা কী? কুঁদরিই তো! সবুজ, সান্দ্র এক হাতা সব্জির মধ্যে কুঁদরির টুকরো পেয়ে সে যেন আর্কিমিদিস বনে যায়, এই তার ইউরেকা-মুহূর্ত! সে উন্মুখ হয়ে সেদিনের সেই গোলকিপার ছেলেটিকে খোঁজে, অনেকটা দুরে অন্য টেবিলে বসেছে সে। এত দুর থেকে ডেকে এঁটো হাতে

এক টুকরো কুঁদরি দেখানো ঠিক হবে কি? কিংবা কাছে গিয়েও? থাক। অন্যরা যদি হাসে? একটু মনখারাপ হয় তার, আবিষ্কারের আনন্দ বন্ধুর সঙ্গে বেঁটে নিতে না পারায়। সব্জির কালচে সবুজ ঝোল থালায় গড়িয়ে যায়, সে আপনমনে অচিন মানচিত্র আঁকতে বসে সেই ঝোলে আঙুল খেলিয়ে। অচিন দেশের মাঝখানে বসিয়ে দেয় কুঁদরির টুকরোটা। এই তার রাজ্য, এই হল গে রাজধানী। নিজের মনেই হাসে, মনটা হালকা হয় একটু। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে সে মাকে, দিদিদের কুঁদরি চেনাবে।

পোস্তও তো চেনাতে হবে। কত কাজ তার! ভাবতেই মনটা উসখুস করে ওঠে, কবে পুজো আসবে, কবে ছুটি? সে এর আগে আলুপোস্ত খায়নি কোনও দিন। তাদের ওদিকে চল নেই। অ্যাদ্দিনে সে বুঝে গেছে, নানা জায়গার মানুষ নানা রকম খায়। তার না-হয় বয়স কম, তার বাবা তো এত বড় একটা লোক, সেকি খেয়েছে কোনও দিন পোস্ত? তা হলে? বুধবার দিন মর্নিং ইস্কুল এখানে, ক্লাস সেরে দুপুরের খাবার খেতে ডাইনিং হল ঢুকতেই একটা গন্ধ নাকে এসে লাগে। গোড়ায় সে বুঝতে পারেনি, বুঝেছে পরে। ওটাই আলুপোস্তর গন্ধ। বিরাট ডেকচি-নৌকোর মধ্যে রাশি রাশি চটকানো সেদ্ধ আলু, তার সঙ্গে পোস্তবাটা মিশলে একটা ঝিম-ধরা ভাপ ওঠে। বাড়ির রান্নায় উঠবে না, বাড়িতে আর ক' জনের রান্না হয়। হোস্টেলে উঠবে, উঠবেই। এ গন্ধের সঙ্গে সমষ্টির, সহ-বাসের যোগ। গন্ধটাকে মগজে ঢুকিয়ে নেয় সে। বুধ-দুপুরে ডাইনিং হলে থালায় একদলা আলুপোস্ত নিয়ে লোফালুফি করে বন্ধুরা। লোফালুফি করার মতোই নিরেট বস্তু এক, হাতের আঙুলগুলোর মাথা একসাথে জড়ো করে চাপ দিলে তবে সে ভাঙে, নচেৎ অনড় অটল। ছোড়াছুড়িতে গায়ে লেগে গেলে ঈষৎ ব্যথারও কারণ। সেই নিয়েও মজা। রগড়। এখন এই বুড়োটে জীবনে আলুপোস্তর সেই ঝিম-ধরা গন্ধ আর লোফালুফির ছেলেমানুষি ফিরে পেতে মাঝে মাঝে থুম মেরে বসে থাকে সে। সেই ডাইনিং হল থেকে বহুদুরে, তাতে কী। স্মৃতির কি দুরত্ব, ভূগোল হয় কোনও! সকালের টিফিনে আর এক বিস্ময়। টেবিলে টেবিলে রাখা আছে পাঁউরুটি ক-পিস, তার মাঝখানটা রঙিন। টকটকে লাল, উজ্জ্বল সবুজ। প্রথম প্রথম তাজ্জব, এমন পাঁউরুটি তো সে দেখেনি ভূভারতে! বন্ধুরা মুখ টিপে হেসে চিনিয়ে দেয়, ওরে ওটা জেলি, জেলি। জেলি? সে তো থাকে কাচের বয়ামে, পাঁউরুটির উপরটা সুন্দর করে চামচ দিয়ে মাখিয়ে খেতে হয়, এরকম মাঝখানটায় প্রসাদের মতো একটুখানি দেওয়া কেন? আর থাকে সেঁকা পাঁউরুটি—চিনি ছড়ানো, মাখনও নাকি মাখানো আছে তাতে। গোটা পাঁউরুটির সাইডের দুটো টুকরো তার বিশেষ প্রিয়, বাড়িতে থাকতে ওই দু-পিস তার জন্য বাঁধা। এখানে, ডাইনিংয়ে গণতন্ত্র, সমানাধিকার—বিশেষ সুবিধাযুক্ত পাঁউরুটি তুমি পাবে না। যদি কচিৎ কদাচিৎ জুটেও যায়—সে হতাশ হয়ে দেখে—কিচেনের প্রকাণ্ড চুলোর অতিরিক্ত আঁচে দগ্ধপ্রায় কৃষ্ণবর্ণ তারা, অপমানে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে যেন আরও। তারই উপরে ওই লাল-সবুজ জেলির সান্তনা, মাখন-চিনির উপশম। হোক, তার ভাল লাগে। নিবেদিতা কলামন্দিরে তাদের গানের মাস্টারমশাই যে গান ধরেন মাঝে মাঝে, 'সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে'... সেই গান মাথায় নিয়ে কেলেকুচ্ছিত পাঁউরুটির দিকে মমতায় চেয়ে থাকে সে।

ডিম পাতে পড়ে দু-রকম। সেদ্ধ, সাদা ডিম ঝোলে ফেলা, আর তেলে সেদ্ধ ডিম একটু কড়া করে ভেজে ঝোলে ফেলা। অ্যাদ্দিনে সেও পেকেছে একটু বন্ধুদের সঙ্গে, প্রমাণ ঠাট্টা-তামাশা গুজগুজ-ফুসফুসে যোগদান—ঝোলে ফেলা সাদা ডিমের নাম তারা দিয়েছে 'বিধবা' ডিম। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে হিন্দি ছবি মাথায় পুরে নিয়ে আসা ছেলেরা বলে 'সনম বেওয়াফা'। প্রিয়জন, যে বিরহে আছে। বাংলা ক্লাসে সে 'বিরহ' শব্দটা শিখেছে আজকাল, 'বিধবা' বা 'বেওয়াফা' না বলে 'বিরহী' ডিম বলা যায় কি? এখন সে মুখফোড় এসব বলে ফেলে বন্ধুদের, কে হাসল, কে টিটকিরি দিল, মনে নেয় না। 'বিরহী ডিম' নিয়ে একচোট হাসাহাসি হয়। যেদিন পাতে মাছ থাকে, সেদিন আলোচনা-সমালোচনা-বিশ্লেষণ হয়: এ মাছটা আর একটু কড়া করে ভাজলেই বেশ বিস্কুট বলা যেত কি না, কিংবা: বিদ্যাপীঠে

ডিমের ঝোল আর মাছের ঝোলের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি? উদাহরণ-সহ আলোচনা করো,' ইত্যাদি। তবে হ্যাঁ, হপ্তায় এক দিন রাতে মুরগির মাংস, সেদিনের ব্যাপারই আলাদা। সারা দিন সকলের মুখে হাসি—মহারাজের রামবকুনি, ওয়ার্ডেনের চড়চাপড়ও উপেক্ষণীয়। রাতের ডাইনিং হলে তুমুল খুশিয়াল হইহল্লা। সারি সারি টেবিল জোড়া লাগানো, এক-একটা টেবিলে চারজন ছেলে। কিছু কিছু টেবিল মাংসের রাতে কুখ্যাত', ভাত খাওয়ার জন্য। নাইন-টেনেই তাদের বেশ লম্বাচওড়া শরীর, ভাতের বালতি নিয়ে সার্ভার সার্ভ করতে এলে গোটা বালতিটাই টেনে নিয়ে রেখে দেয় টেবিলে। ঘন লাল, ঝোলের উপরে ভেসে-থাকা থকথকে তেল দিয়েই অর্ধেক বালতি ভাত উড়ে যায়। সাকুল্যে দু'-আড়াই পিস মাংস, সেই দিয়ে বাকিটুকু। খাওয়া সেরে, সাবান না ছুঁয়ে স্রেফ জলে ধুয়েই, পিছল হলুদ হাত কালো প্যান্টের পাছুতে মুছতে মুছতে পুরুলিয়ার কুয়াশা-নামা রাতে হোস্টেলের পথ ধরে ছেলের দল। রাতে বিছানায় শুয়ে নাকের কাছে হাত, মাংসের ঝোলের গন্ধ তখন সুখসপ্ন সুখনিদ্রার চুম্বক। আর দই! সে তো সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়া খাদ্য এক। কোন আশ্চর্য 'সাজা' দিয়ে সে দই পাতা হত জানা হয়নি কখনও, কিন্তু অমন টক দই যে এই ভারতভূমে আর দ্বিতীয়টি হয় না কোথাও, সে বিশ্বাস এখনও দৃঢ় তার। স্টিলের বাটিতে থকথকে সাদা দইয়ের মাঝে অত্যল্প সবজেটে চিনির জেগে থাকা—আসলে মরে থাকা মরমে। বাইরে পুরুলিয়ার লু-বওয়া গরম, ইস্কুলে রাখা যন্ত্রে তারা স্বচক্ষে দেখেছে গরম ছুঁয়েছে আটচল্লিশ ডিগ্রি...বন্ধ-জানলা ভেজানো-দরজার আলো-জ্বালা ডাইনিংয়ে তারা সুপসাপ খেয়ে নিয়েছে সেই রামটক দই, এই নিদাঘের মহৌষধ তা— না জেনেই। আসলে তারা যখন পড়েছে কলকাতা থেকে বহুদুরের, তুলনামূলক ভাবে অনাদৃত উপেক্ষিত এক জেলার ওই ইস্কুলে, সে মাটিতে তখন কী-ই বা ফলত। ধান-চালের মাটি নয় এ, লাল রুক্ষ, সব্জির বাহার ফুটে ওঠে না তাতে; রাজধানী তো দুরস্থান, জেলাসদর বাজারের ব্যস্ত দেখনদারি মিলিয়ে যেত পলাশ-ওড়া বাতাসে। সে জন্যই ওই বিরহী সাদা ডিম ঝোলে ফেলা, কড়া করে ভেজে নেওয়া মাছের টুকরোকে যাতে নষ্ট না হয়। সে জন্যই ওই কুঁদরি, জেলি-মাখা করুণ পাঁউরুটি, টক দইটুকু। কত টাকাই বা আর নেওয়া হত ছেলেদের থেকে, সারা বছরে! এই খাবারই খায় কলকাতা দিল্লি বোম্বে আমেরিকা মঙ্গলগ্রহ, মুখ্যত মধ্যবিত্ত ও অনেকাংশে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি ঘর থেকে আসা ছেলেরা এই প্রতীতিতেই স্থিত থাকত কয়েক বছরের ইস্কুলজীবনে।

আসলে বয়সটাই এমন, পরিবেশটাও, অভাবের বোধ ছিল না কোনও। ইস্কুলবাড়ি থেকে মন্দির, হোস্টেল, খেলার মাঠ, অডিটোরিয়াম- সর্বত্র বলে বা না বলেই শেখানো হত অল্পে থাকার, বাঁচার পাঠ। শেখানো হত যেটুকু পেয়েছ একসঙ্গে গ্রহণ করো। যেখানে খাদ্য গ্রহণের আগে সমস্বরে বলতে হত *'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা'*, পাঠ গ্রহণের আগেও বৃন্দকণ্ঠে *'সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ'*, সেই মাটিতে সচেতন ভাবে কদাপি পৃথকত্ব শেখেনি তারা। মাধ্যমিকের আগে ঠাকুরঘর থেকে প্রসাদি সুজির পায়েস এসেছে ছোট এক প্লেট, রাতের লেট নাইট স্টাডি শেষে লাইন করে বেরিয়ে হোস্টেলে যাওয়ার মুখে আটানব্বইটা হাতই পেয়েছে তা, কম পড়েনি কখনও। সেখানে গার্জিয়ানস্ ডে-তে বলে দেওয়া হয়েছে: দয়া করে ভাল খাবার রেঁধে এনে নিজের ছেলেকে খাওয়াবেন না, অনেক ছেলে আছে যাদের বাড়ি এত দূর যে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎই কালেভদ্রে, মায়ের হাতের খাবার স্বপ্নকল্পনা। তবু সে স্বপ্ন সত্যি করে বন্ধুর মায়েরাই মা হয়ে উঠতেন। কত রবিবার কত মায়েদের হাত থেকে কত কিছু খেয়েছে সে! আবদার করে আদায় করেছে মুখরোচক কত খাবার, সস্নেহ গেরুয়াবসনের কাছে! সেই সব স্মৃতি, সেই স্বাদ-সঞ্চয়িতা নিয়েই তার পথ চলা। আজও।

লেখক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত

থার্ড আম্পায়ার

দেবজ্যোতি মিত্র (২০০১)

আমাদের সময়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা সুন্দর কথা বেরিয়েছে-নাইন্টিজ কিড। দুটো শব্দের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন ব্যাপারটা বেশ খাপ খেয়ে একসঙ্গে রয়েছে। শৈশবটা ডিজিটাল বিস্ফোরণের ওপার, এপারে ক্রিপ্টোর বিজ্ঞাপন, জামতাড়ার ফোনকল, অনলাইন শপিং মিলে ধুন্ধুমার কাণ্ডকারখানা। কিন্তু কথায় আছে-নদীর এপার কহে... ওপারেতেই সর্বসুখ, স্বর্গসুখ। চোখ বন্ধ করে ভাবলে ফেলিনির সিনেমার ড্রিম সিকোয়েন্সের মত হাওয়ায় পতপত করে উড়ে যায় - মেরুন আর সবুজ রঙের জার্সি (প্লে ভেস্ট), মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে অ্যাভালনের জুতো, ভাঙা ব্যাটের হ্যান্ডেল, রিস্টব্যান্ড - দুরন্ত হাওয়ায় চুল উড়ে যাওয়া নাইন্টিজ কিড একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেইসব চিহ্নের দিকে - তার মোজা ভেদ করে পায়ে ফুটছে চোরকাটা, তবু সে অনায়াসে অক্লেশে দৌড়ে পার হয়ে যেতে পারে শিবানন্দ থেকে চ্যারিটেবল, ডেয়ারি থেকে বিদ্যাপীঠ গেট - তার দৌড়ের সঙ্গী হয় মালগাড়ি, বৃষ্টি জমিয়ে রাখা মেঘ কিম্বা তার বুড়ো হতে থাকা অনেক সহপাঠী। এই দৌড়ের স্পিডের তুলনা আজও সে কোন গিগাবাইটে খুঁজে পায়নি, পাওয়া সম্ভবও নয়।

মতান্তর থাকবে, তবুও মোটামুটি বলা যায় বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল ক্রিকেট। সাবেকি নিয়ম মেনে বিকেলের খেলায় তার আগমন হয় শীতকালে; কিন্তু রবিবারের সকালে, সদনের আনাচে-কানাচে, নিজেদের মত করে, নিয়মমাফিক বা নিয়ম ভেঙে সারাবছরের ক্রিকেট ছিল সর্বজনীন, আন্তরিক ও বিদ্যাপীঠের দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক। ব্যাট হিসেবে যে কোনও রকম লম্বা কাঠ থেকে চটি, বালিশ, কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল বিদ্যাপীঠের গুহামানবরা প্রয়োজনমত নিজেরাই আবিষ্কার করে নিত, বল হিসেবেও চেয়ারের তলার রাবারের চাকতি, পাকানো মোজা এদের উল্লেখ না করলেই নয়। কিন্তু খেলার পরিসর যতই গোপন ও ক্ষুদ্র হোক না কেন খেলার প্যাশনে খামতি কোথাও কোনওভাবেই কেউ খুঁজে পায়নি। ধুতি পরে ক্রিকেট খেলার স্বাধীনতাই প্রমাণ করে বিদ্যাপীঠে এলবিডব্লুর কোন অবকাশ ও ইচ্ছা কোনটাই প্ল্যাটুন ম্যাচ ছাড়া স্বীকৃতি পায়নি। এছাড়াও বিদ্যাপীঠের সিনিয়র ব্যাচের ক্রিকেট বোদ্ধারাই প্রথমে জুনিয়ারদের শিখিয়ে দেয় বল প্রথম ড্রপে পড়ে গড়িয়ে গেলে সেটাই গুগলি। অনেক পরে গুগলির আসল সংজ্ঞা জেনে অনেকেই মর্মাহত হয়েছেন শুনেছি। এরকমই একটি নিষ্পাপ নিয়ম ছিল বোলিং ক্রিজ নিয়ে। বোলিং ক্রিজের দুটো লাইনের পেছনের লাইনের দুদিকে দু'পা রেখে বল করতে হয় পেস বোলিং করলে কিন্তু স্পিন করলে আরও এক পা সামনে নিয়ে সামনের লাইনকে মাঝে রেখে বলা করা স্বীকৃত। হয়তো কোন জনদরদী মানুষ স্পিনারের দুঃস্থ চেহারার কথা মাথায় রেখে এই নিয়ম বানিয়ে থাকবেন যাতে সে এক পা এগিয়ে বল ছুঁড়তে পারে কিন্তু এই নিয়মের সুযোগমত সঠিক অপব্যবহারও হত। ব্যাচের কত মুশকো পালোয়ান নিজেকে স্পিনার বলে দাবী করে এক পা এগিয়ে যে স্পীডে বল করত তাতে সেই টিমের পেসার ধন্দে পড়ে যেত - আমারও কি তাহলে স্পিন করা উচিত?

পাঁচিলের বাইরের পৃথিবীতে তখন ভারতবর্ষের ক্রিকেট শচীনময়। নব্বইয়ের দশকের তিনটি বিশ্বকাপের মধ্যে '৯৬ বিশ্বকাপ হয়েছিল ভারতে এবং তার উন্মাদনা ও মনখারাপ দুটোই ছিল তীব্র। টুর্নামেন্টের টপস্কোরার হওয়ার পরেও শেষরক্ষা হয়নি ভারতের - সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লজ্জাজনক বিদায় অসমাপ্ত ম্যাচে। ধীরে ধীরে তারপর সৌরভের লর্ডস অভিষেক, দ্রাবিড়, যুবরাজ, হরভজনদের ঘিরে নতুন দল। বিদ্যাপীঠে ম্যাচ দেখা - ম্যাচ শোনা - ম্যাচের খবর ঠিকঠাক জানা ছিল একটা অ্যাডভেঞ্চার। গৌতমদার সাইকেল চলেছে, কানে রেডিও। পাশে

পাশে চলেছে কৌতুহলী নার্ভাস ছেলের দল। ওই রেডিওই ঢাকার তাণ্ডবদের, শোয়েব আখতারের শচীনকে বোল্ড করার, শারজার মরুঝড়ের সাক্ষী। এরকমই আরেক ডেরা ছিল স্বপন মহারাজ নিয়ন্ত্রিত জিমন্যাশিয়ামের টিভি - কিছু কিছু ম্যাচ সেখানে দেখানো হত অফিসিয়ালি আর বাকি ম্যাচ চলত দরজা বন্ধ করে। কিন্তু ছেলেদের জানা আছে কোন কোন জানলায় কী কী ফাঁকফোকর রয়েছে - কোনও শব্দ না করে কীভাবে কিছু ওভার দেখে নিতে হবে অন্ধকারে মিশে থেকে। নব্বইয়ের দশকে আজাহারের নেতৃত্বে ভীতু ভারত বেশিরভাগ শক্তিশালী দলের সঙ্গেই পেরে উঠত না - ক্রোনিয়ের, টেলর-স্টিভ ওর, আক্রম বা রণতুঙ্গার প্যাঁচে পড়ে অনেক হৃদয়বিদারক ম্যাচ হারত আমাদের দেখা। সেই হার আজকের মত চোখ রাঙিয়ে অথবা দায়সারা হার নয়, বেশ আত্মবিশ্বাস তুবড়ে দেওয়া হার। নাইন্টিজ কিড কিন্তু তার মধ্যেও একটা শচীনের স্ট্রেট ড্রাইভ, আখতারের ইয়র্কার দেওয়ার বোলিং অ্যাকশান, জন্টি রোডসের ডাইভ মনে মনে মাঠে নিয়ে যেত - যেটা সে মাঠে অবিকল করতে পারবে। বিকেলের খেলার মাঝে গালে বোরোলীন লাগানো ডোনাল্ড, কত লম্বা রান আপের শোয়েব, ঝাঁপিয়ে অসম্ভব ক্যাচ ছিনিয়ে নেওয়া জন্টি বা গিবস বিকেলগুলোকে অবিস্মরণীয় করে তুলত। এভাবেই জানুয়ারি মাসে আসত প্ল্যাটুন ম্যাচ - মাঠে মাঠে জমত ভিড়। অন্য ব্যাচের আম্পায়ার - এলবিডব্লু থেকে বাই ওভারথ্রো নিয়ে একদম পুরো নিয়মের খেলা। সমর্থকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, খেলোয়াড়দের অ্যাড্রিনালিন আর বোদ্ধাদের চর্চা সব মিলিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। কোন আউটটা ভুল দেওয়া হয়েছে, কাকে কোন অর্ডারে নামানো একেবারেই ঠিক হয়নি, কোন ক্যাচ ফস্কানোটায় সুভাষের রক্তজল করা পরিশ্রমকে ব্যর্থ হয়ে চিত্তকে ভয়শূন্য করে প্রবল প্রতাপে শিবাজিকে জিতিয়ে দিয়েছে সেই নিয়েই গমগম করত বিদ্যাপীঠ। সন্ধ্যের ভজনের ঘুম উড়ে যেত, স্টাডিতে মন পালিয়ে যেত বিকেলের কিছু মুহূর্তে - বারবার মনের মধ্যে রিপ্লে চলত এটা ওরকম হলে কেমন হত। ম্যাচের হিরোরা তখন ফুরফুরে মেজাজে ফুটেজ খাচ্ছে একমনে, আর হেরে যাওয়া বদনসিবেরা মুখ চুন।

বিদ্যাপীঠের ক্রিকেটের চৌহদ্দিতে ব্যাটসম্যানরাই কিন্তু শেষ কথা নয়। সেই দুনিয়ায় ভালো জোরে বোলারের কদর সমান সমান। লম্বা রান আপ উড়তে শেখায়। হুট করে লাফিয়ে ওঠা বল জানান দেয় শরীরে জোর আছে। সকালবেলায় নিজেদের মধ্যে আয়োজন করা খেলায় চোখে পরে নেওয়া হয় বাড়ি থেকে লুকিয়ে আনা সানগ্লাস। দুই হাত হাল্কা করে দেয় রিষ্টব্যান্ড। শিবানন্দ সদন ছাড়তে ছাড়তে ক্যাম্বিসের বালখিল্য ছেড়ে অঙুল চেপে ধরে সিনথেটিক ডিউজ বল। তাকে পেস স্পিন কোনও রান আপ কায়দাতেও পেট অবধিও সবাই বাউন্স করাতে পারে না - ক্যাম্বিসে যে ছেলেটা বলে বলে সব লেন্থের বল পুল করে উড়িয়ে দেয় সিনথেটিক ডিউসে তারও বিক্রম পরাস্ত হয়। আন্দাজ আসে, শুধু গায়ের জোর ছাড়াও আরও কত কী আছে খেলাটায়। তারপর একদিন হাত ছোঁয় কর্কেট, শেষ অবধি সাদা সিম লাল বল - রূপকথা - ঠিক যেমনটা টিভিতে দেখা যায়। জোরে আসা ক্যাচ ধরার সঙ্গে সঙ্গে হাত ভরবেগে পেছনে না টানলে তালু ঝনঝন করে, গ্লাভস ছাড়া বেপরোয়া ব্যাটিং-এ কেটে যায় আঙুল - ছেলেরা সেই বয়েসটাকে চিনতে শেখে যেখানে আঘাত আর যন্ত্রণা সহ্যের আলোচনায় লুকিয়ে আছে পৌরুষের কৌলীন্য। বিদ্যাপীঠের ক্রিকেট অনেক উড়ানের বীজ ছেলেদের মনে পুঁতে দেয় - স্কুলের শেষ পিরিয়ডগুলো থেকেই মনে মনে কল্পনা চলতে থাকে কেমন ভাবে মারতে হবে কভার ড্রাইভ, কেমন হবে অফসাইডে টাইট ফিল্ডিং দেখে মাপা বোলিং এইসব...সময় এগিয়ে এগিয়ে এভাবেই একদিন উপস্থিত হয় প্রাক্তনী সম্মেলন। আর সেই উপলক্ষ্যে ক্রিকেট ম্যাচ - বর্তমানদের বিপক্ষে প্রাক্তনীরা। মুলত সেই খেলার সুর বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও একবার সেই খেলা নিয়ে ধুন্ধুমার লেগেছিল। দলনির্বাচনের পক্ষপাত ও আরও কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে এই অধমের ব্যাচ সিদ্ধান্ত নেয় তারা প্রাক্তনীদের সমর্থন করবে - অন্যদিকে বিদ্যাপীঠের বর্তমানদের টিমে সিনিয়ার দাদারা। কথায় কথায়, বিদ্রূপে পারদ উঠল সপ্তমে, খেলার শিক্ষকও সেই দ্বন্দ্বে পক্ষ নিলেন। শেষ অব্দি অবশ্য তার মুখরক্ষা করে বিদ্যাপীঠের দল জিতে

যায় সেই ম্যাচ - ধীরে ধীরে সেসব অসন্তোষ চাপা পড়ে যায় পুরুলিয়ার হিমেল কুয়াশায়। মাঠে ফেলে রাখা মুহূর্ত পড়ে থাকে সাপের ফেলে যাওয়া খোলসের মতই - ছাত্র শিক্ষক সব মিলে মিশে একসঙ্গে ভাগ করে নেয় বার্ষিক প্রদর্শনীর দায়ভার, একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে এক্সকারশনে।

আজকাল আরেকটা কথা শুনি - খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে। খেলাই হত সারাদিন। ক্লাসের থেকে অনেক বেশি অনেক দামী কিছু মনের ভেতরে ঢুকে যেত মাঠ থেকেই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে স্কুলবাড়ি মন্দির সব উপেক্ষা করে প্রথম উত্তর বেরত - আমাদের স্কুলে বাইশটা মাঠ আছে। ওটাই প্রথম স্বতন্ত্র পরিচয়। ওই মাঠে শীতে ক্লাস হয়, ওখানেই কনুই হাঁটুর ছাল উঠে গিয়ে রক্ত পড়ে শিরশিরে ব্যথা সঙ্গে করে, রোজ একটা গোল সূর্য নিভতে নিভতে নেমে যায়, যেদিন যায় না সেদিন প্লাবন বুকে নিয়ে বর্ষা আসে - ক্রিকেটের দলবল গল্পে মন দেয় কিন্তু ফুটবল ক্যারাম টেবিল টেনিসের পোকারা খেলায় মাতে। যারা এসব কোনো খেলাতেই নেই তারা রোজের মতন বিদ্যাপীঠ দেখতে থাকে। জলের ধারা মালভূমির বুকে নিজের চটি ভাসিয়ে পাশে পাশে দৌড়োয় কিশোর। ওই চটিই কখন ব্যাট, কখনও উইকেট। ওই বালকই কখনও চটি ভেসে চলে যাওয়ার পর হাসির খোরাক, কখনও সমুদ্রে ভেসে চলে যাওয়া মার্চেন্ট নেভির ক্যাপ্টেন। আর ওই বিদ্যাপীঠ? কখনও নির্বাক দর্শক আর কখনও মনের ভেতরের দায়িত্বশীল নিখুঁত থার্ড আম্পায়ার - জীবন যতই উইকেট উপড়ে মাটি থেকে ক্যাচ তুলে আউট করার চেষ্টা করুক না কেন - একটা সবুজ সংকেত দিয়ে ঠিক জানিয়ে দেবে এখনও সব শেষ নয়, একটু চেষ্টা করার সুযোগ এখনও বাকি।

লেখক টাটা গ্রুপের বিজনেস এনালিস্ট

স্পটলাইট

দেবপ্রিয় সমাদ্দার (২০০১)

এই গল্পটা আমার নয়, তাই এর সত্যি-মিথ্যের হিসেব আমার কাছে নেই। তবে খুব কাছ থেকে দেখা গল্পটা, তা বলা যেতেই পারে। অনেকটা পর্দায় সিনেমা দেখার মত। চোখের সামনে হুশ-হুশ করে একের পর এক দৃশ্য চলে যাওয়ার মত ম্যাজিকাল, দুরের থেকে আরো দুরে চলে যাওয়া দুপুরের ট্রেন হুইস্‌লের মত রহস্যময়। কিছুটা নির্ভেজাল অভিজ্ঞতার, আর বাকিটা একটু নিজের মত করে গড়েপিটে নেওয়া আর কি। কিন্তু, এসব কথা তো সব সময় সবাইকে বলা যায় না। কারণ এ গল্পের কোনো ভূমিকা বা উপসংহারও নেই। বরং একটা মোটামুটি লম্বা চওড়া যাত্রার এদিক সেদিক থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আনা কিছু স্মৃতির টুকরো রয়েছে, আর রয়েছে একটা লাল রঙের বাড়ি।

এই লাল বাড়ির সাথে রজতের সম্পর্ক অনেকদিনের, অনেক ওঠা নামা, অনেক হোঁচট, অনেক উড়ান আরো কত কী! রজত কে? ধরে নেওয়া যাক, এই গল্প তারই গল্প। তার ছোটবেলার গল্প। আর পাঁচটা ছোটবেলার গল্প যেমন হয়, হয়তো তেমনই। ওই একটু আধটু নিয়ম ভাঙা, অল্প বিস্তর দস্যিপনা আর আয়নার ওদিকের মানুষটাকে যখন বুড়ো লাগতে শুরু করে, তখন কয়েক মুহূর্তের মন গলিয়ে নেওয়া আফসোসের। তাই আড্ডাতে আজ রজতকে এই গল্প বলতে গেলে হয়তো কিছুটা বানিয়েও বলতে হয়। আর তাতে ভুল নেই। আসলে চালশে চোখেই পড়ে, মনে তো নয়।

লাল বাড়িটার একটা ডাকনাম ছিল, অডিটোরিয়াম। প্রথম তার সাথে যেদিন আলাপ, সেই দিনটা রজতের মনে আছে, কারণ ধুতির কুঁচিতে সেদিনই প্রথম চোরকাঁটা ফুটেছিল তার। বিদ্যাপীঠ পরিক্রমার চক্‌করে। মেইন গেটের পরে দেবযান, আর তার পরেই এই অডিটোরিয়াম। তখন কি আর সে জানতো, এই নিয়ে একদিন গপ্পো ফাঁদবে সে! বাড়িটার পিছনে একটা বিকট পাখি বিশাল ঠোঁট আর ভয়াল স্বর নিয়ে অদ্ভুত পাহারা দিচ্ছে। আর তার পাশেই, এক খাঁচা ভর্তি কিছু নির্বিবাদী হরিণ। দেখে বড় ভালো লাগত তাদের। তাই বেঙ্গলি টু এর ক্লাস নিতে গিয়ে যেদিন ভুগোলের স্যার ভোলানাথদা রজতকে শাখামৃগ বলে ডেকেছিলেন, রজতের কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার লেগেছিল। শাখাটুকু বাদ দিয়ে শুনলেই ওই নির্বিবাদী চোখগুলো মনে পড়ে যায়।

এ গল্প যখন রজত বলতে শুরু করে, দেখেছে প্রথমেই একটু খেই হারিয়ে ফেলে প্রত্যেকবার। তাই আবার তাকে ফিরতে হয় এদিক সেদিক করে, এ লাল বাড়িটার সামনে। বাড়িটার সামনের ফটকের ওপর দিকে কয়েকটা মজাদার ভাস্কর্য, যার মানে এখনও অবধি সে বুঝে উঠতে পারেনি। তার ভিতর দিয়ে ঢুকলেই নন্দলাল বসুর আঁকা একটা ছবি, সরোবরের মধ্যে সাদা পদ্মফুল আর কিছু পদ্মপাতা। এই লাল বাড়িটার সামনে দিয়ে যতবার গিয়েছে সে, ছবিটা টানতো রজতকে। যেন এক বুক জলে নেমে যেতে ইচ্ছে করত ছবিটা দেখলেই। ছবির ঐ পদ্মফুলের থেকে একটা গন্ধ পেত সে। কীসের মতন যেন গন্ধটা, অনেকটা বিকেলবেলায় ছেলেরা ফাঁকা ফুটবল মাঠ দেখলে যেরকম গন্ধ পায়, অনেকটা ইস্কুলের কড়া স্যার কোনো কারণে ক্লাস না নিতে এলে দস্যি ছেলেরা যে গন্ধটা পায়, সেইরকম কিছু হবে বোধহয়। গন্ধের জাল টপকে এরপর দরজা দিয়ে ঢোকা, আর তারপরেই অবাক করা একটা দৃশ্যে থমকে যেত সে। সার দিয়ে কাঠের চেয়ার, আর সেই সারির এক্কেবারে সামনে একটা পেল্লায় মঞ্চ, স্টেজ। যেদিন স্টেজের সামনে রজত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়েছিল, সেদিন তার অবচেতনে একটা যোগ তৈরি হয়ে যায় এই স্টেজের সাথেই। এই স্টেজে উঠে নবীন বরণের দিন একটা কবিতা বলেছিল রজত। সবাইকেই কিছু না কিছু

করতে হয়, মোটের ওপর সবাই গান করছে, আর কিছু ছেলে বলছে তাদের আগের স্কুল থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে বয়ে আনা কবিতা। রজত ভেবে দেখল, গান করতে গেলে, গানের কথা মুখস্থ রাখতে হবে, সাথে ধরে রাখতে হবে সুরও। কবিতায় এই সুরের দায়িত্বটা নেই। তাই কবিতাই বলে দেওয়া ভালো। আসলে বরাবরই শর্টকাটের উপাসক এই রজতের সিলেবাসে বেশি খাটুনির পরিশিষ্টগুলো একেবারে পিছন দিকেই আসে। রজতের বাবা যখন অনেক ছোটবেলায় দীঘার সমুদ্রে নিয়ে যায়, রজত দেখেছিল, প্রথমবার নোনা জল পায়ে এসে ঠেকলে বাবা জলে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করাতে, বাবা বলেছিল, যখন তোর কল্পনার থেকেও বড় কোনো জিনিসের সামনে পড়বি, তাকে প্রণাম জানাবি। দেখবি তার বিশালত্ব তোকে ঠিক আগলে রাখবে। মঞ্চে যখন রজতের ডাক পড়ল, এদিক ওদিক না ভেবে তাই শতরঞ্চিতে হাত ঠেকিয়ে একটা প্রণাম ঠুকে নিয়েছিল রজত। সে যাই হোক, স্টেজে উঠে নিজের ওপরে ঝমঝমে স্পটলাইটের দ্যুতিতে স্নান করতে করতে সামনের অস্পষ্ট কালো মাথাগুলো মুহূর্তের জন্য তন্ময় করে দিল তাকে। বাঃ, এ তো বেশ মজা, এই অবয়বের দঙ্গলে কে বন্ধু? কে দাদা? কে-ই বা সন্ন্যাসী? কেমন করে যেন সবকটাকে এক আসনে বসিয়ে রেখেছে সে! মঞ্চ এমনই ক্ষমতা দিয়েছে তাকে। আগামী পাঁচ সাত মিনিট, সবার চোখ তার দিকেই। এরকম গুরুত্ব তো সে আগে কখনও উপভোগ করেনি! এই কবিতা দিয়েই সেদিনের সন্ধ্যে কাটলো রজতের, পরের দিনের সকালও। আস্তে আস্তে ইস্কুল তার রুটিন-মাফিক বাঁধাধরা জীবনে ব্যস্ত করে ফেললো তাদের সবাইকে।

আশ্রমিকদের বেশি ফুর্তি করতে নেই। তাই ফুর্তির উপাদানকেও যতটা সম্ভব পরিহার করে বানানো হত এই রুটিন। কোনো ব্যাপারে যাতে এক একটি ন' দশ বছরের ছেলে বেশি উচ্ছসিত না হয়ে পড়ে, সে দিকে রাখা হত কড়া নজর। তাতে বাদ পড়তো সিনেমা, আধুনিক সমকালীন গান বাজনা। যে কিশোর ভক্তিবাদের অনাসক্তিকে বোঝার ক্ষমতাই রাখে না, তাকে দিয়ে একটু জপতপ না করালে তো চরিত্র গঠনের মহাযজ্ঞটা সারাই হয় না! সারাটা সপ্তাহ এই তকতকে নিষ্কলুষ নিদানের প্যাঁচে পড়ে হাঁপিয়ে উঠত রজত। একমাত্র শনিবারের দুপুরটুকু ছাড়া। কারণ, তখন হত সিপি ক্লাস। এই সিপি বা কালচারাল প্রোগ্রাম বলে একটা ক্লাসের পরিসরে ছোট ছেলের দল তাদের সেকশানের প্রতিনিধিত্ব করত, যে যেমন ভাবে পারে। যদিও সেই দাওয়াতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেইন কোর্সে কিঞ্চিত ভক্তিগীতির গার্নিশ ছাড়া খুব বেশি কিছু জুটতো না। তাই রজতের মনে হয়, কিছু একটা করতে হবে। তার এই দুর্বুদ্ধিতে সঙ্গত দিচ্ছে তখন সুমন চাটুজ্জ্যে, অঞ্জন দত্তেরা। সিপির শেষে যখন ঘরে ফিরত সে, পাশের বন্ধুদের মুখে গুনগুন করা বসে আছি ইশটিশানেতে শুনে বুঝতে পারতো, আগুনটা লেগেছে। কিন্তু লাগলে কি হবে? ঘরে ফিরেই ওয়ার্ডেনের তলব,

- এ সব কি গান গাইছিস তুই?

- কেন মহারাজ, এটা তো এখন সবাই শোনে, গায়....

- না, এর পর রবীন্দ্রসঙ্গীতই হবে।

রজত বুঝতে পারে সেদিন ওইটুকু আগুনে হবে না। বিপ্লবের জন্য কিছু বিস্ফোরণ প্রয়োজন।

দিন কাটে, রাতও কাটতে থাকে কোনো রকমে বালিশ আঁকড়ে। গ্রীষ্মের দাবদাহের মৃগয়া সম্পুর্ণ করে বৃষ্টি নামে পুরুলিয়ার পাথুরে রুক্ষতার বুকে। এমন এক কাকভেজা দিনের পর, ফুটবল মাঠে আছাড় খাওয়া সারা হলে আবার তলব রজতের, মহারাজ ডেকেছেন। সঙ্গে আরো কিছু কিংকর্তব্য মুখ।

- মহারাজ আসব?

- হুম, আজ ভজনের পর, স্টাডির সময় তোরা আমার ঘরে আসিস। সামনে জন্মাষ্টমী,
তোদের দিয়ে একটা অনুষ্ঠান করাবো।

সে ভালো কথা। এত দিনে স্টেজে উঠে উঠে মুখ চেনা হয়ে গিয়েছে অনেকেরই, তাই ব্যাচের দাগী কয়েকজনের ওপরেই এর দায়িত্ব পড়বে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে! বরং স্টাডিতে যে যেতে হবে না, সেটাই একটা বড়সড় পাওনা। এই আনন্দেই সন্ধ্যের ভজন কোনোমতে শেষ করে যখন পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হল রজতদের কাছে, তখন তারা বুঝলো কি মুশকিলে পড়েছে তারা। এ তো আজ থেকে প্রায় দু দশক আগেকার গল্প, তাই আজকের মিলেনিয়াল আদব কায়দার সাথে এর খুব একটা যোগাযোগ নেই। ব্যাচের একটি শ্যামলা ও একটি ফর্সা ছেলেকে সাজানো হবে যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরাম। আর তার চারদিকে ঘিরে বাকিরা করবে গান। ব্যাপারটা শুনে যতই মিষ্টি লাগুক, যারা সেখানে ধরাচুড়া পরে দাঁড়ায়, তাদের পরবর্তীকালে বন্ধুমহলে টিটকিরি ও মশকরা ছাড়া বিশেষ কিছু যে প্রাপ্তি নেই, সেটা ভেবে মাথায় হাত পড়ল রজতের। কিন্তু তাতে লাভই বা কি? মহারাজের নির্দেশ, করতেই হবে। সাহস করে না বলতে পারার মধ্যে তখনকার যুগে শুধু অসভ্যতাই দৃষ্ট হত। এই গাত্রবর্ণের উপযোগিতাকে আজকাল কি সব নামে যেন ডাকা হয়, তখন অতশত বোধহয় আবিষ্কার হয় নি। তাই রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল, সন্ধ্যেবেলা করে। আস্তে আস্তে এল জন্মাষ্টমীর দিন। রজতের বিছানার পাশের জানালা দিয়ে যে চিলতে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে খুব মেঘ করেছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হয় হয়। ছুটি দুদিনের, প্রথম দিন জন্মাষ্টমী, পরের দিন নন্দোৎসব।

জন্মাষ্টমীর নাচগান হল একরকম। কিন্তু তাও, স্টেজে নয়, শিবানন্দ সদনের লনে। রজতের সেদিন রাতে শুতে গিয়ে মনে হল, দুচ্ছাই! জন্মাষ্টমীর ছুটিটাই মাটি, এই নিরামিষ নৃত্যের পাঁচন কি ফি বছর গিলতে হবে নাকি? ভুলটা ভাঙল তার পরের দিন, খেতে বসে। জুনিয়ার ডাইনিং হলে সার দিয়ে ছোট ছোট জলচৌকি আর বসার পিঁড়ে। সারির মাঝে লম্বা টানা পরিবেশনের রাস্তা। ব্রহ্মার্পণং মন্ত্রের পর সবে খিচুড়ির নামে ডালভাতের একটি নতুন সংস্করণের সাথে পরিচয় হচ্ছে, হঠাৎ কিছু সিনিয়র ব্যাচের দাদারা এসে সেই স্বল্প পরিসরে জুড়ে দিল আজব কান্ড! কৌরব পান্ডবের তরজা। এতদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যে সব প্রাতিষ্ঠানিক আচার পালন হচ্ছিল, এক ঝটকায় সব যেন ভেঙে পড়ল রজতের সামনে! সে কি ঠিক শুনছে? কৌরব পান্ডবের তরজার আড়ালে প্রচার হচ্ছে সেদিনের ফুটবল ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়দের নাম, তাও আবার গানের সুরে। আর সেই সুর কোনো ভক্তিগীতির নয়, এক্কেবারে বলিউডের নবতম শানু, উদিত, অভিজিত থেকে কিশোরের গানের! দারুণ মজা লাগে রজতের। গানের উৎকর্ষের জন্যে নয়, বরং এই বিশাল নিয়ম ঘেরা দেওয়ালের মধ্যে ঐ ছোট্ট মজার ছলে খুলে ফেলা জানালাটার জন্যে! তাই তো, এতো সে নিজেও পারবে! এই অদ্ভুদ আমেজ নিয়ে সে যখন ম্যাচ দেখে ফিরছে সন্ধ্যেবেলায়, শুনলো, আসল জিনিসটা আছে ঠিক তার পরেই। নাটক! রজতের আজও মনে পড়ে যায়, সেই নাটকে সে সুযোগ পায়নি। কেন সে জানে না। যীশুর জীবনের আদলে, পরিত্রাতা। সারা বিকেল ফুটবল ম্যাচের ধাক্কায় ঢুলন্ত বন্ধুর পাশে বসে পুরো নাটকটা দেখেছিল রজত। নিজের বন্ধুবান্ধবদেরই করা, অপটু আনকোরা অভিনয়। মন ভরে গিয়েছিল রজতের, খুব ইচ্ছে করছিল এরকম সে-ও স্টেজে অভিনয় করবে। কিন্তু ততদিনে একটা জিনিস একটু একটু করে পরিষ্কার হয়েছে তার কাছে। ব্যাচের ভালো ছেলে হিসেবে সুনাম কুড়োলে, সব ব্যাপারে ডাক পাওয়া যায়। অর্থাৎ, পরীক্ষায় বেশি নম্বর অথবা সঠিক নজরের সামনে ভক্তির বিজ্ঞাপন। এই দুইই হল সব কিছুর গেট পাস। সে নাটকই হোক, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হোক, ভালো ছেলের সংজ্ঞায় স্নাতক হওয়া বেশ জরুরি। কিন্তু সেই বন্ধনীতে তো সে পড়ে না, বরং ব্যাচের অন্যতম বিচ্ছু হিসেবে তার দুর্ণাম অ্যাদ্দিনে সবার জানা। তাহলে? উপায় অবশ্য হয়ে যায় কপালজোরেই। নাটক পরিচালনার দায়িত্বে এর পর যিনি এসেছিলেন, সেই গৌতমদার হাতে একদিন হয়তো প্রয়োজনীয় লোকের অভাবেই রজত পড়ে যায়। রিহার্সালের দিন তার কান্ড দেখে গৌতমদা বোঝেন, এই অকেজো ব্যাটাচ্ছেলেকে এভাবেই কাজে আনা যেতে পারে। আসলে রিহার্সালের

ঠিক আগেই আরেকজন ওয়ার্ডেনের কাছে প্রবল কানমলা খেয়ে এসে রজত যেই নিজের দৃশ্যে অভিনয় করতে নামে, তখন টের পায় ব্যথায় কানটা টনটন করছে। ওদিকে দৃশ্য হল, একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সদ্য কাটা গিয়েছে গুরু দ্রোণের নির্দেশে। এই দৃশ্যে একলব্যের বন্ধু বসন্ত, প্রচন্ড রেগে উঠবে। রাগটা ছিলই, তার ওপর কানে বেশ ব্যথা, সব মিলিয়ে উচ্চস্বরে সংলাপ বলতে গিয়ে রজতের চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল। আর দেখে কে! কি অসাধারণ অভিনয়! একেবারে ন্যাচারাল কান্না! আহা, কী স্বতঃস্ফূর্ত! কপালজোরে গৌতমদার চোখে পড়ে যাওয়াটা রজতকে এক্কেবারে পৌছে দিল স্টেজে। সে বছর, পরের বছর, তার পরের বছর, কোনও বারেই আর তাকে ছাড়া নাটকের দল ভাবা হয়নি।

নাটকে অভিনয় করতে যতটা ভালো লাগত রজতের, তত আর কিছুতে লাগত না। কিন্তু তাতেও সেই এক সমস্যা, নাটকের বিষয় সেই বাঁধাধরা, ভক্তিতে টইটম্বুর। কিন্তু ভুল ভাঙল টিচার্স ড্রামায়। আসলে এই প্রচন্ড নিয়মাবলীর ঘেরাটোপে শিক্ষকদেরও সমান ত্রাহি মধুসুদন অবস্থা। তার ওপর এই গণ্ডগ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে বহির্বিশ্বের চকমকির প্রবেশ যথেষ্ট অপ্রতুল। তাই শিক্ষকরাও প্রতিবছর মেজাজ হাল্কা করে একটি নাটক করতেন, আর তার বিষয় হত কৌতুকের। ভাড়াটে চাই, ম্যানিয়া, বারো ভূতে–এই সব নাটক দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যেত রজত! যে স্বপনদাকে দেখলে সব সময় আড়ষ্ট হয়ে থাকে সে, সেই মানুষটা এত ক্যাজুয়াল সংলাপ দিতে পারেন? যে দুর্গাদা সারাজীবন রসায়ন ক্লাসে বেঘো গর্জন করে গেলেন, সে এক প্রৌঢ়ের ভূমিকায় অমন ক্যারিকেচার করতে পারেন! সারা জীবন সাড়ে সতেরো ডেসিবেলের কম গলার আওয়াজ রাখা গম্ভীর অসিতদা এত সহজে এক বোকাসোকা কবির ভূমিকায় নেমে যান? এ তো না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। সেদিন রজতের মনে হয়েছিল, হয়তো এ স্টেজটা না থাকলে, মানুষগুলোকে শুধু দেখেই যেত সে, চিনতে পারত না কোনোদিন।

মানুষ চেনার ব্যাপারে ইস্কুলের ছিল খুবই সহজ উপপাদ্য। যেমন, শিবরাত্রির সন্ধ্যেবেলায় ভজনের পর হবে শিব আর তার চ্যালাদের নাচ। কে সাজবে শিব? খুব সোজা, যার চেহারা একটু পদের, অর্থাৎ পুরুলিয়ার ডাইনিং হলের ভাত খেয়েও যার গায়ে মাংস লেগেছে, এবং অবশ্যই, ফর্সা। আর তার চ্যালা হবে কারা? ব্যাচে যাদের কঙ্কালসার চেহারা এবং যাদের গায়ের রও কালো। শেষ কথাটা শুনে খুব অস্বস্তিকর লাগল নাকি? কুড়ি পঁচিশ বছর আগে রজতদের কাছে কিন্তু অস্বস্তির কোনো সহজ আড়াল ছিল না। সেই শিব জটাজুটো লাগিয়ে, বাঘছালের স্কার্ট পরে হাতে ত্রিশূল নিয়ে নাচবেন। সবার সামনে তিনিই তখন বুঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, সাক্ষাত স্বয়ম্ভু। তার দুপাশে তার দুই চ্যালা, যাদের শরীরের উপর সাদা পোস্টার কালার দিয়ে আঁকা কঙ্কালের হাড় ও করোটি। প্রতিবছর সেই একই গান, নাচে ভোলানাথ। শুধু বদলে যেত শিব আর তার সাথীরা। সান্ধ্য ভজনের পরে আলতো করে নেমে আসা ঘুমের মৌতাত তখন কোথায় যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে!

দেখতে দেখতে ক্লাসের পরে ক্লাস জমতে থাকে রজতের। এখন তার গলার স্বর বদলেছে। দাড়ি গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে ইতিউতি। ক্লাস এইটের পরে মাধ্যমিকের ধুম লেগে যাবে, তখন পড়াশুনার ওজন অনেক বেশি। তাই এইটের পর আর সিপি ক্লাস নেই। মনটা খারাপ হয়ে যেত রজতের এটা ভাবলেই। সারা সপ্তাহের পরে, ঐ ছোট্ট জানলাটা আর সে দেখতে পাবে না। তাই শেষ সিপিটা খুব আবেগের। গৌতমদা সেই ক্লাস ফাইভের একটি ছোট্ট আসরে একবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা মজার নাটক করিয়েছিলেন রজতদের দিয়ে, ভীমবধ। সেখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সে। সেই ভীমবধ মঞ্চস্থ করতেই এইটের লাস্ট সিপির মঞ্চে ওঠা। আলোর মধ্যে বসে এখনও তার ভালো ভাবে ঠাহর হয় না, কে বসে আছে সামনে? বন্ধু? দাদা? ভাই? শিক্ষক, না সন্ন্যাসী? সামনের কালো কালো আবছা মাথাগুলো এক একটা সংলাপে হাসির রোল তুলছে, হাততালি পড়ছে মাঝে মধ্যেই। দৃশ্যটির শেষে রজত উইঙে এসে বুঝলো, পরের সিনের আগে, মেক আপটা বোধহয় আরেকবার

চড়িয়ে নিতে হবে, শেষবারের মত নাড়ি ছিন্ন করার আগে মঞ্চ তার চোখ থেকে একটু জল বের করেই নিল তাহলে।

কিন্তু শেষ বললেই কি সব শেষ হয়ে যায়? যায় না। সে সময়ে ক্লাস নাইনের ছেলেরা খুব কমই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারত। তার মধ্যে একটি হল, শ্রুতিনাটক। একে সামনে মাধ্যমিক, তার ওপর শক্তিদার সদন। ছেলেদের মধ্যে ভালো থেকে খুব ভালো আর খুব ভালো থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠার হিড়িক তখন তুঙ্গে। ধ্যানে, ভজন হলে, এমনকি সদনের সিঁড়ির সামনের পোর্টেবল ঠাকুর আসনে গভীর মনোযোগ দিয়ে সময় যাপন চলছে হরবখত। যেন মাধ্যমিকের ৮০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বর আইসির পেপার বাধ্যতামূলক। এমতাবস্থায় কে করবে শ্রুতিনাটকের মত অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে দুর্মূল্য স্পেস-টাইমের অপচয়? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ডেকে আন রজত আর সেই গোত্রের অন্যান্য কুলাঙ্গারদের। রজত দেখল, এই এসেছে সুযোগ। যে সুযোগের আশায় অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকগুলো বছর। তার স্মৃতির অ্যালবামে যে অপ্রাপ্তির চ্যাপ্টারটি রয়েছে, এই সুযোগ তার সম্যক প্রায়শ্চিত্তের। জুটে গেল কিছু সমমনস্ক বিপ্লবীদের দঙ্গল। তুমুল হিট বলউডি ছবি মিশন কাশ্মীর আর কার্তুজের আদলে লেখা হল গল্প, সংলাপ। তখনকার কঠিন বিধির নজরে এ এক অত্যন্ত গহিত দুঃসাহস। ভক্তির ছিটেফোঁটা ছাড়া ঝকঝকে স্ক্রিপ্ট, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ! না না, এ তো মেনে নেওয়াই যায় না! কিন্তু সেই নাটক মঞ্চস্থ হল একঘর ছাত্র - শিক্ষকের সামনে, হই হই করে। ততক্ষণে ঘটনার আঁচ পেয়ে, রে রে করে ওঠা ভক্তকুলকে পাত্তা না দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে প্রথম পুরস্কার জিতল রজতের দল। ক্লাস ফোরের সিপিতে সুমনের গানের ওপর যে ফতোয়া লাগু হয়েছিল, সেদিনের এই অগ্নিকাণ্ডে তার আহুতি সম্পন্ন হল। হয়তো এভাবেই এক ব্যাচ থেকে অন্য ব্যাচে এই আগুন ছড়িয়ে পড়বে, কে জানে? বিস্ফোরণ ঘটলে তো বহুদুর অবধি তার তরঙ্গের প্রাবল্য ছড়িয়ে পড়ে।

লাল বাড়িটার ঐ মঞ্চ রজতকে এই গল্পটা ভালো করে বলতে দেয় না। খেই হারিয়ে ফেলে সে আজও। আজও সে গল্প করার বদলে স্মৃতিচারণ করে ফেলে। আসলে বয়স হয়েছে তার। তাই দৈনন্দিন হিসেব-নিকেশের ফাঁকে স্মৃতির নরম আদর বেশ লাগে। পুরুলিয়া ছাড়ার প্রায় বছর দশেক পর, এই স্মৃতির ডাকেই এক বন্ধুর সাথে আবার ইস্কুল ফেরে সে। সারাদিন জাতিস্মরের ঘোর কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ভজনের পরে প্রধানশিক্ষক মহারাজ হঠাৎ সামনে উদয় হলেন। এরকম ক্ষেত্রে রজত বরাবর ভয় পেতেই অভ্যস্ত। তা সে ছাত্র হোক, কি প্রাক্তনী। কিন্তু তাকে অবাক করে মহারাজ বলেন, গৌতমদার কাছে শুনলাম, তুমি নাকি খুব ভালো নাটক-টাটক করতে?

-আজ্ঞে মহারাজ ভালো করতাম কি না জানি না,তবে খুব করতাম, এটা ঠিক।

- তাহলে আজ সন্ধ্যেবেলায়, আমাদের সিনিয়ার সেকশনের শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতার বিচারক আসনে বসো। আমাদের খুব ভালো লাগবে।

বুকটা কেঁপে উঠেছিল রজতের। তবে এবার ভয়ে নয়। এ লাল বাড়ির ভিতর, ওই সরোবরের পদ্মফুলের গন্ধে, ওই সারি দেওয়া কাঠের চেয়ারের সামনে, ঐ মঞ্চ তাকে ভোলেনি। নাড়ির টান কি এত সহজে ছিন্ন হয়? এ যেন সেই সমুদ্রের মত, বাবা হাত ধরে বলছে, বিশাল সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়াতে। বিচারক আসনে বসার আগে একবার উইঙে উঠে একটু নিরিবিলি দেখে শতরঞ্চিতে হাত দিয়ে প্রণাম জানালো সে আবার। ততক্ষণে দর্শকেরা সবাই অপেক্ষমান। উকি মেরে এক ঝলকে অবাক হয়ে গেল রজত। কালো কালো মাথাগুলোকে এখনও চেনা যায় না। কে বন্ধু? কে ছাত্র? কে শিক্ষক? এক বিশাল সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে এখন সে স্নান করে চলেছে ঝমঝমে স্পটলাইটের দ্যুতিতে।

লেখক ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে মেডিক্যাল অফিসার

লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

শুভ্রকান্তি চক্রবর্তী (২০০৬)

আমাদের ইস্কুল-জীবনে গাছের অভাব ছিল না। গাছে গাছে ফল-ফুল ছিল। আর ছিল হরেককিসিমের পাখি। আমরা কয়েকটা পাখি ছাড়া অধিকাংশেরই নাম জানতাম না জানতে চাইতামও না। জানত একজন। হ্যাঁ, একজনই। প্রায় সব পাখির নাম তার ঠোঁটস্থ। সে আমাদের সহপাঠী অরিজিৎ। আমরা যে বিকেলগুলোয় সাইডলাইনে, ডিফেন্সিভ থার্ডে লাথালাথি করেছি, অরিজিৎ চুপচাপ কোন ফাঁকে চলে গেছে আমলকী গাছের তলায়। দুপুরে, যে টিফিন টাইমে আমরা একটা জিলিপি, একটা কলা বা একটা আলুর চপ খেতে খেতে মজলিশি করেছি, অরিজিৎ ঘুরে বেড়িয়েছে পাঁচিলের ধারে ধারে। কখনও যে ওর সঙ্গে যাইনি, তাও নয়। তবে অরিজিতের সঙ্গে রূপম আর সুমিত প্রায়ই যেত। সুমিত একটা খাতা করেছিল। পাখিদের নাম আর সম্ভবতঃ আলতো স্কেচ করে রাখত। অরিজিতের সঙ্গে পক্ষী-সন্দর্শনে বেরোলে প্রকৃতির সঙ্গে ভালবাসাবাসি হত খুব। কিন্তু সে ভালবাসা ধরে রাখতে পারতাম না। যে যে জিনিসগুলোয় বাহবা পাওয়া যায়, সেইসব চর্চায় আগ্রহ পেয়েছি ক্রমশঃ, তাই এইসব বাহবাহীন নিভৃত সাধনায় মনও ছিল না।

অরিজিতের পাখি-পরিচিতি ধীরে ধীরে বন্ধুমহল ছাড়িয়ে সিনিয়র-জুনিয়রদের মধ্যেও সুবিদিত হল। তার সংস্পর্শে কেউ কেউ অজয় হোম আর সেলিম আলির বইয়ে ডুবে থাকতে শুরু করল। কিন্তু ওই যে, পাখি-প্রেমের ফাঁদে বাঁধা পড়ল না কেউই! আশ্রমজীবনে এত ঠাসা ব্যস্ততা, তার তলায় চলে যেতে থাকল এসব ক্ষণিকের বুদবুদ। তবে অরিজিতের এই 'অতিরিক্ত' জ্ঞানের কথা আমরা বেশ গর্ব করে বলতে শুরু করলাম সেইসব মাস্টারমশাইদের, যাঁরা কারণে-অকারণে প্রশ্রয় দিতেন। আমাদের কখনও সেকশন চেঞ্জ হত না। তাই একই ক্লাসের বিভিন্ন সেকশনের মধ্যে মধুময় রেষারেষি থাকত। উল্টোদিকে যার যার নিজের সেকশনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা গড়ে উঠত। একই সেকশনের কারও কৃতিত্ব, ব্যাপ্তি, আনন্দ - যেন সবার হয়ে উঠত। আর এই সব কৃতিত্ব যদি "জারা হাটকে' কিছু হত, তো কথাই নেই! এভাবে অরিজিতের পাখিচোখ যেন আমাদের গোটা "বি-সেকশনেরই পাখিচোখ হয়ে উঠল।

একদিন বিবেক মন্দিরের একতলায় আমরা ক্লাস করছি। ক্লাস সেভেন। সম্ভবতঃ কোনো বিজ্ঞান ক্লাস। হঠাৎ এক শিক্ষাকর্মীদাদা এসে জানালেন, অরিজিৎকে সুশান্তদা সারদা মন্দিরে ডাকছেন। একটা পাখি দেখা যাচ্ছে দু'তলায়, টেন-এ'র ক্লাসরুম থেকে। অনেকক্ষণ ধরে গাছে বসে আছে। কখন উড়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। তখন তো এরকম মোবাইল ফোন ছিল না, যে ছবি তুলে রাখবেন!

আমরা সবাই অবাক! বাংলার শিক্ষক সুশান্তদা এইসব গোপন ইচ্ছেগুলোকে, চিনতে চাওয়াগুলোকে নিরন্তর সাহস যোগাতেন। তা বলে একটা পাখি চিনতে চেয়ে ক্লাসের মাঝে ডেকে পাঠালেন? আমাদের বিজ্ঞান ক্লাস মাথায় উঠল। অরিজিৎ পিছনের বেঞ্চ থেকে উঠে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সে কী বিস্ময়! যিনি ক্লাস নিচ্ছিলেন, তিনিও অবাক। পাঠ্যবিষয়ে নিরুচ্চার ছেলেটির এই প্রকৃতিপ্রেমই তো বিজ্ঞান শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ ছিল! এক লহমায় বই-খাতা-চক-ডাস্টার সব তুচ্ছ হয়ে উঠল।

আমরা একযোগে অপেক্ষা করেছিলাম অরিজিতের ফিরে আসার। পাখি ততক্ষণ গাছে ছিল ঘন্টা পড়েছিল কিনা, কিছুই মনে নেই। শুধু এক পাখিওয়ালা বিজ্ঞান ক্লাসকে স্তব্ধ করে, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়দের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে... ওই অমলিন যাওয়াটুকু আজও মনে গেঁথে আছে। এই ঘটনার কথা মনে পড়লেই বুকের ভেতর শ্যাওলা জমা একটা সবুজ সরোবর যেন পাখি হয়ে উড়ে যায় অতীতের দিনগুলোয়। বন্ধুদের কাছে। বাহবাহীন শখ, গোপন ইচ্ছে, পারা না-পারাগুলোর কাছে। আর এইসব ফিরে যাওয়া আসলে 'অবান্তর' স্মৃতিদের শাশ্বত জিজ্ঞাসা... 'লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

লেখক রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

হগওয়ার্টস এক্সপ্রেস

শারদ্বত মান্না (২০০৮)

রাত ১১টা বেজে ৫ মিনিটের ট্রেন। হাওড়া স্টেশন ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসে, বিশাল চত্বরে নামী-দামী ট্রেন চলে যাওয়ার পর কেবল পরের দিন ভোরবেলার টেন ধরার যাত্রী আর ভবঘুরেদের দেখা পাওয়া যায়। এই শেষবেলার স্টেশন তখন একদল শিশু-কিশোরের সঙ্গে বাবা মায়েদের ভিড়ে ভরে ওঠে। রাতের ট্রেন। এক ঘুমে পুরুলিয়া। অনেকে স্টেশনে বসে রাত্রের খাবার শেষ করে নিচ্ছে। অনেকের স্টেশনের কাছেই বাড়ি, সেখানে রাত্রের খাওয়া শেষ করে এসেছে স্টেশনে। অনেকে টিফিন ক্যারিয়ার ভরে খাবার নিয়ে এসেছে। রাত্রে বার্থ গুছিয়ে তার ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে খেয়ে নেবে। ঠিক ঘুরতে যাওয়ার আনন্দ নেই সেই যাত্রায়। ছুটির শেষে ইস্কুল ফেরার গাড়ি তো। পরেরদিন হগসমিড থুড়ি পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল সাতটা। ওই ছিল তাদের নয় পূর্ণ তিনের চার নম্বর স্টেশন থেকে ধরা হগওয়ার্টস এক্সপ্রেস। হাওড়া-আদ্রা-চক্রধরপুর-বোকারো-স্টিল-সিটি প্যাসেঞ্জার।

সদ্য হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোজফার্স স্টোন পড়া ছেলেটির তো হ্যারিকে মনে পড়বেই। প্রথমবার সেই হগওয়ার্টস এক্সপ্রেসে যাওয়ার সময় যদিও এত কথা মনে আসে না। নতুন শহর, শহর ছাড়িয়ে সেই দূরে নতুন জায়গা, নতুন ইস্কুলে ইন্টারভিউ। তার মাঝে ছোট্ট পুতুলের মত এগারো মাসের বোনকে নিয়ে মা-বাবার নাজেহাল অবস্থা। কিছুটা আলগোছেই ইস্কুলের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। আসল গুরুত্ব বোঝা যায় ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময়। ট্রেনের মিডল বার্থে পাশাপাশি শুয়ে কাড়াকাড়ি করে আনন্দমেলা পড়তে পড়তে দিনহাটা আর হাওড়া শহর রাত কাটায়। প্রথমবার কোলাঘাট ব্রিজ পেরোনোর গমগমে শব্দ শোনে তারা। সকালে ট্রেনেই ব্রাশ সেরে স্টেশনের বাইরে চা খেতে খেতে দরদাম সেরে রিকশায় উঠে পড়া। কুড়ি টাকা রিকশার ভাড়া শুনে ছাত্র ও অভিভাবক দল যুগপৎ চমকিত হয়। তারপর যেতে যেতে ক্রমে শহর ফুরোলে সেই রিকশা ক্রমে ঢালুতে গড়ানো শুরু করে। গড়ানো ফুরোতেই আসে খাড়াই, আর মাথায় ময়লা গামছা বাঁধা রিকশাওয়ালা রিকশা থেকে নেমে প্রাণপণ মোট টানার মত করে সেই রিকশা টানে। মাঝে হাঁপিয়ে গিয়ে অভিভাবককে বলে, ''বাবু টুকখান নামো''। বাবা কোল থেকে মেয়েকে নামিয়ে নিজের সিটে ছেলেকে বসান ও ছেলের কোলে মেয়েকে বসিয়ে রিকশা থেকে নেমে গিয়ে তার ওজন হাল্কা করেন। কিছুদূর খাড়াই ফুরোলে পর আবার আগের মত। এইরকম মাইল মাইল চলার পর ক্রমে হগওয়ার্টসের পাঁচিল দেখা যায়। রিকশাওয়ালার রোগা অপুষ্ট শরীরে বেমানান মোটা শিরা বের করা পায়ের পেশী দেখতে দেখতে ছেলেটির মনে হয়, কুড়ি টাকা আসলেই বেশি ভাড়া নয়।

তারপর ছেলের পাঁচিল ঘেরা জীবন চলতে থাকবে নয় বছর ধরে। হগওয়ার্টস এক্সপ্রেসে বছরে তাকে চড়তে হবে সাকুল্যে ছয় বার। তিনবার বাড়ি আর তিনবার ইস্কুল। কিন্তু লাগেজ আর স্টক বয়ে চলা বাবা মায়েদের মাসিক যাত্রা চলতেই থাকবে। ছেলের খাবার, ছেলের জামাকাপড়, ছেলের রেফারেন্স বই আর গল্পের বই, নিজেদের দুই দিনের ছোট্ট সংসার - সমস্ত কিছুর মোট বইতে বইতে একদিকের কাঁধ ক্রমশ বেঁকে আসে তাঁদের। তখনও গড়ানো ট্রলির ব্যাগ বাজারে আসেনি। বড় বড় ডাফল ব্যাগ বোঝাই করে বাবা আর মায়েরা কেবল হগসমিড থেকে কিংস ক্রস স্টেশন যাতায়াত করেন। দিনের পর দিন গড়াতে গড়াতে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়, মন কষাকষি হয়। পুত্রগর্বের ভিত্তিতে বিত্তভাগ হতে থাকে।

সুদূর মণিপুর থেকে এক-দুইজন মাত্র গার্জেন পালা করে আসেন, সারা ইস্কুলে সমস্ত মণিপুরের খবর নিয়ে,

অন্তত তিরিশজন ছোট-বড় ছাত্র তাঁকে ঘিরে মাঠের একপাশে বসে। একাধিক ফোন নিয়ে পালা করে সকলেই কথা সেরে নেয়। বাঙালি বাবা-মায়েরা কান পেতে শোনেন, মণিপুরি মা কাউকে বলছেন গান গাইতে, আর সে ছেলে ঈষৎ বিদেশী টানে বাংলা গান ধরেছে, 'করুণাপাথার জননী আমার, এলে মা করুণা করিতে'। বাঙালি বাবা-মা আর বাঙালি ছেলের দল চুপ করে শোনে।

ক্রমে ছেলেটির এগারো মাসের বোন বড় হতে থাকে। আশ্চর্য তার গানের গলা, সেই দেড়-দুই বছর বয়স থেকেই। কয়েক বছর গড়াতেই এমন অবস্থা হয় যে সেই ইস্কুলে ছেলেটিকে হগওয়ার্টস এক্সপ্রেসের অভিভাবককুল ক্রমে 'রাইয়ের দাদা' বলে চিনে নিতে শুরু করেন। "আজ এস ফোর কোচে রাই উঠেছে আমাদের সঙ্গে? আজ বড় মিষ্টি গান শোনা যাবে!" কিংস ক্রস স্টেশনের নয় পূর্ণ তিনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে শোনা যেতে থাকে এইসব। কেউ সুরে গেয়ে ওঠেন "রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের,রাই আমাদের।" রাত্তিরে ও সকালে একের পর এক গান গাইতে গাইতে রাই তার দাদার কাছে এসে পৌঁছয়, দাদা ঘাসের ওপর নীল প্লাস্টিক বিছিয়ে মায়ের কোলে শুয়ে তার গল্প শোনে।

মা বোনকে খেলতে ছেড়ে দেন সারা ইস্কুলে। ছেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে দেখতে পান, দূরে ফার্স্টবয়ের বাবা রবিবার দিন সকালে বসে ছেলেকে অঙ্ক করাচ্ছেন। সেই বাধ্য ছেলে মন দিয়ে অঙ্ক করে যাচ্ছে। একটু মনটা ব্যথা–ব্যথা করে ওঠে। ছেলেকে বলেন, "একটু তো আগের মত আমার কাছে এসে পড়তে বসতে পারিস, সকালটা?" হস্টেলে এসে অবাধ্য হয়ে যাওয়া ছেলে ঘাড় গোঁজ করে বলে, "না! মাসে একটা দিন আসো, সেই দিনটাও পড়ে নষ্ট করব না।" মা নিরাশ হতে হতেও একটু খুশি হন। ছেলে নাই বা গেল বিলাত, নাই বা পেল রাজার খিলাত। বিকেলের প্লে টাইমের আগের সময়টা বাবা-মায়েদের দল গুটি গুটি মেন গেটের বাইরে সাধুদার দোকানে চা আর চপ খেতে আসেন। পুরুলিয়ায় জলের বড় অভাব। তাই বাজার থেকে কেনা বেগুনগুলোকে না ধুয়ে সাধুদা কেবল যত্ন করে কাপড়ে মুছে নেন। তারপর লম্বা লম্বা ফালি করে বেসনে ডুবিয়ে বেগুনি ভাজেন। একটু কিন্তু কিন্তু করেও সেই বেগুনি মুড়ি দিয়ে দিব্যি চায়ের সঙ্গে খাওয়া হয়ে যায়। তাহলে বিদ্যাপীঠের রবিবারের টিফিনে যে কচুরি পাওয়া যায়, তা যায় কোথায়? কোথায় আবার? টিফিনবাক্সে! ভাজা কচুরি দিব্যি থেকে যাবে সারা রাত। পরের দিন ভোর সাড়ে চারটেয় স্টেশনে নেমে বাড়ি ফিরে তো মায়েদের জলখাবার করার শক্তি থাকে না সব দিন। সেই বাসি কচুরি দিয়ে দিব্যি সোমবার সকালের জলখাবার সারা হয়ে যাবে। ছেলেরা খায় না। বলে, "বাজে কচুরি। ভেতরে ধুলোর পুর দেওয়া। ছুঁড়ে মারলে সুদর্শন চক্রের মত গলা কেটে যাবে।" মায়েরা যতই বোঝান, "ওরে, ওটা ধুলোর পুর নয়, ছাতুর পুর।" কে শোনে কার কথা!

এদিকে বোন বিদ্যাপীঠে খেলতে খেলতে একদিন ঘাস তোলে, একদিন ফুল কুড়োয়, এক–একদিন শুধুই দৌড়য় মনের আনন্দে। ওদের ইস্কুলে ও সেরা স্প্রিন্টার, কিন্তু খেলার মাঠই নেই যে। খেলতে খেলতে একদিন দেখতে পায় রাস্তার ধারে একজন লম্বা মানুষ স্নান সেরে মন্দিরে জপ সেরে ধুতি পরে খালি গায়ে একটা উত্তরীয় জড়িয়ে হাতে একটা জবাফুল নিয়ে গম্ভীর মুখে হেঁটে আসছেন সারদা সদনের দিকে। ছোট মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে, "স্যার ভালো আছেন?" হঠাৎ রিনরিনে ছয় বছরের গলায় এহেন কুশলবার্তা শুনে শক্তিদা চমকে ওঠেন। একটু থতমত খেয়ে বলেন, "হ্যাঁ ভালো আছি। কিন্তু তুমি কে?" মেয়েটি বলে, "আমি শারদ্বত মান্নার বোন। আসছি স্যার।" বলে আবার নিজের মনে খেলতে খেলতে উধাও। পরে ছেলেটি শক্তিদার কাছেও পরিচিত হবে বোনের পরিচয়ে। এই ছোট্ট সাক্ষাতের ষোলো বছর পরেও ফোন করে শক্তিদা প্রথমেই ছেলেটিকে নিয়ম করে জিগ্যেস করেন, "তোর বোন কেমন আছে?"

বিকেলের খেলার সময় ফুরিয়ে এলে ছেলেরা ধুতি পরতে রওনা দেয় সদনের দিকে আর খেলার মাঠের

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাবা মায়েরা নিজেদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে জমা করেন বড় মন্দিরের সামনে। এইখানে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আরেকটু গল্প করে শাঁখ বাজার আগেই ছেলেরা ঢুকে যাবে মন্দিরে আর আরাত্রিক ভজন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে বাবা মায়েরা দৌড়বেন মেন গেটের দিকে। গোশালা মোড় যাওয়ার বাসটা মিস হয়ে গেলে রিকশা করে স্টেশন যেতে অনেকটা বাড়তি খরচ হয়ে যাবে।

এইরকম এক বিকেলে ক্লাস এইটের ছেলে ধুতি পরতে গেছে সদনে, আর মা-বাবা মেয়েকে নিয়ে হেঁটে আসছেন মন্দিরের দিকে। সারদা মন্দির পেরোতেই তাঁরা দেখেন তিনটি ছেলেকে। তারা মেন গেটের দিক থেকে সদনের দিকে হেঁটে আসছে চোখ মুছতে মুছতে। মা একটু অবাক হয়ে বাবাকে জিগ্যেস করেন, "ওরা কাঁদছে কেন?" বাবা বলেন, "ওদের গার্জেনরা সব অনেক দূর থেকে গাড়ি করে আসে তো। একটু আগেই চলে গেলেন। ওরা তাই কাঁদছে।" মা কোনওদিন নিজের ছেলেকে সামনে কাঁদতে দেখেননি ইস্কুলে পড়ার পর থেকে। একটু গম্ভীর হয়েই সে যেন প্রণাম করে মন্দিরে ঢুকে যেত বরাবর। হাত নাড়ত দূর থেকে। মা আবার অবাক হয়েই জিগ্যেস করেন, "সত্যি বলছ?" বাবা একটু অধৈর্য হয়ে বলেন, "আবার কী!"

"ভালো স্কুলে পড়তেই হবে বাবা। ঢোকার আগেই যা পরিশ্রম। ওখানে গিয়ে পড়লে দেখবে আবার খুব খেলাধুলো করতে পারবে। এই বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশনের মতই পড়ার চাপ। একটুও বেশি না।" পাঁচ বছর আগে নিজের বলা কথাগুলো মায়ের কানে ফিরে ফিরে আসতে থাকে। মুখ নিচু করে কে সি নাগ আর বুনিয়াদী আদর্শ গণিত কষতে থাকা ছোট ছেলেটির মুখ মনে পড়তে থাকে। সেই দিন ছেলে ধুতি পাঞ্জাবি পরে মন্দিরে ঢোকার আগে প্রণাম করার সময় ছেলে ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পাঁচ বছর পরে মা কেঁদে ফেলেন। কান্না থামে না। বাস, রিকশা, হগওয়ার্টস এক্সপ্রেস পেরিয়ে হাওড়া শহরের ছোট্ট ফ্ল্যাটে সে কান্না সঙ্গ দেয়। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। সেই কান্না অবচেতনে চলে। দীর্ঘ দিন ধরে ঘুমের মধ্যে মা স্বপ্ন দেখেন, তাঁর তিন সন্তান। একটি ছোট্ট মেয়ে, পাশে শুয়ে তাঁর গায়ে পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। একটি বড় ছেলে, গলা ভাঙতে শুরু করেছে, হাতে পায়ে বড় হতে শুরু করেছে। বড় ভাল। বড় বাধ্য। বিদ্যাপীঠে পড়ে। অনেকদিন পর পর বাড়ি আসে। আর মাঝে আছে আরেকটি ছেলে। বাড়িতেই থাকে। মুখ নিচু করে অঙ্ক কষে, খুব চঞ্চল বলে কানমলা খায় প্রায়ই। সুযোগ পেলেই গল্পের বই পড়ে। খেতে খেতে বই পড়ে। পড়তে পড়তে খেতে ভুলে যায়। ডাল মাখা ভাত থেকে জল ছেড়ে আসে, ছেলে উপেন্দ্রকিশোর পড়ছে। স্বপ্নে মা জানেন ছেলেটি আছে। ঘরেই আছে। কিন্তু ছেলেটিকে তিনি কোথাও খুঁজে পান না। এক মেয়ে। পাশেই শুয়ে আছে। বড় ছেলে, শান্ত, হাতে পায়ে বড়। গলা ভাঙছে সদ্য। বিদ্যাপীঠে আছে। মুখচোরা চঞ্চল গল্পের-বই-মুখো ছেলেটা কই? ইস্কুল থেকে মা ফিরে গেলে সদনে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসার কথা যার, সেই ছেলেটা কই?

এই দীর্ঘ ডিপ্রেশন শনিবারের হগওয়ার্টস এক্সপ্রেসগামী বাবা-মায়েদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। সন্তান আর বায়োলজিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট গুলিয়ে যেতে যেতে, 'কোশকেঁধে'দের মত লাগেজ বওয়া বাঁকা কাঁধ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, পুরুলিয়ার মেঠো চায়ের দোকানে গল্প করতে করতে ছেলেদের বাবা-মায়েদের যাত্রা চলতেই থাকে। মুখগুলো বদলে বদলে যায়। অনির্বাণ তার বীণা শোনে অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ। যার শেষ ট্রেন ছেড়ে গেল, সে কি কাঁদবে? কাঁদে না। ছিঃ!

লেখক বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগে পি এচ ডি গবেষণারত

বর্ণমালার গল্প

চিন্ময় গুহ (২০১৩)

বিবেকমন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একদিন X Yকে ইশারা করে বলল ওই দেখ! Y বলল কী? X বলল, ভোলানাথদার সাইকেল। তারপর দু'জন মিলে হেলতে দুলতে গিয়ে হাওয়া খুলে কেটে পড়ল। Y ছেলে হিসেবে যে ওরা খারাপ ছিল তা নয়। কিন্তু আগের রাতের স্টাডি হলে কী এক ভয়ংকর যুক্তি তর্কের মাঝে ভোলানাথদা চলে এলেন এবং এক্স আর ওয়াই এর কান টেনে ধরে, চুলমুঠি করে তুর্কিনাচন নাচিয়ে দিলেন। এতে ওদের নিষ্পাপ নিরীহ মনে অভিমানের বাষ্প এসে জমল। পরদিন সেই বাষ্পই সাইকেলের হাওয়া হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই বাজল যুদ্ধের দামামা। খোঁজো, ধরো, লাঠি দাও ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ। তন্ময় মহারাজের ঘন ঘন পদচারণা। অবশেষে সারাদিন হাঁটাহাঁটি, খোঁজাখুঁজির পর সত্যদা মহারাজের হাতে একটি লাঠি তুলে দিলেন ও মহারাজ X-Yদের সেকশনে এসে পিটিয়ে দিয়ে গেলেন, কিন্তু মার খেল M ও N। অভিমানের যে বাষ্পটা সকালবেলায় সাইকেলের হাওয়া হয়ে বেরিয়েছিল, ঘুরে M-N-এর মনে ঢুকে গেল। শুধু তাই নয়, সেদিন ছিল মঙ্গলবার। মাংসের দিন। অকারণে মার খেয়ে M ও N অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাই স্টাডি ওভারের পর ডাইনিং হল ছোটার যে রেসটা হয় সেখানে গোহারান হারল। ওরা পৌছতে পৌছতে বেশ কয়েকটা মাংসের পিস বাটির উপরিভাগ থেকে হাওয়া হয়ে গেল।

জীবন একটাই, ওৎ পেতে আছে দুষ্কৃতীদল। একটু আলগা দিয়েছ কি হাওয়া করে দেবে সবকিছু। একবার, এমনই একটি তত্ত্ব অনেকক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন অঙ্কের স্যার বিভাসদা। শেষ বেঞ্চের P-Q-R-S-T সবাই ফিকফিকিয়ে হাসছে দেখে বিভাসদার অভিমান হলো। তিনি ফিলোজফি চেঞ্জ করে বললেন, "যাচ্ছে যাচ্ছে, তোর বাপের যাচ্ছে আমার তাতে কি?" পরিস্থিতি আরো মজাদার হল। যে ছেলেগুলো এতক্ষণ ফিকফিক করে হাসছিল, তারা হে হে করে হাসতে লাগল। J-K এই সুযোগে পেন ফাইটিং লাগিয়ে দিল। বিভাসদা বিহ্বল হয়ে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি নিরীহ ছেলেকে বেছে পিটিয়ে অঙ্কে মন দিলেন।

আমাদের বিদ্যাপীঠে টিচাররা যেমন সময়ে-অসময়ে সাবধান করতেন, তেমনি ছাত্ররাও না শুনে অবলীলায় বিশ্রাম করত। এমনই একদিন বিশ্রামের দিনে একঘর ছেলে ক্লাসরুমে বসে ঘুমুচ্ছে, পড়াতে এলেন মৃত্যুঞ্জয় রজকদা। স্যার বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে কাউকেই প্রায় ওঠাতে পারলেন না। ব্যর্থ মনে চেয়ারে বসে পড়লেন। ফার্স্ট বেঞ্চের আশেপাশেই বসত L, দেখলে এই সুযোগ, সবাই ঘুমুচ্ছে। ভাবল তেল দিয়ে স্যারকে পটিয়ে নেবে এখুনি। সেইমত স্যারের টেবিলে পড়া বুঝতেও গেল। ওদিকে চুলের যত্ন নিত V। কথা বললে ঘুমের ডিসটার্ব হবে এই ভেবে একটা নিহার তেলের ছোট কৌটো পাস করে দিল। কৌটোটা যখন ফাস্ট বেঞ্চ পর্যন্ত চলে এল, শেষ জন A, L-এর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, নে ভালো করে লাগা। বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বিদ্যাপীঠ জীবনের এই এক সমস্যা। ছেলেরা যখন তখন ঘুমোতে চাইত। সেখানে অভাবের তালিকায় শীর্ষে ছিল ঘুম। ছেলেরা স্টাডিতে ঘুমোত, ভজনে ঘুমোত, স্কুলে ঘুমোত। এমনি একদিন, হুইহাজার হদ্দো সালের সোমবার, বর্ণমালার সমস্ত আলফাবেট 'পোস্ত খেয়েছি' এই তত্ত্ব খাড়া করে ঘুমুচ্ছিল। জানলা দরজা বন্ধ, জুতো মোজা খোলা। এমন সময় বিদ্যুৎদা দরজা খুলে ঢুকলেন আবার বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়েও গেলেন। এতো বিপুল পরিমাণে গন্ধে তিনি হাপুচুপু তো খেয়ে গিয়েছিলেনই, সঙ্গে খাওয়াও হয়নি। জানলা দরজা খুলিয়ে ডাইনিং হলে খেতে গেলেন। ছেলেরা নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে ছিল। রূপ, রস, গন্ধ এসব নিয়েই তো প্রকৃতি। সবই তো সেই

এক প্রকৃতিরই অংশ। কিন্তু নিজের বলতে যেটুকু সেটা তো ঘুম। তাই পায়ের তলায় ভাঙা মোজা রেখে তারা আবার ঘুমিয়ে গেল। বিদ্যুতৎদা ঘুরে এসে দেখলেন, অন্ধকার আগের মতোই বিদ্যমান। এরপর আর তিনি কিছু বললেন না। লাঠি কথা বলল। প্রথম থেকে শেষ, একবারে লাইন করে। সকলে দুঃখ পেল। স্যার চলে গেলে সকলে মন ভালো করতে আবার জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকলে মিলে মার খাওয়ার এই মজা। ভাগে কম পড়ে, আবার মনকেও ছুঁতে পারে না। এমনি একবার ঘটেছিল ডাইনিং হলে। তৎকালীন ভান্ডারী মহারাজকে বড়ো হাতের ABCD-দের বৃহৎ একটা দল মাওবাদী বলে ডাকত। এর কারণ তিনি চেহারায় লম্বা-চওড়া এবং পিটিয়ে তক্তা করে দিতে পারতেন। একদিন রাতে নয় নম্বর ডাইনিং হলে ছেলেরা শসার তরকারিকে ভালো চোখে দেখল না, ভাবলে প্রতিবাদ করি। কিন্তু কীভাবে? ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন মাও মাও বলে চেচিয়ে উঠল। তাই দেখে MNOPQRST সবাই সমস্বরে চেঁচাতে লাগল। সেই সমবেত আওয়াজ বিদ্যাপীঠের দুরদুরান্ত ছুঁয়ে গেল। প্রতিবাদকারী ছাড়া কেউ সেই মাও ডাকের অর্থ বুঝলো না। সবাই ম:যাও ভেবে ভুল করল। দু' চারটে বেড়ালও প্যাট প্যাট করে তাকাল। কিন্তু এসবের মধ্যে চলে এলেন ভান্ডারী মহারাজ স্বয়ং। দুজনকে ধরেও ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। তারা প্রথমে "আমি করিনি" বলতে যাচ্ছিল, তারপর পরিস্থিতির গভীরতা দেখে মত পাল্টাল। এদিক ওদিক করে জনা দশেক ছেলেকে দেখিয়ে দিল। তারা আবার মরিয়া হয়ে আরো 20-25 জনকে দেখিয়ে দিল। দিনের শেষে যেটা দাঁড়াল সেটা হল অপরাধীদের একটা নিরাপদ সংগঠন। শাস্তি হিসাবে পিঠে একটা চাপড় এবং "আর হবে?"-র উত্তরে - "না।" ব্যাস। কিন্তু এই মহারাজই যদি একা কাউকে একটা গোটা অপরাধের জন্য পেতেন? পেয়েও ছিলেন। ক্লাসের মোটা ছেলে W একদিন বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে দেখল মহারাজের গাছে হলুদ-রঙা বাতাবী। যেন আয় আয় বলে ডাকছে। অনেক চেষ্টা করেও সে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। আরেকজন বন্ধু জুটিয়ে পাঁচিল ডিঙোল। বাতাবী পাড়ল। কিন্তু ওই ভারী শরীরের হাঁটা চলায় মহারাজ বুঝে গেলেন। মহারাজের ঘর খোলার আওয়াজে এরাও বুঝে গেল যে মহারাজ বুঝে গেছেন। লেবুদুটো ওখানেই লুকিয়ে বেরিয়ে এল এবং উভয়পক্ষের বোঝাবুঝির মাঝামাঝি একটা স্তরে তাদের সাক্ষাৎ হল। মহারাজ পেটাবার আগে সৌজন্যবশত একবার জিজ্ঞেস করলেন, "বাগানে ঢুকেছিলিস?" সেটাতেই আবার সহকারী বন্ধুটি জোর গলায় "না" বলে ফেলল। তারপর উদুম পেটানি, এলোপাথাড়ি মার। অবশেষে দু'জন মিলে মার খেয়ে, মারের শেষে আইসক্রিম এবং "আর হবে না" চুক্তি করে তারা সদনে ফিরল। কিন্তু সদন যে ভালো জায়গা নয় সে আর নতুন কী! সেখানে জনা কয়েক সুবিধাবাদী চরম ধিক্কার দিয়ে বলল, "ছি ছি, করেছিস কি? লেবুটা পেড়েছিস, মার খেয়েছিস, আর লেবুটাই আনিসনি?" W নতমস্তকে কিছুক্ষণ ভাবল। এ লজ্জা ও কোথায় রাখবে! অবশেষে ভারী শরীর নিয়ে আবার সেই বাগানে গেল। লজ্জাটা রেখে লুকোনো লেবুদুটো সঙ্গে করে নিয়ে ধামে ফিরল।

W-র জন্য ধামে ফেরা সহজ হলেও একবার টয়লেট গিয়ে স্টাডি হলে ফিরতে অসুবিধায় পড়েছিল C। C ছেলে হিসাবে বরাবরের চুলবুলে। একদিন ক্লাস টেনের রাতের স্টাডিতে আটটার দিকে ওর টয়লেট পেল খুব। স্টাডিহলের শেষ প্রান্তে বসে ছিলেন আশারু দা। টেবিলের সামনে কয়েকজন ঘিরে ধরে নিজের নিজের মতো অঙ্ক বুঝছিল। বিছুটি ছেলে C স্যারের কাছে গেল। এবং ভিড়ের মধ্যে থেকে "স্যার টয়লেট যাবো" - বলে চেচাতেই কারেন্ট চলে গেল। আর কারেন্ট গেলে যা হয় - গোটা স্টাডি হল তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল। C-ও এই সুযোগে হাতের সামনে অনেকগুলো মাথা পেয়ে একটার মাফলার ধরে আচ্ছাসে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেল। এরপর কারেন্ট ফিরতেই চারিদিক আবার শান্ত। আশারুদা গুরুগম্ভীর মুখ করে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। যেন কাউকে একটা খুঁজছেন। এমন সময়ে টয়লেট করে ফিরল। আশারুদাকে দেখে তো রীতিমতো অবাক। থতমত খেয়ে

দেখল, চারপাশ ঘেরা অত ছেলের মাঝে কেবল আশারুদাই একা মাফলার পরে আছেন।

সময়ের নিরিখে বিদ্যাপীঠের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তার ঘটনা পরম্পরা, তার আবেগ, তার ভক্তি-শ্রদ্ধা-ঘুম সব একইরকম, একইধাঁচের। তফাৎ শুধু নামে। প্রতি ব্যাচেই এক-তৃতীয়াংশ ছেলে থাকে যারা পৃথিবীটাকে অন্যরকমভাবে দেখে, যারা ভূগোল ক্লাসে ঘুমোয় এবং ফাঁকা সময়ে নিজেই একটা পৃথিবী বানিয়ে বিদ্যাপীঠেই কোনও এক কোনায় লুকিয়ে দেয়। এদের নাম দিয়ে চিহ্নিত করে শেষ করা যায় না, নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে অপরাধী করা যায় না। এদের ভ্যারিয়েবল নামের আড়ালে বইতে দিতে হয়। তাতে এরা নতুন নতুন পৃথিবী বানিয়ে সংগ্রামের মাজা ভেঙে দিতে পারে। ততশো-ততো সালের ঘটনা, এমনি একটি পৃথিবী বানিয়ে ফেলেছিল k2, একেবারে বেডের তলায়। বিদ্যাপীঠে বছর ২-৩ কাটিয়ে ও বুঝেছিল, এখানে স্ট্রাগল বলে যদি কিছু থাকে তা সকালের ড্রিল। তাই ভজনের ঘন্টা পড়লেই ও বেডের নীচে ঝুঁকে গোটানো পৃথিবীটাকে টানত। তারপর ওই পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘন্টাখানেক গায়েব হয়ে যেত। এমনভাবে কয় মাস কয় দিন গেছে জানি না, একদিন নাগেশ্বর মহারাজ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। আশঙ্কা করলেন, এমন ভাবে ছেলেরা পৃথিবী বানাতে থাকলে তো বিদ্যাপীঠই বেদখল হয়ে যাবে! আর দেরি করলেন না। গরু ঠেঙানোর পাঁচনে একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলে ব্যাপারটির রফা করলেন। সাথে সাথে আরো অনেক গোপন পৃথিবী গোপনেই হারিয়ে গেল।

বিদ্যাপীঠে শীতকাল ছাড়া ক্রিকেটের চল ততটা না থাকলেও রুম-ক্রিকেট, লন-ক্রিকেট ভালোই চলত। একবার কোনো এক ব্যাচের চারটি ছেলে ক্রিকেট খেলার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে সুদুর ডেয়ারি পর্যন্ত চলে গেল। মানে ডেয়ারি যাওয়ার মুখে গুরুপল্লীর রাস্তা যেখানে শুরু হয়, সেখানটা বিশেষ চওড়া। ওরা মিনিট কয়েকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে খেলা শুরু করে দিল। খেলা যখন মাঝামাঝি অবস্থায়, ডেয়ারির মহারাজ লক্ষ করলেন কতগুলি ছেলে গুরুপল্লীর গেটটা লাগিয়ে ওটাকেই উইকেট করে ক্রিকেট খেলছে। এমন অনাসৃষ্টি কান্ড তিনি আগে দেখেননি। তৎক্ষণাৎ একটি কাকুকে পাঠালেন ছেলেগুলোকে ধরে আনতে। কাকুও ওদের কাছে এসে ধমকের সুরে বললেন, এই তোদের নাম কী রে, চল মহারাজের কাছে? এসব শুনে ক্রিকেটের দলটা কিছুটা ঘাবড়ে গেল তারপর সামলে নিয়ে বলল, আমার নাম প্রশান্ত মন্ডল, ও পঙ্কজ বেরা। অন্যজন বলল, আমি দেবাশিস চ্যাটার্জী ও আরেকজন শুকদেব মাইতি। বলেই একছুটে সদন কেটে পড়ল।

বিদ্যাপীঠে সব সদনের বাইরেও আরেকটি সদন ছিল। সদানন্দ সদন, মিনি হসপিটাল। গ্রীষ্মকালে এই হসপিটালই হয়ে যেত গ্লুকন-ডির দোকান। ছেলেরা নিম্বুপানি, অরেঞ্জ ইত্যাদি বলে চেচামেচি করত। আজকালকার মতো তখনও হসপিটালকে অনেকে পালিয়ে বাঁচার ঠিকানা হিসাবে ভাবত। স্কুলের দুই পিরিয়ডের রিসেসে - তাদের অবাক করা পেটব্যথা হত। হেডমাস্টার মহারাজের কাছে স্লিপ বাগিয়ে হসপিটালে এসে ঢুকত। এই হসপিটালের উত্তর দিকের ঘরে বসতেন পাগলা ডাক্তার। তখন কতশো-কত সাল। কুল পাড়তে গিয়ে ঢিল পড়ল G-এর মাথায়! মাথা ফুলে ঢোল। কোনো রকমে হসপিটাল এসে পাগলা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতেই সে এক আরেক কাণ্ড। ভালো করে দেখে প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলেন একটি অমৃতাঞ্জন ও একপাতা ডাইজিন। G বিহ্বল হয়ে কিছুক্ষণ ছুটে বেড়ালো ও শেষে গোলকদার কাছে বরফ লাগিয়ে ঘরে ফিরল। এই খবর বাজারে আসতেই হইচই পড়ে গেল। তখন জনৈক স্যার আরেকটি গল্প জানালেন। বললেন একবার এই পাগলা ডাক্তারের কাছেই নাকি পেটব্যথা দেখাতে এসেছিল নিচু ক্লাসের p। তা তিনি ভালো করে দেখে বলেছিলেন, "ভলিনিটা লাগিয়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজটা বাঁধ গা। ঠিক হয়ে যাবে।" সেবার নাকি ডাইজিনটা দেননি।

বিদ্যাপীঠের জীবনে এমন অনাসৃষ্টি প্রায়ই ঘটত। আজীবন সাধনা করে আসা মহারাজ কটা আমের জন্য বিহ্বল হয়ে যেতেন। দিনের পর দিন অবহেলিত হয়েও কোনো এক কাকু প্লে ওভারের ঘন্টা বাজাতে ছাড়ত না। কোনো

এক দাদা রাত দু'টোকে সকাল ভেবে রাইজিং বেল মেরে দিত। আবার তিনশো চৌষট্টি দিন নোংরা থাকা ছেলে জন্মাষ্টমীর দিন সকালে ফার্স্ট হবে বলে জীবন লড়িয়ে দিত। কিন্তু এসব শান্ত মনে মেনে নেওয়া গেলেও একবার ভীষণ রকম অবাক হতে হল। সেবার কৌরব-পাণ্ডব ম্যাচ সবে শুরু হয়েছে। হওয়া উচিৎ নয় তবু কৌরবদের সাপোর্টার চেঁচিয়ে মাঠ মাথায় করছে। আমি ধর্মের পক্ষেই ছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখলাম যে ভাইটা সকালে কৃষ্ণ হয়েছিল সেও কৌরবদের হয়েই চেঁচাচ্ছে। এক মুহূর্তে কলিযুগটা মাঠের মাঝে ভেসে উঠল, শকুনি সাইড পুশ দিতেই অর্জুন দু'হাত ছিটকে পড়ল। ভগবানের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে কৌরবরাই সেবার ম্যাচ জিতল।

তবে সব খেলায় হার-জিৎ থাকলেও, বিদ্যাপীঠের সব খেলা যে হার-জিৎ দিয়ে পরিসমাপ্তি হয়েছে এমন নয়। এর প্রকৃত উদাহরণ ক্লাস টেনের রিলে রেস। কোনো একবার ক্লাস টেনের ছেলেরা রিলে রেসে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। ক্লাসে ইউনিটি তখন তুঙ্গে। প্ল্যাটুনে প্ল্যাটুনে ঝগড়া ততদিনে মিটে গেছে। তাই আপামর জনসাধারণ মিলে ঠিক করল তারা জিতবে না। আবার হারবেও না। সবাই একইসঙ্গে ছুটে ঘরে ঢুকবে। এর জন্য বিশেষ ভাবে টিম বাছাইও শুরু হল। কোনোদিন ছোটেনি বা অমুক তারিখে একবার ছুটেছিল এমন চারজন করে যোগ্য যোদ্ধা প্রতিটি ট্রাকে এসে দাঁড়াল। এরপর রেস শুরু হতেই তারা একে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করে ছুটতে লাগল। কেউ কাউকে এগুতে দিল না, কেউ কাউকে পিছনে ফেলল না। বিদ্যাপীঠ এরকম জিনিস দেখেনি। নাগেশ্বর মহারাজ দেখেই ক্ষেপে গেলেন। ওখান থেকেই সকলকে সাসপেন্ড করার হুমকি দিতে লাগলেন। ওরই মাঝে একজন B, তার মনে হঠাৎ ফাস্ট হওয়ার লোভ জন্মাল এবং জোরে ছুটতে শুরু করে দিল। টেনের ছেলেরা বাইরে থেকে হুমকি দিয়ে তাকে নিরস্ত করল। অবশেষে রেস যখন 4th ল্যাপে - প্রতিযোগীরা প্ল্যানের থেকেও আরেক ধাপ এগিয়ে সকলে হাত ধরাধরি করে ঘরে ঢুকল। এবং তার সাথে সাথেই রেসটি ডিস্কোয়ালিফায়েডও ঘোষিত হয়ে গেল। মহারাজরা তখন হেবিব খাপ্পা। অভিমানের যে বাষ্প তা এতদিন A থেকে Z এ ঘোরাঘুরি করছিল তা কর্তৃপক্ষের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। পরদিন বিশেষ তলব হল। সকালে দশটার দিকে সমস্ত ক্লাস টেন সেক্রেটারি মহারাজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওয়ার্ডেন অরিজিৎ মহারাজ কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। সমস্ত ক্লাসকে সাসপেন্ড করে বাড়ি পাঠানোর কথাও উঠল। অবশেষে সমস্ত CBI, ED-র শেষে এক প্রবল বৃষ্টির দিনে ঝালমুড়ির আদর্শ গন্ধে সমস্ত মনোমালিন্য মিটে গেল। অভিমানের সমস্ত বাস্প জল হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। বিদ্যাপীঠ না হেরে, না জিতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকল।

লেখক পি এচ ডি গবেষক

পড়ার বইয়ের বাইরের পড়া

পৃথু হালদার (২০১৪)

"কী কী পড়িয়াছ?

–আজ্ঞে, মুদ্রিত যাহা কিছু তাহা সকলই পড়িয়াছি। এমনকি অমুদ্রিতও কিছু কিছু পড়িয়াছি।"

ঊনবিংশ শতাব্দী। প্রশ্নকর্তা অজ্ঞাত, উত্তরদাতা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই অনবদ্য প্রশ্নোত্তরপর্ব যাদবপুরের অধ্যাপক অভিজিৎ গুপ্তের মুখে শোনা।

বিংশ শতাব্দী। 'এবং মুশায়েরা'র প্রস্ত বিশেষ সংখ্যায় সতীনাথ ভাদুড়ির লেখা ডায়রির পাতা। ভাদুড়ি মশাই লিখেছেন, তাঁদের কলেজ জীবনে কে কে প্রুস্ত এর Remembrance of Things Past এর সব খণ্ডগুলো শেষ করেছে তা নিয়ে সবসময়ে বাজার সরগরম থাকত।

একবিংশ শতাব্দী। ক্লাস ফাইভ। অকুস্থল বিদ্যাপীঠ।

– আমার টিনটিনের সব খন্ডগুলো পড়া শেষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এমনকি শেষ খণ্ড 'টিনটিন অ্যান্ড দ্য আলফ আর্ট'ও পড়ে ফেলেছি।

– কোথায় পেলি?

– বলবো কেন?

– তুই ফেলুদার কটা গল্প পড়েছিস?

– আরে থাম, তুই ক'টা ঘনাদা পড়েছিস?

– আরে, যা যা ওসব তো সবাই পড়ে। তুই ঋজুদা আর পিন্ডিদা পড়েছিস?"

তিনটে শতাব্দী। অনেক কিছু পাল্টালেও, পাল্টায়নি এই একটা বিষয়। পড়া নিয়ে রেলা। প্রথম দুই শতকের দুই নামজাদা পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের মতো আহাম্মকদের ক্লাস ফাইভের কথোপকথনের সমাপতন "ব্যথেটিক" ঠেকলেও, আমি নিজে এই তুলনা টানার জন্য মোটেও ব্যথিত নই। পাঠক পাঠকই। সেখানে গুরুচণ্ডালে ভেদ থাকা উচিত নয়। পাঠকসত্তার প্রগলভতার পরিচয় তাই হয়তো এই প্রবন্ধের নামের মধ্যেও বিদ্যমান। শঙ্করলাল ভট্টাচার্য তাঁর "পড়ার বইয়ের বাইরের পড়া" নিয়ে লিখেছিলেন নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তনীদের পত্রিকায়। প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীপান্থর লেখা বই আছে একই শিরোনামে। দেবদূতেদের পদপাত যেখানে বিরল মূর্খের উৎপাত যে সেখানেই প্রবল, তাতে সন্দেহ নেই। তাই এই একই শিরোনামে আমিও কলম বাগিয়েছি সমবেত স্মৃতির উঠোনে নিজের ও অন্যদের কাদা পায়ের ছাপ ছেড়ে যাওয়ার লোভে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে আমাদের যাদের ভাগ্যে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বইয়ের ভাণ্ডারের মালিকানা জোটেনি, তাদের অনেকের কাছেই বিস্তৃত বইয়ের দুনিয়া খুলে যায় বিদ্যাপীঠে এসেই। শুরুটা শুরু থেকেই হোক। ক্লাস ফাইভে বহু ছেলেরই বাবা মায়েরা তাদেরকে বই–পত্রিকা দিয়ে যেতেন। রবিবার গার্জেন মিটের পর সেসব বইয়ের জন্য গ্রন্থগৃধ্নু আমাদের উচাটন আর হাপিত্যেশ কোনো অংশে মঙ্গলবারের রাতের মাংসের জন্য অপেক্ষার চাইতে কম ছিল না। তারপর বই নজরে পড়লেই শুরু হত ব্ল্যাকে টিকিট কাটার মতো, বুকিং। কারো যদি তিন বা চারে নাম থাকে (এদিকে তরও সইছে না), তখন শুরু হত অফসাইড। একটু গুঁইগাঁই করলে উৎকোচের ধারাপাত– "ভাই তুই যদি আমাকে আজকের রাতের জন্য বইটা পড়তে দিস, তাহলে একটা জিমজ্যামের প্যাকেট দেব, বা একটা

কিটক্যাট। আরে, কেউ জানতে পারবে না! তুই তো আগেও দিয়েছিস, আমি শেষ করে সকালে ফেরত দিইনি?''

রাতে পড়া নিয়েও রীতিমতো প্রকৌশলী পদক্ষেপ। শিবানন্দ সদনে ক্লাস ফাইভ–সিক্সে থার্ড বেলের পর লাইট অফ হয়ে যেত। আমাদের কাছে নাইট ল্যাম্প রাখারও পারমিশন ছিল না। অগত্যা ''শ্যেননিদ্রা তথৈবচ''। মশারির চালে ক্লিপ দিয়ে আটা থাকত ঝুলন্ত টর্চ আর ইন্টেরোগেশন রুম সদৃশ বিছানার চৌহদ্দিতে বসে গোগ্রাসে বইয়ের কাহিনী গলাধঃকরণ করতে থাকা আমরা। মাঝে পায়ের আওয়াজ পেলেই তড়িঘড়ি টর্চ নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার অভিনয়। এইভাবে রাতের পর রাত চলেছে। প্রায়ই দেখতাম একাধিক টর্চ জ্বলছে ডর্মিটরিতে। সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৌন সম্মতির আভাস জানিয়েই গোগ্রাসে গল্পের বইয়ে ডুব।

ক্লাস ফাইভে ছেলেদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্টাডি হলে শেষ আধঘন্টা গল্পের বই পড়ার ছাড় দেওয়া হত। কিন্তু যতদুর জানি, কেউই সেসব পরোয়া করত না। গল্পের বই খবরের কাগজে মুড়ে মলাটের উপর কোনো ক্লাসের বইয়ের নাম লিখে দেওয়া বা স্টাডিহলে ওপরে পড়ার বই আর নীচে গল্পের বই রেখে দোতলা পদ্ধতি – এসব গুপ্তবিদ্যা সবারই করায়ত্ত ছিল। এ ছাড়াও বই পড়ার স্বর্গরাজ্য ছিল লাইব্রেরি আর হসপিটাল। লাইব্রেরির কথায় পরে বিশদে আসবো, কিন্তু তার আগে হসপিটাল। এখানে কোনোভাবে ভর্তি থাকলে সারাদিন গল্পের বই পড়া যেত। এমনকি অসুস্থতার দোহাই দিয়ে যে–বই বেশ কয়েকদিন বাগানো যায়নি, সেটা নিয়ে যে কেউ কেউ আরোগ্যভবনে চলে গেছে, এমন নজির খুব একটা বিরল নয়।

যখন আমরা বড় হচ্ছিলাম, ততদিনে শহরে এক পশলা ভুবনায়নের বৃষ্টি হয়ে গেছে। পড়ার তালিকার কার্নিশ বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঢুকতে আরম্ভ করেছে আমাদের বিদ্যাপীঠেও। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বন্ধুদের দৌলতে একদিকে হাতে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যারি পটার আর নার্নিয়ার মতো তথাকথিত নিরীহ ফ্যান্টাসি (অন্ততঃ কর্তৃপক্ষের চোখে তাই ছিল, ফলে এসব ব্যান হত না), অন্যদিকে যখন সিক্স–সেভেনে পড়ি তখন এক উদীয়মান আই–আই–টিয়ান লেখক ভারতীয় বইয়ের বাজারে এসে এমন আগুন লাগালেন, যে তাতে ছ্যাঁকা লাগতে আরম্ভ করল সুদুর বিদ্যাপীঠে বসে থাকা বয়ঃসন্ধির কিশোরদের মনে। সেসব বই ব্যান হওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি জানলে চেতন ভগত (যাকে আমরা ''চৈতন্য ভাগবত'' বলে ডাকতাম) নিজেকে ডি এইচ লরেন্স, সালমান রুশদি, নাবোকভ, জয়েস এর মতো নিন্দিত ও ভুবনবন্দিতদের সমকক্ষ বলে মনে করতেন। নিষিদ্ধ বই পড়ার প্রেরণা ও তাড়না দুইই সেই বয়সে থাকে বেশি। মনে আছে, ক্লাস সেভেন, না এইটে লাইব্রেরিতে গিয়ে 'ন হন্যতে' চেয়েছিলাম, লাইব্রেরিয়ান সুবত দা বলেছিলেন, ''আরেকটু বড় হও, পড়বে''। সুনীলের মতো বলতে ইচ্ছা করেছিল, ''নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এ ঘরের ছাদ ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর?'' ক্লাস নাইন টেনে যখন প্রতি বুধবার আর রবিবার লাইব্রেরিতে পড়তে যেতে পারতাম, তখন শরদিন্দুর ''ঐতিহাসিক কাহিনিসমগ্র'' পড়ার জন্য রীতিমতো লাইন পড়ে যেত। বইটার যে কপিটা লাইব্রেরিতে ছিল, সেটা হার্ডবাউন্ড হলেও ছেলেদের অতি–উৎসাহী অতিব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছিল। কোনো এক বিশেষ সময়ের পাঠ্য ক্লাসিকে সময়ঘড়ির মানচিত্র তেমন একটা ধরা পড়ে না। ক্লাসিকের রুচিবোধ বদলাতে প্রায় একটা যুগ লেগে যায়। যেটা পাল্টায় ঘন ঘন, তা হল এইসব গড়পড়তা পপ রিডিং বা তেমন নয় কোনো এক যুগে ছাত্ররা যদি বিটলস আর পিঙ্ক ফ্লয়েডে মজে, পরের প্রজন্ম এমিনেম আর এড সেরানে। তাই আমাদের সময়ে চেতন ভগত আর আমীশ ত্রিপাঠীর কাটতি ছিল খুব বেশি। আমরা পাশ করে বেরোনোর পর নির্ঘাত এখন সে জায়গা নিয়েছে স্মরণজিৎ চক্রবর্তী। নিশ্চিত বিদ্যাপীঠে আমাদের পূর্বসূরিরা স্বপনকুমার পড়ে থাকবেন, কিন্তু আমাদের সময়ে সে পাঠ চুকিয়ে জায়গা নিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল ভৌমিক, উত্থানপদ বিজলি, অদ্রীশ বর্ধন, পথ্বীরাজ সেন, হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত প্রমুখরা। এঁদের মধ্যে অনিল ভৌমিকের ফ্রান্সিস খুব কম আলোচিত, খুবই কম আলোচিত পৃথ্বীরাজ সেন। সেসময়ে

মনে আছে, লাইব্রেরিতে পাওয়া যেত প্রচুর ক্লাসিক ইংরেজি বইয়ের বাংলা অনুবাদ। সেগুলোর অনেকগুলোই আবার ইস্যু করা হত। এগুলোর অনেকগুলোই নির্ঘাত সেনবাবুর করা। তাঁর অনুবাদের তালিকা ভুবনপ্রসারী। জুলে ভার্ন, এরিক ফন দানিকেনও ঘুরত অনুবাদেই। লাইব্রেরি ঠাসা ছিল ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য বা অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট এর মতো বইয়ে। একখানা দুর্মূল্য ''হ্যারি পটার সমগ্র''ও লাইব্রেরির তাকে সাজানো থাকত। সেটা কেউ কোনোদিন ইস্যু করেছিল বলে আমি দেখিনি।

অর্হেন্তিনার জাতীয় গ্রন্থাগারের মহাসচিব ছিলেন আলবের্তো ম্যাঙ্গুয়েল। তার লেখা এক বিখ্যাত বই ''আ হিস্ট্রি অফ রিডিং''। পড়ার ইতিহাস। সেখানে চোখ বুলালে যা উঠে আসে, তা তো কেবল গড়পড়তা আদর্শ পাঠ নয়, বরং কোনো জাতির পাঠ্য যা, তার সবকিছুই। আমাদের বিদ্যাপীঠের যদি সেরকম কোনো হিস্ট্রি অফ রিডিং তৈরি করা যায়, তবে নির্ঘাত তার ঠিকুজিকুলজি খুব আকর্ষণীয় হবে। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ সাহিত্য ছাড়াও হয়তো ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বাংলার ক্লাসিক ছোটদের বইগুলো। সত্যজিৎ রায় তো ছিলেনই, সঙ্গে থাকবেন অবনীন্দ্রনাথ, শীর্ষেন্দু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ দেবনাথ, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মহাপুরুষের জীবনী, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের জীবন প্রায় প্রত্যেক ব্যাচেই ঘুরত। মনে আছে, একবার ইতিহাস ক্লাসে শ্যামলদা এক বিতর্কের আয়োজন করেছিলেন গান্ধি বনাম সুভাষ নিয়ে। সদ্য তখন আমরা ''আমি সুভাষ বলছি'', ''সুভাষ ঘরে ফেরে নাই'', ''আমি সুভাষকে দেখেছি'' – এসব পড়েছি। স্বভাবতই ছাত্ররা সবাই সুভাষপন্থী। একা শ্যামলদা ডেভিল'স এডভোকেট প্লে করে আমাদেরকে দুরমুশ করেছিলেন। কাইতিদা ক্লাসে এসে বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি নিয়ে কবিতা লিখতে বলতেন। উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতেন 'বিদ্রোহী' কবিতা, বলেতন 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' না বলে ''শ্রী মধুসূদন দত্ত'' লিখতে, বলতেন বনফুলের ''শ্রীমধুসূদন'' নাটকটা পড়তে। বিদ্যাপীঠের কান ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া রেললাইন দেখে ক্লাস ফাইভের উদাসী ছেলেদের পিছুটানের তুলনা করতেন পথের পাঁচালির রেলের দৃশ্যের সাথে। ইংরেজির দেবাশিসদা বলতেন ঝুম্পা লাহিড়ি, অনিতা দেশাই, রাস্কিন বন্ড পড়তে; সবাইকে অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নার ডিকশনারি কিনিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন কীভাবে ডিকশনারিতে শব্দ খুঁজতে হয়। আশুতোষদা নিউজ পেপার কাটিং পড়ে শোনাতেন ক্লাসে। শক্তিদা আর স্বপনদার ঘরে ছিল প্রচুর বই। সেখানে ছাত্রদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। তুহিন মহারাজ আর অরিজিৎ মহারাজের কাছেও ছিল বইয়ের ভাণ্ডার। তুহিন মহারাজ যখন বিদ্যাপীঠ ছেড়েছিলেন, বহু বই ছাত্রদেরকে দিয়েছিলেন, কিছু দিয়েছিলেন লাইব্রেরিতে। অরিজিৎ মহারাজ আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তাঁর মতো পিডিএফ গুছিয়ে রাখতে আমি আজও খুব কম লোককে দেখেছি। বিদ্যাপীঠ ছাড়ার সময় ন' আলমারি বই ছিল। নিজেকে বলতেন 'বই-বাহিক'। বলতেন ''এই বইয়ের চাপেই একদিন মরে যাবো''।

এই সীমিত পরিসরে বহু শিক্ষক বাদ পড়লেন, যাঁরা আমাদের ঋদ্ধ করেছেন হরেকরকমের পড়ার প্রেরণা দিয়ে। সব পড়া যে বই পড়া তাও নয়। প্রকৃতিকে পড়া, মানুষকে পড়া, পরিস্থিতিকে পড়া – এগুলোরও হাতেখড়ি বিদ্যাপীঠেই। আজ যখন বিদ্যাপীঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসার এত পরেও, ''হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'' বিদ্যাপীঠের, বা সর্বোপরি রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো দাদা বা কোনো ভাইকে দেখি, তখন প্রায়শই তাদেরকে চিনতে অসুবিধা হয় না তাদের পাঠবিস্তার আর জ্ঞানের ব্যাপ্তি দেখে। এই বিবিক্তি জ্ঞানের, এই বিবিক্তি সান্দ্র প্রজ্ঞার। কীভাবে? ওই যে! জনান্তিকে পেলে তারা হয়তো ফিসফিস করে বলবে, ''মুদ্রিত যাহা কিছু তাহা সকলই পড়িয়াছি। এমনকি অমুদ্রিতও কিছু কিছু পড়িয়াছি।''

লেখক আই আই টি, তিরুপতি তে হিউম্যানি টিজ - এ পি এচ ডি গবেষক

স্মৃতিমেদুর বিদ্যাপীঠ

শুভাশিসপ্রসাদ বাগচী (১৯৭৫)

প্রায় অর্ধ শতক পরে,
বিদ্যাপীঠ আজও তোমায়
ভীষণ মনে পড়ে।
কোনো এক শীতের ভোরে
পৌঁছেছিলাম তোমার দোরে,
পরম প্রিয় বাবার হাত ধরে।
বিশালাকার প্রধান ফটক পেরিয়ে,
একরাশ কৌতুহল নিয়ে,
হাজির হই সুখের নিলয়ে।
বিশালতার ছোঁয়া লাগে মনে,
প্রবেশ করে প্রণাম জানাই
পূজনীয় মহারাজদের শ্রীচরণে।
তাঁদের স্নেহ তাঁদের মায়ায়
ক্রমে ক্রমে দিন কেটে যায়,
যেটুকু যা হয়েছি আজ আমি,
সবই তাঁদের পরম কৃপা লাভে,
সন্দেহ নেই জানেন অন্তর্যামী।
চারিদিকে নয়নশোভন
মনোলোভা কুসুম কানন,
কি বিচিত্র রূপের বাহার
কেমনে তা করি গো বর্ণন!

সকাল সন্ধ্যা ভজন ঘরে
ঠাকুর মা আর স্বামীজির
আরাধনা ভজন পূজন ধ্যান,
একাগ্রতা এনে সবার স্নিগ্ধ করে মন।
শরীরচর্চার জন্যে সেখানে
উন্মুক্ত সুবিশাল প্রাঙ্গণ
সকাল বিকাল খেলা ব্যায়ামে
সুস্থ সবল সতেজ করে মন,
তেমন করেই শরীরের গঠন।
প্রতিদিন নিয়ম করে পঠন পাঠন,
শিক্ষকেরা জ্যেষ্ঠ দাদার মতন
সহায়তায় থাকেন সর্বক্ষণ।
বিশ্বভুবন খুঁজেও কোথাও
পাবে নাকো প্রতিষ্ঠান এমন।
তাই তো বলি বিদ্যাপীঠের সুখস্মৃতি,
মনের মাঝে তোলে আলোড়ন,
বারে বারে মন করে আনচান,
ফিরে যদি পেতাম সে সব দিন।
আজও সে সব ভাবলে পরে
আনন্দেতে নেচে ওঠে প্রাণ।

লেখক ভারতীয় রেলের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক

জন্মজন্মান্তর

সোমেশলাল মুখোপাধ্যায় (১৯৭৬, উ.মা.)

প্রাচীন ফেরিঘাটের মাঝেই অচেনা এক আলো -
অদেখা তবু দেখেছি ভেবে দু-চক্ষু জুড়াল !
অদেখা তবু দেখেছি যেন,
অচেনা তবু চিনেছি কেন
চেনা-হাজার-আলোর-ছটা-ভোলানো ওই আলো...

তখন চেনা নদীর স্রোতে অচেনা হাতছানি!
জোয়ারজলের চেনা সুরেই অচেনা কোন বাণী!
দুকূল-ভাসা নীরবতায়
অচেনা কোন মুখরতা—
চেনা শ্মশানচিতায় দোলে অচিন শিখাখানি!

যেন বা সবই এই জীবনে প্রথমবার দেখা।
যেন বা সব স্মৃতিরই বুকে বিস্মরণ লেখা!
যেন বা দেখা হবে না আর
বেদনা বিচ্ছিন্নতার
বইতে হবে বাকি জীবন-এই যা ছিল শেখার।

চেনা ফেরিঘাটের মাঝেই অচেনা এক আলো—
অদেখা, তবু দেখেছি ভেবে দু-চক্ষু জুড়াল !
যেন বা কোন অচেনা গ্রহে
এ-ফেরিঘাট নিবিড় মোহে
ভেবেছি চেনা - যেমন চেনা ভেবেছি ওই আলো।

ভেবেছি চেনা ? বুঝিবা তাই বেসেছি তাকে ভালো।
অজানা তবু, অচেনা হায়, অদেখা ওই আলো।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপক

চক্রব্যূহ

ড. নিরঞ্জন গোস্বামী (১৯৭৬, মাধ্যমিক)

যে ছিল শৈশবে, সে কি জরাতেও থাকে?
ক্লৈব্যে নয়, উদ্যমে সে হননের দ্বার
পৌঁছে গেছে, এখন কি জীবন আবার
ফিরাবে নতুন ছন্দ নৃত্যমহোৎসবে?

হয়তো ঘুরেছে সে রাজন্যের স্তবে
জীবনবাঁকের উপকথা সে ভোলেনি
পত্নী, বন্ধু, প্রিয়তমা কে ডাকে আবার
নৃত্যপটু নয় বড়ো, পড়েছে বিপাকে।

লোকায়তে, হে পার্থ, জরাকে ভুলেছ
খ্যাতি, যশ, মেধা যত লুটিয়েছে ভূমে
যযাতি নও তো তুমি, কুম্ভীপাকে চলো
শৈশব চলে যাবে, যৌবনে রটেছ।

বৃত্ত পুনরাবৃত্তিতে কেন্দ্র গেছে দূরে
অলাতচক্রের মত গণ্ডী গেছে কেটে
কোথায় হৃদয় আছে, চাও খুঁজে পেতে?
সিন্ধুর বিন্দুতে তুমি অশ্রুকে রেখেছ।

লেখক ইংরাজির অধ্যপক

মধুপথ

অরূপানন্দ মুখার্জি (১৯৮৩)

Robert Frost এর ‘Stopping by the Woods on a Snowy Evening’ এর ছায়ানুলেখ।

বরফ-জমা দীঘির পাড়ে জল জংলায়
অন্ধকারের উড়িয়ে আঁচল সন্ধ্যে নামে
সঙ্গী আমার ছোট্ট ঘোড়ার অবাক মাথা নাড়া
“পাগল! নচেৎ এ বিভুঁয়ে কেউ কি থামে?”

যার জমি-র এই জংলা বাগান হয়তো তাকে চিনি
পথের ধারে গ্রামের শেষে ঘর
ভাবছি একটু থেমেই দেখি গাছের পাতা কেমন
বরফ ঢেকে ঘুমোয় এ রাতভর

কেমন করে শীতের হাওয়ায় বয়েই চলে কথা
ধুসর চাঁদের মায়ায় কেমন রাতপরিরা জাগে
অনেক কিছু দেখব ভেবেও হয়নি আগে দেখা
এমন রাতে এ পথে পার হইনি কভু আগে

অনেক কিছুই করা’র ছিল করতে পারিনিকো
অনেক কথা বলতে গিয়েও হয়নি বলা
কিছু কথা এবার আমায় রাখতে হবেই হবে
এ রাত জুড়ে এ পথে তাই এগিয়ে চলা

আমার এখন এ মধুপথ নিদ্রাবিহীন একলা চলা।

লেখক অ্যাডভারটাইজিং প্রফেশনাল ও ব্লগার

এবার পুকুর মরছিল

সুমন মুখোপাধ্যায় (১৯৮৭)

পুকুরটা আজ কাঁদছিল
ঝাপসা তোড়ের বর্ষাজলে
মাছগুলো সব নাচছিল।
টুপুর টাপুর জীবন ফোঁটা
হৃদয় মাঝে ঝরছিল,
আলকুশি আর বিছুটি সব
পাড় জড়িয়ে ধরছিল।

পুকুরটা কাল হাসছিল
ঝিলিক ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে
গল্প নতুন লিখছিল।
পানকৌড়ির ডুবের খেলায়
মাছরাঙাটার ভাগ ছিল।
লাল আঁচলের ডুবটা তখন
স্বপ্ন নতুন বুনছিল।
পরশু পুকুর নাচছিল
বৃদ্ধ বটের শুকনো পাতা
মঞ্জীর ধুন তুলছিলো
পুকুর পাড়ের মানকচু সব
মৃদঙ্গতে বোল দিল,
লাল ঘোমটার কন্যা তখন
প্রেমের আবেশ মাখছিল।

এবার পুকুর মরছিল
স্বপ্নগুলো সরিয়ে রেখে
হিসেব খাতায় কেটে - কুটে,
হাসিকান্নার গল্প লিখে
অট্টালিকা গড়ছিল।
জঙ্গলে সব মানুষগুলোর
ভালো থাকার তাল ছিল।
এবার পুকুর মরছিল।

লেখক ফাইনান্স প্রফেশনাল

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে আমার শিল্প-প্রচেষ্টা

সুনীলকুমার পাল

সৌভাগ্যক্রমে আমার ক্ষুদ্র জীবনে শিল্পচর্চার নানান ক্ষেত্রে আমি সর্বদা কাজের সুযোগ গ্রহণ করেছি। চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্প -সমন্বয়ে বঙ্গসংস্কৃতি -সম্মেলন, নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র -সাহিত্য সম্মেলন, রবীন্দ্রমেলা, রবীন্দ্র-ভারতী (সোসাইটি), কংগ্রেস অধিবেশন প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের প্ল্যান, সাজসজ্জা, অলঙ্করণ ইত্যাদি যখন যে-কাজের দায়িত্ব পেয়েছি শ্রদ্ধার সঙ্গে তা পালন করবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু জীবনে ছাত্রাবস্থা থেকে আজ অবধি মাটি, কাঠ, সিমেন্ট, পাথর, ধাতু ইত্যাদি নানা উপাদানে মূর্তি, চিত্র এবং বাড়িঘর প্রভৃতি সরকারি ও বেসরকারি যত রকমের শিল্পকাজ করেছি, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে অন্তরের ধন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিল্পকাজ। বিদ্যাপীঠ পত্তনের সময় থেকে সেখানে কাজ শুরু করেছি, এখনো করছি। আরো অনেক কাজ বাকি। আমায় তা শেষ করতে হবে। তারপর 'ফুরাইলে দিস ফুরাতে'। বিদ্যাপীঠের কাজ আমার শিল্পী-জীবনের পূজা।

আমার জীবনের এই পর্বের একটা সূচনা আছে। ১৯৫৪ সালে বঙ্গসংস্কৃতি -সম্মেলন আর রবীন্দ্রমেলার বন্ধুদের যোগসূত্রে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। কালক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মার আত্মীয়তা ঘটে। সাধারণ মানুষের জীবনেও যে গভীর আনন্দের সঞ্চার হয় তাঁর সঙ্গ থেকে আমি তা টের পেয়েছি। তিনি আমার জীবনের স্বাদ বদলে দিয়েছেন।

এ-সময় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ মাঝে মাঝে পাথুরেঘাটায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ পরিচালিত স্টুডেন্টস হোমে আসতেন। খবর পেলে বন্ধুদের সঙ্গে আমিও যেতাম তাঁর কাছে। মহারাজও পাতিপুকুরে আমাদের বাড়ি এসেছেন, বসেছেন, আমার করা শিল্পকাজ, আমার সংগৃহীত শিল্প-সামগ্রী খুঁটিয়ে দেখেছেন।

একসময় রামকৃষ্ণ মিশন দেওঘর বিদ্যাপীঠের পরিচালনার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হলো। মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গসংস্কৃতির চতুর্থ সম্মেলনে '৫৭ সালে, মাঠে বসে মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, 'মিশনের তরফ থেকে শিল্পকলা নিয়ে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। চলুন দেওঘরে, কিছু আরম্ভ করা যাক।' আমি সম্মত হলাম, কিন্তু কীভাবে হবে জিজ্ঞাসা করলাম। আমায় বললেন, "নিজের ভেবে করবেন।" মাঠে বসেই শর্ত হলো: "বিদ্যাপীঠে গেলে খেতে -থাকতে দেবেন, ট্রেন-ভাড়া দেবেন।" সেই শর্ত আজও বজায় আছে।

তবে দেওঘরে শুরু হলেও প্রকৃত কাজ আমাদের আরম্ভ হলো পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হলো যখন থেকে— পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠার সৃষ্টিকাল সেই তখন থেকে। দেওঘর বিদ্যাপীঠের এক্সটেনশন হলো পুরুলিয়ায়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় একটা ধ্যান জেগেছিল আমাদের শিল্পচেতনায়। তারই আবেশে ২৪০ বিঘা জমি জুড়ে গোটা বিদ্যাপীঠ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। বিদ্যার্থীরা লেখাপড়ার সঙ্গে শিল্পের পরিমণ্ডলে মানুষ হবে, এখানে এই চেষ্টাই আমার কাজ। সবাই জানে এখানকার ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পকাজ আমার রচনা। শুধু আমিই জানি বিদ্যাপীঠের আসল আর্টিস্ট স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ।

সারারাত ট্রেনে চেপে একদিন সকালবেলা পুরুলিয়ায় এসে পৌঁছালাম। কবেকার কথা, মনে হয় যেন সেদিনের সকাল। রেললাইন বরাবর স্টেশন থেকে তিন মাইল উত্তরে ব্রিটিশ মিলিটারিদের পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড প্রান্তর, ভাঙা ভাঙা টিন শেড। এরই মধ্যে দূর থেকে একটা শেডে গেরুয়া বসন নজরে এল। বুঝলাম বিদ্যাপীঠের স্থান। পিছনে প্রাচীন আম আর অর্জুনের বন, নীলাঞ্জন ছায়া।

সবে তখন স্কুল বিল্ডিং "সারদা মন্দির '-এর ভিত কাটা হচ্ছে। পিছনে একটা হস্টেল বাড়ির খানিকটা গড়ে উঠেছে। দ্রুত কাজ চলছে। নিকটেই একটা ভাঙা শেডের এক কোনায় রান্না খাওয়ার সামান্য আয়োজন। আর টিন শেডে সন্ন্যাসীদের থাকার জায়গা। তারই একধারে ঠাকুর -মা-স্বামীজীরও একটুখানি স্থান। যত দিন অন্য বাড়িঘর, গেস্ট-হাউস প্রভৃতি তৈরি হয়নি, তত দিন আশ্রমের অন্য কর্মীরাও এই টিন শেডে থাকতেন, আমরাও যারা কর্মসূত্রে যাওয়া আসা করতাম, এখানেই এক -একটা চৌকিতে থাকতাম। বিদ্যাপীঠ গড়া শুরু হয় এই টিন শেড থেকে। এর বারান্দা ছিল আমাদের আফিস। আমাদের আলাপ-আলোচনার বৈঠক, আমাদের অবসরের বিশ্রামস্থল। আবার কখনো আমার কাজের স্টুডিও। টিন শেডের কথা আমার খুব মনে পড়ে।

এই সময়টা মহারাজের যেমন ডিটারমিনেশন দেখেছি, তেমন উদ্বেগেও থাকতে দেখেছি। পোড়ো জমির অনেক দখলদার থাকে। আশেপাশের লোকেরা বিদ্যাপীঠ হতে দিতে চায়নি। সর্বদা বাধা দিত–টাঙ্গি, সড়কি, লাঠি নিয়ে তেড়ে আসত। এমনই হয়ে থাকে, আজ বিদ্যাপীঠ তাদেরও আপনার। মিশন তাদের এখন বড় ভরসা। সেই সময় মহারাজ মাঝে মাঝে হেসে হেসে বলতেন স্বামীজীর কথাটা —"শ্রীরামকৃষ্ণের দাসোহম্।"

হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ যে -বাড়ির ভিত কাটা হচ্ছে তার প্ল্যান, এলিভেশন আমাকে দেখালেন। সরকারের অনুমোদিত H টাইপের স্কুলবাড়ি এবং এরই ওপর আমার যা -কিছু করবার যেভাবে আমি একে শিল্পভূষিত করতে চাই, আমাকে তার একটা কাঠের স্কেল -মডেল তৈরি করে আমার কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে বললেন। কাজ বুঝে নিয়ে সেই রাতেই ফিরলাম।

ছেলেবেলা থেকে দেখেছি দেওঘর বিদ্যাপীঠ গোছানো, সুশৃঙ্খল, দেশের শিক্ষার একটা আদর্শ পীঠস্থান। পুরুলিয়ায় এলাম, তখন শুধু ফাঁকা মাঠ, এখানে-ওখানে ভাঙা ব্যারাকের স্তূপাকার রাবিশ, যেখানে-সেখানে তখন কাঁকড়া বিছে আর সাপ চোখে পড়ত। পুরুলিয়ার উচ্চমাধ্যমিকের IX, X আর XI ক্লাসের ছাত্রদের জন্য প্রথম ব্যবস্থা হলো দেওঘর বিদ্যাপীঠেরই অংশ হিসাবে। পরে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ স্বতন্ত্র আশ্রম হিসাবে গড়ে উঠল, এখানে জুনিয়ার ছাত্রদের জন্য স্কুল আর ছাত্রাবাস তৈরি হলো। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে হায়ার -সেকেন্ডারি, পলিটেকনিক ও বহুবিধ স্কুল -কলেজের বিস্তার ঘটে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিত্বকালে।

সারদা মন্দিরের কাঠের মডেল হলো, আমার দাদা অনিল পাল করলেন। আমি আর দাদা আমরা একসময় সরকারি প্রদর্শনীর জন্য স্কেল–মডেলের কাজ অনেক করেছি পশ্চিমবঙ্গ তথ্যবিভাগ, 'D.V.C.'-র নানা প্রজেক্ট, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচারের প্রয়োজনে এসব মডেল করেছি description মিলিয়ে। কিন্তু বিদ্যাপীঠের এই মডেলের কাজ আলাদা। অ্যাপ্রুভ করা স্ট্রাকচারে রূপ আরোপের ভাবনা। একটা ধরা -বাঁধা কাঠামোকে চেহারা দেওয়া। আমার পিতৃব্যদেবের তিনটি সিনেমাগৃহের পুরানো ধাঁচ পাল্টে নানাভাবে ভাঙা-গড়া করে বিল্ডিং -এর রূপ বদল করেছিলাম। বাড়িঘর সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণাও জন্মেছিল। কাঠ বা ইঁট বা পাথরের স্ট্রাকচারের এক এক রকমের গড়ন এবং তার সুযোগসুবিধার বশে মন্দির, স্তূপ, গির্জা, মসজিদ গৃহাদি প্রভৃতি কত বিচিত্র রূপ কল্পনা হয়েছে যুগে যুগে। সিমেন্ট ঢালাই এ-যুগের জিনিস। আধুনিক স্ট্রাকচারের সুযোগসুবিধা অনেক, অনেক রকমের আর্কিটেকচারাল-ফিট দেখানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে কংক্রিটের বাড়ি -ঘর বুঝতে কেবল তখন বাক্স আর আলমারি বোঝাত। নয়নাভিরাম কিছু ভাবা হতো না।

একটা স্কুল বিল্ডিং-এ শিল্পের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ থাকে না, সরকার শুধু স্ট্রাকচারের ব্যয়টুকু দিয়ে থাকেন। এরই মধ্যে কিভাবে শিল্পবুদ্ধি আরোপ করা যায় সেই চিন্তা এবং রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে থেকে পাটা-কর্নিক-উশা-ওলনের হাতের কাজে কি বৈচিত্র আনা যায়, প্রধানত তার ওপর নির্ভর করে বিদ্যাপীঠের বাড়িঘরে সৌন্দর্যের ছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। নতুন কিছু নয়, তবে সুন্দর কিছু। সত্যপালন করতে কিছু খরচ হয় না, কিন্তু জীবনের

প্রতিজ্ঞা থাকা চাই। সুন্দর ও রসের কিছু করতে ও তেমনই প্রতিজ্ঞা থাকা চাই, স্ট্রাকচারের খরচেই আর্টের খরচ কুলিয়ে যায়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ছিলেন শিল্পকলার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। শিল্পের জন্য বাড়তি খরচ যে হয় না তা নয়, তবে সন্ন্যাসীরাই মিস্ত্রি খাটাতেন, মালপত্র কিনতেন, নিজেরা পরিশ্রম করতেন, কন্ট্রাক্টরের পার্সেন্টেজ বাঁচাতেন। অর্থব্যয়ে নয়, সন্ন্যাসীদের অনেক পরিশ্রমে বিদ্যাপীঠ সুন্দর হয়েছে। বিদ্যাপীঠে শিল্পের চর্চা হয়েছে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের গুণে ঠিকই, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের যেকোনো আশ্রমই পরিচ্ছন্ন। স্কুল-হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন, রান্না-খাওয়ার জায়গা পরিচ্ছন্ন, কল-পায়খানা পরিচ্ছন্ন, যেখানে গোশালা তা পরিচ্ছন্ন, যেখানে পুকুর আছে তার জল তার পাড় সব পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্নতা মিশনের একটা ক্যারেক্টার। এই সঙ্গে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের বাড়িতে সৌন্দর্য তার শিল্প–সৌন্দর্য। কিন্তু কেমন করে বলি বিদ্যাপীঠের কোন্‌টা আগে। সবরকম সেন্সই মানুষকে জাগায়, শুধু আর্ট-সেন্স নয়। মহারাজের কাছ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের একটা হাসির গল্প শুনেছি। কিন্তু কথাটা মোটেই হাসির নয়। একজন মঠে এসেছিলেন সাধু হতে। স্বামীজী তাঁকে পরিহাস করে বলেছিলেন "সাধু ত হবি, আগে ভদ্দর হ।" বিদ্যাপীঠের সকল কাজ "ভদ্র হোক", আমাদের শিল্পকলাও "ভদ্র হোক' এই ছিল আমার কামনা।

সারদা মন্দিরের কাঠের মডেল মহারাজের পছন্দ হলো। স্কুলবাড়ির প্ল্যান খুবই সরল ছিল, অমন খোলা জায়গায় H শেপের বাড়ি, সব ঘরেই সমান আলো-হাওয়ার প্রবেশ। শুধু ব্যবহারের দিক থেকে সামান্য কিছু অদলবদল করা হলো। দোতলার টানা বারান্দার ছাদ ঘরের ছাদ থেকে নিচু করা হলো, বাড়ির সামনের দিকে দেওয়াল এগিয়ে এনে প্রবেশদ্বারের একটা রূপের বিশেষত্ব সৃজন করা হলো, তাতেই এলিভেশনের স্বাতন্ত্র্য ফুটল। প্রবেশদ্বারের ওপরের দেওয়ালে খিলানের মধ্যে নয় ফুট মাপের সরস্বতী মূর্তি রচনা করা হলো। সরস্বতী পদ্মের ওপরে অবতরণ করেছেন। পদ্ম থেকে একটু ঊর্ধ্বে। পদ্মতে পায়েতে একটু ফাঁক। ছাত্রদের হৃদয়পদ্মে যেন নামছেন, যেন এইমাত্র পা রাখবেন। প্রবেশদ্বারের দুই পাশে বিজ্ঞান ও শিল্প বিভাগের দুটি ছাত্র দীপ ও ফুল হাতে জ্ঞান ও ভক্তির অর্ঘ্য দান করছে। ওপরে দীপাবলির সারি, মাঝখানে দীপলক্ষ্মী। দীপাধারের সারিতে উত্তীর্ণ শিক্ষা বিষয়ে স্বামীজীর মন্ত্র - Education is the manifestation of the perfection already in man.

এই আলয়ে আর যা সজ্জা তা অলঙ্কার মাত্র। দেবী মূর্তিতে সাজ পরানোর মতো। জানালায়, দরজায়, বারান্দায় থামের ব্র্যাকেটে সিমেন্টের ঢালাই করা আর্কিটেকচারাল নক্সা বসান হলো। দরজা-জানালায় একটা গমগমে ভাব ফুটল। মূল নক্সাগুলি কলকাতায় বসে করতাম। আর লরি করে প্লাস্টার নিয়ে আমার সহকর্মী গণেশ দাস বিদ্যাপীঠে সিমেন্টে ছাঁচ ঢালাই করত। এইভাবে কাজ এগোত। এই কাজে আমার এক বন্ধু ছিলেন সঙ্গী গোপেশ্বর দাঁ। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের এক বিশেষ উদ্যোক্তা। নিজে তিনি শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু কমও ছিলেন না। আমার কথা বুঝতেন। গড়নের নক্সা এবং টেমপ্লেট করে দিলে, নির্দেশ অনুযায়ী মিস্ত্রিদের পরিচালনা করতেন। সারদা মন্দিরের প্রবেশদ্বারের চাতালে নক্সা করা বড় টালি বিছানো আছে। সেই নক্সার একটা কোণ আমি করে দিয়েছিলাম, বাকিটা রিপিট করে করে তিনিই শেষ করেছিলেন। তাঁর কথা আজ বিশেষ মনে পড়ে এই কারণে যে, সারদা মন্দিরের উদ্বোধনের কিছু পরেই তিনি বিদ্যাপীঠ ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, আজও তাঁর খবর নেই।

গ্রীষ্মের, পূজার, বড়দিনের এবং গুডফ্রাইডের ছুটি বিদ্যাপীঠের কাজে আমার খুব সহায়ক ছিল। এক একটা বাড়ির টাইপ এক এক রকমের হয়েছে, কাজে এক এক রকমের উন্মাদনা বোধ করেছি। যখন জোর কাজ চলত, ঐখানেই মন পড়ে থাকত। এমন কত হয়েছে যে, আমি শনিবারের রাতে ট্রেনে চেপে সকালে বিদ্যাপীঠে পৌঁছেছি, রবিবার সারাদিন মিস্ত্রিদের সঙ্গে কাজ করে আবার সন্ধ্যার ফিরতি ট্রেনে সোমবারে ভোরে কলকাতায় ফিরে আর্ট কলেজে ক্লাস নিয়েছি। এ পরিশ্রমে আনন্দ ছিল, কষ্ট ছিলনা।

মনে হতো আমি যেন মিস্ত্রিদের সঙ্গে ভারায় ভারায় কাজ করছি। আমি তো আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়ার নই, তবে কোন্ প্রয়োজনে কোন্ বাড়ি, কি তার ব্যবহার এবং সুখসুবিধা, সেই অনুযায়ী তার প্ল্যান-স্ট্রাকচার সম্বন্ধে যে মোটামুটি বোধ ছিল না তা নয়। তবু প্ল্যানকরা একজিনিস, কিন্তু সেই প্ল্যানমতো যখন কনস্ট্রাকশন হতো, আমার কাছে তখন যেন একটা প্রকাণ্ড মূর্তি গড়ছি বলে মনে হতো। এখানে আমার কাজে স্থাপত্যের মধ্যে ভাস্কর্যের ছাপ হয়তো স্পষ্ট হয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আর পাঁচ জনের মতো আমারও ভাসা-ভাসা ধারণা ছিল। হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল শিল্পসূত্রে। কিন্তু শিল্পকে ছাপিয়ে আরো বড় আনন্দের সন্ধান পেতে লাগলাম। আমার শিল্পী-জীবন যেন আরো ভরে উঠতে লাগল।

কোনো উপদেশ বা জ্ঞানের কথা নয়, কোনো ধর্মকথা নয়। কত রাত পর্যন্ত শুধু গল্প। ঠাকুর -মা-স্বামীজীর গল্প, পুরানো দিনের মঠের সাধুদের গল্প, জীবনের কত সব পবিত্র প্রতিচ্ছবি। সে এক ঐশ্বর্য পেয়েছিলাম মহারাজের কাছ থেকে। "হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব"।

একরাতে সারদা মায়ের একটা গল্প শুনলাম। একজন ভক্ত মাকে বাসন মাজতে দেখে মনের অস্বস্তি জানিয়ে বলেছিল, "পূজার বাসন তুমি মাজছ কেন মা?" মা বলেছিলেন, "এও তো পুজা, বাবা।"

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের একটা কথা শুনলাম— "দয়া করবার তুই শালা কে।"

একদিনের গল্পে স্বামী বিবেকানন্দর কথা শুনলাম— প্লেগের সেবায় টাকার অভাব দেখা দিলে বলেছিলেন, "মঠ বেচে দাও।"

এক একটা কথায় আমার মনের রুদ্ধ দুয়ার একটা করে খুলে যেতে লাগল। এই রকম মহারাজের মুখে শোনা গোটা কয়েক গল্প আমার ক্ষুদ্র জীবনের দিগ্‌বলয়কে প্রসারিত করেছে। দিগ্‌বলয়কে ছোঁয়া যায় না, তবু সুদূর মানুষকে ডাকে, দূরের সে ডাক শোনা যায়।

সামার-ভেকেশনের লম্বা ছুটিতে দিনের বেলা সারদা মন্দিরের ফিনিসের কাজ, নক্সা বসানোর কাজ ইত্যাদি হতো। আর মিস্ত্রিরা চলে গেলে সরস্বতী মূর্তির কাজ ধরতাম মাটি দিয়ে, যে খিলানের মধ্যে মূর্তি বসেছে তারই পিছনের দেওয়ালে। জেনারেটর চালিয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতে পেতাম। ছুটি ফুরোবার আগের দিন ওই মূর্তির নয় ফুট প্রকাণ্ড এক পিস ছাঁচ সেই খিলানে সাজিয়ে সিমেন্টে ঢালাই হলো। ভাস্করের কাজের সে এক মস্ত রিস্ক, মস্ত এডভেঞ্চার। কাজটা মঙ্গল মতো সফল হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় কলকাতার ট্রেন ধরলাম।

বিদ্যাপীঠের সরস্বতীর কথায় মনে পড়ে— জীবনে অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করে আজ অবধি মা সরস্বতীর কত না রূপ দেখলাম। ছেলেবেলায় মা সরস্বতী ছিল বছর বছর ক্লাসে ওঠার দেবী। বড় ভয়, বড় ভক্তি।

লেখাপড়া সাঙ্গ করে আর্ট স্কুলে ভর্তি হলাম। তখন মা সরস্বতী হলো কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। জাভার প্রজ্ঞা পারমিতা, কলকাতা যাদুঘরের নানা মূর্তির ভাব-ভঙ্গি আমাকে নব নব প্রেরণায় উজ্জীবিত করল। আর্ট স্কুলের পূজায় প্রতিমা গড়তাম বছর বছর, যতদিন ছাত্র ছিলাম।

পরে আরো রূপান্তর হলো। রূপযানী নামে আমাদের এক শিল্পী সংঘ ছিল। পদ্মাসনা, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ অবশেষে সমভঙ্গ। কতরূপে দেখলাম। আমার অধিগত বিদ্যার সব অভিজ্ঞতা মিলিয়ে রূপে-বর্ণে প্রতিমার একটা টাইপ সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের জন্যও কতবার প্রতিমা গড়েছি।

আর প্রতিমা গড়া হয় না। শেষ বয়সে দেখি কি, মায়ের আর এক রূপ। শুধু জ্ঞান -বিদ্যা-শিল্পকলার দেবী নয়—বড় দুঃখ, বড় বেদনার দেবী সরস্বতী। কোনও আর্টে আর তার নাগাল পাওয়া যায় না। এই রূপেই বিরাজ করো মা।

বেলুড়ে 'বিদ্যামন্দির' নাম শুনেছি। স্কুলকেও মিশন মন্দির হিসাবে দেখে, বিদ্যা আরাধনার মন্দির। সরস্বতী মূর্তি তৈরির সময় মহারাজ বসে বসে কাজ দেখতেন। একদিন বললেন, "মা সারদামণির নামে স্কুল বিল্ডিং-এর নাম রাখা হবে সারদা মন্দির। মিশনের সব কাজই সেবা, সন্নাসীরা যে যে -প্রতিষ্ঠানের কাজ করেন সবই তাঁদের সেবা।'

বিদ্যাপীঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করবার আগে শুনেছি, স্বামী হিরন্ময়ানন্দ রেঙ্গুন, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে মিশনের হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর সে অ্যাকটিভিটির কথা আমার জানা নেই। শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের পর পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ গড়বার সময় ছাত্রদের বিষয় নিয়ে কত কথা হতো। সম্ভব-অসম্ভব, আশা-উদ্দীপনার কত কি জল্পনা -কল্পনা। সন্দেহ নেই, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শই তাঁর Guiding force। মহারাজ বলেছিলেন, "ছাত্ররা আমাদের কাছে নারায়ণ।" লেখাপড়ায় ছেলেরা উন্নত হবে, শুধু ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া নয়, শুধু বড় চাকরি নয়— man making শিক্ষাই হবে বিদ্যাপীঠের শিক্ষার আদর্শ। লেখাপড়া, খেলা, ড্রিল, ডিসিপ্লিন, ব্রহ্মচর্য, ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিদ্যায় ছাত্ররা গুরুগৃহে বাসের মধ্যেই শিক্ষিত হবে। Horse riding, motor driving —এইসব শৌর্য-বীর্য হিসাবেই বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের শিক্ষার অন্তর্গত থাকবে, এমন কল্পনাও মহারাজের ছিল।।

পুরুলিয়ার ছৌনাচ বঙ্গসংস্কৃতির একটা ঐশ্বর্য। চৈত্রের সন্ধ্যা থেকেই বহুরাত পর্যন্ত শুনতাম দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে ভেসে আসা ধামসা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। পুরুলিয়া অঞ্চলে ছৌনাচের খুব চল। ধামসায় ঘা পড়লে সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠে। শিব, দুর্গা, রামায়ণ এইসব নাচের বিষয়। এ -নাচে মেয়েরা নাচে না। বিদ্যাপীঠের পশ্চিম দিকে মাঠ পেরিয়ে কিছুটা গেলেই বোঙাবাড়ি গ্রাম। গ্রামের উঠানে মাঝরাত পর্যন্ত নাচ দেখেছি। এমনিতে দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন, কিন্তু নাচতে নামলে বাঘের তেজ, যেন মানুষগুলো জ্যান্ত হয়ে ওঠে। নাচের মধ্যে পুরুলিয়া প্রাণ ফিরে পায়। এই নাচ বিদ্যাপীঠের ছেলেদের দেখানো হতো, মাঝে মাঝে শেখানো হতো।

সারদা মন্দিরকে মন্দির হিসাবেই আমি রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলাম। অবশ্য আমাদের অভ্যস্ত ধারণার মন্দির ধরনের কিছু নয়, স্কুলের functional ব্যবস্থা বজায় রেখে সিমেন্ট ঢালাই-এর সাদাসিধে সোজা লাইনের বশে শিল্প যোজনা করা, যাতে স্কুল বিল্ডিং একটা পবিত্র রূপ পায়। এই শিল্প প্রচেষ্টাকে অনেকেই সেদিন ভালচোখে দেখেনি —বাজে খরচ, পণ্ডশ্রম হিসাবে দেখেছে, প্রথম প্রথম অনেক কটুক্তিও শোনা গিয়েছে। মহারাজ এসব কথা গায়ে মাখেননি, তিনি শিল্পের কদর দিয়েছেন, আমিও তাই হতাশা বোধ করিনি।

বিদ্যাপীঠের রূপসৃষ্টিতে ডঃ ধীরেন্দ্র মোহন সেন মহাশয়ের প্রেরণাও অসীম। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যাপীঠ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। মন্ত্রীর ভাষণে বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণ মিশনকে এক টাকা দিলে সরকার আঠারো আনার কাজ ফেরত পায়, অন্য জায়গায় টাকা দিলে দশ আনার কাজ পায় না।" ডাঃ রায় বিদ্যাপীঠের প্রথম ফোটা -ফুল 'সারদা মন্দির' নিজ চোখে দেখে গিয়েছেন।

বিদ্যাপীঠের নিজস্ব এবং ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য একটা স্থান নির্ধারণ করতে বলেছিলেন মহারাজ। পুলিস থানার পতাকা তোলার মতো ব্যবস্থায় আমার সায় ছিল না। মন্দিরের সামনে যেমন গরুড় স্তম্ভ মানায়, সারদা মন্দিরের সামনে সেই ভেবে প্রশস্ত বেদির মাঝখানে ঢালাই করা স্তম্ভ নির্মাণ করা হলো, তাকে নক্সা দিয়ে শোভন করা হলো। স্তম্ভের ওপর পতাকার দণ্ড, দণ্ডের শীর্ষে পিতলের অগ্নিশিখা। শুধু ফ্ল্যাগ -স্টাফ নয়, স্বদেশবেদি নির্মিত হলো। স্তম্ভের গোড়ায় মহারাজ সংস্কৃত বই থেকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম্ ইত্যাদির প্রতীক চিহ্ন বার করে দিলেন, ধরিত্রীমাতা হিসাবে আমি তা সিমেন্টে গড়লাম এবং তারই ওপরে স্তম্ভের চার দিকে ভারত বন্দনা লেখা হলো শিলালীপির মতো, সংস্কৃত থেকে আর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ থেকে।

১। গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারত ভূমিভাগে

স্বর্গাপর গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তিভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।।
২। বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।।
৩। হে মোর চিত্ত
পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের
মহামানবের সাগরতীরে।।
৪। ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর
বলো ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।।

এই স্বদেশবেদিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি জাতীয় উৎসবাদি বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা, মাস্টারমশাইরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। ছাত্ররা এরই সামনে প্যারেড করে, একেই স্যালুট করে।

বিদ্যাপীঠের বাড়িঘরে আমি প্রধানত রূপের কথা ভাবতাম, মহারাজ তাকে ভাব দিয়ে জাস্টিফাই করতেন। সারদা মন্দিরের শীর্ষদেশ সুসজ্জিত করবার জন্য সব শেষে প্রকাণ্ড এক জোড়া মকরমুখ ব্যবহার করেছিলাম। বাড়ির সব নক্সার মধ্যে মকরের একটা resemblance ছড়িয়ে আছে, বাড়ির মাথায় তার ক্লাইম্যাক্স ফুটে উঠল। কেউ কেউ মকর স্থাপনের অংশটুকু নিয়ে বিদ্রুপ করে বলেছিলেন, ওটা বিদ্যের জাহাজ। তাদের নিরস্ত করবার জন্য মহারাজ মকর রাশির সঙ্গে সরস্বতী মূর্তির সম্পর্ক যোজনা করলেন সংস্কৃত শ্লোক থেকে। সবাই মেনে নিল। একটা মানে পেয়ে লোক আশ্বস্ত হলো।

মানুষ মানে চায় ঠিকই, তবে পদ্মফুলের বিকশিত শোভাই তো তার আসল মানে। পাঁক থেকে জন্মেছে বলে পঙ্কজ, এ শুধু তার কথার মানে। এই পদ্মর কথায় মনে পড়ল এক নির্মল শারদ প্রভাতের স্মৃতি। সারদা মন্দিরের সামনের ফুলবাগানে, বিদ্যাপীঠের কম্পাউন্ড থেকে কুড়িয়ে আনা পাথরের ছোট-বড় ঢেলা দিয়ে একটা ছোট্ট জলাশয় বাঁধিয়েছিলাম। সরস্বতীর সামনে পদ্ম ফুটবে বলে। আমার বেলায় ঘুম ভাঙার অভ্যাস ছিল। ভোরবেলা মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। দেখি কি, মা সরস্বতীর 'মূর্তি'-র পায়ের সামনে পদ্মবনে প্রথম পদ্মটা ফুটেছে। শিল্পের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে কি সুন্দর লাইন করা মিল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এক সুরে বাঁধা, কি সুন্দর শোভা!

আমার প্রাণে শিল্পের আলাদা একটা ধারা বইতে শুরু হয়েছে। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সঙ্গসুখ আমার ভাল লাগত, বিদ্যাপীঠের একটার পর একটা কাজ আমাকে বিভোর করে রাখত। সারদা মন্দিরের পর একে একে গেস্টহাউস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক (দেবযান), ওদিকে গুরুপল্লি প্রভৃতি তৈরি হতে লাগল। এর মধ্যে আকর্ষণীয় রূপ পেল অর্জুন বনের ছায়ায় সভাবেদি, কম্যুনিটি হল আর 'দেবযান'।

প্রথম দিকে কাজের জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে বিদ্যাপীঠে যেতাম, হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজও বিদ্যাপীঠের কাজে রাইটার্সের শিক্ষাদপ্তরে প্রয়োজনে প্রায় কলকাতায় আসতেন। সময় করে আর্ট কলেজে আমার ক্লাসেও একবার বিদ্যাপীঠ থেকে আশ্রমের গাড়ি নিয়ে এলেন। দোলের আগের দিন বিকালে আমার সংগৃহীত কিছু শিল্পসামগ্রী

প্যাকিং বাক্সয় ভরে গাড়ির পিছনে তুলে কামারপুকুর -জয়রামবাটীর পথে পুরুলিয়ায় যাত্রা করলাম। পূর্ণিমার আগের রাত, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভরা। গাড়িতে মহারাজ ছিলেন, ধীরেন মহারাজ ছিলেন। দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর নদী খেয়া পার হয়ে রাত একটা-দেড়টার সময় অসময়ে কামারপুকুর পৌঁছালাম। তখন এ রাস্তায় ব্রিজ হয়নি, কি সুন্দর লেগেছিল চাঁদের আলোয় মোটর সমেত খেয়া-পার।

সকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণের মাটির ঘর দেখলাম। নন্দলাল বসুর ডিজাইনে করা ঠাকুরের পাথরের ছোট মন্দির, সরু রাস্তার ওপারে সেই বিখ্যাত শিব মন্দির, হালদার পুকুর প্রভৃতি দেখলাম। আর গ্রামের একটু ভিতরে গিয়ে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রাপালা দেখতেন, বাজারের সেই টিনের চালা দেখলাম। ওখান থেকে রওনা হওয়ার সময় মঠাধ্যক্ষ প্রবীণ সন্ন্যাসীর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলেন হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ, সেই সময় এক মজার বিশুদ্ধ বাংলা কথা শুনলাম, যা আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে। চারিদিকে এক জাতের অজস্র বনফুল ফুটেছিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ফুলের নাম কি?" একটা নাম বললেন তিনি, নামটা ল্যাটিন। মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বাংলা নাম কি?" কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ বাংলা নামটা মনে এল তাঁর, বললেন, "মর্নিং গ্লোরি-টোরি হবে।"

আমরা রওনা হলাম। জয়রামবাটী হয়ে দুপুর শেষে পুরুলিয়ায় পৌঁছালাম। জয়রামবাটী ছাড়ার সময় কোনো সন্ন্যাসীর রচনা করা ছোট ছড়া শোনালেন মহারাজ, "মা এসেছে মাটিতে, জয়রামবাটীতে'। কি সহজ মিল, "আমরি বাংলা ভাষা"!

আমার যা-কিছু সংগ্রহ ছিল টেরাকোটা পাথর, ব্রোঞ্জ সবই পুরুলিয়ায় একে একে এসে গেল এবং সারদা মন্দিরের দুখানি বড় ঘর নিয়ে একতলায় ছোট একটি মিউজিয়ামের পত্তন হলো। বাড়ির ছোট ঘরে গাদাগাদি করে রাখা ছিল, সাজিয়ে আমিও অবাক হয়েছিলাম যে এত সংগ্রহ আমার কাছে ছিল। সবই ছেলেদের জন্য হলো।

বিজ্ঞানেরও আনুষঙ্গিক সংগ্রহ হলো বিজ্ঞান বিভাগে। একটা দুর্মূল্য টেলিস্কোপও বিদ্যাপীঠের সংগ্রহে আছে। মহারাজ দান হিসাবে পেয়েছিলেন, আমেরিকা থেকে পাওয়া। এ দিয়ে শিবানন্দ সদনের ছাদ থেকে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল—এসব গ্রহ আমি দেখেছি। জিওলজিরও কিছু বিচিত্র সম্ভার, গাছের ফসিল, রকমারি পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলাম নানা জায়গা থেকে। সব মিউজিয়ামে রাখলাম। এ -সবই সিলেবাসের বহির্ভূত। ছাত্রদের অধ্যয়নের বিষয় নয়। তবে শিল্প -বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ, দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ছবি, অজন্তার ছবি, মনীষীদের ছবি, প্রাচীন মূর্তি স্কুলের করিডোরে ছেলেদের চোখের সামনে ধরা থাক। তারা ঘুরতে–ফিরতে দেখতে দেখতে বড় জিনিস চিনতে শিখুক। এই আদর্শ মনে ছিল বলেই হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ বিদ্যাপীঠের সবকিছু ফলাও করে সুত্রপাত করে গিয়েছেন। এমনিতে দেখতে গেলে, একটা স্কুলের জন্য এ -সকল আয়োজন অতিরিক্ত, অবান্তর। তবে ছাত্রদের যদি সত্যই নারায়ণ বলে ভাবতে হয়, যদি তাদের মন তৈরি করতে হয়, শরীর তৈরি করতে হয়, যদি Man making শিক্ষায় তাদের গড়তে হয়, তাহলে এতকিছু উপচারও কিছু নয়। ছাত্রদের জন্য সাধুদের আরও দিতে হবে, সব দিতে হবে।

এই সময় মহারাজ দেওঘর ও পুরুলিয়া দুই জায়গার আশ্রম দেখতেন, খুব ছুটোছুটি করতে হতো। দু-এক বার আমার ছুটির সুযোগে আমিও তাঁর সঙ্গে গিয়েছি পুরুলিয়া থেকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। ধানবাদ হয়ে পরেশনাথ পাহাড়ের কোল দিয়ে দিখারিয়া ঘুরে দেওঘর বিদ্যাপীঠে পৌঁছেছি।

স্থির হলো হায়ার-সেকেন্ডারি শিক্ষার অন্তর্গত হিউম্যানিটিজ, সায়েন্স প্রভৃতি বিদ্যার এক-এক শাখার মতো শিল্প-সঙ্গীতেরও আলাদা আলাদা স্ট্রিম পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে প্রবর্তন করা হবে।

মহারাজের কাছে শুনেছি, বেলুড় মঠে স্বামীজীর সময় থেকেই ধ্রপদ সঙ্গীতের চর্চা ছিল। শেষ রেশ হিসাবে হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজের মুখে সঙ্গীতজ্ঞ সাধু প্রহ্লাদ মহারাজের নাম শুনেছি এবং তাঁর খালি গলায় গানের টেপ

-রেকর্ড শুনেছি। স্বামী বিবেকানন্দ বিবিধ শিল্পকলার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন, দেশ ও বিদেশের শিল্পের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ও তাঁর ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পকলা বিষয়ক অনেক কথা মহারাজ পড়ে পড়ে আমাকে শুনিয়েছেন, টাইপ করেও দিয়েছেন। শিল্প যে একটা দুর্লভ বিদ্যা, কঠিন প্রয়াস, এ আমি নিজের চর্চা দ্বারা বুঝেছিলাম। কিন্তু শিল্পকলা যে তার চেয়ে বড়, জীবনের একটা ভাইটাল ফোর্স, "আমাদের ধর্মের একটা অঙ্গ", এ আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবরাজির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো বেঁচে থাকার জিনিস বলে অনুভব করতে পেরেছি।

অথচ স্বামীজীরই ভক্ত -সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেকেই দেখেছি শিল্পের প্রতি বিমুখ বা উদাসীন, কোনো সাড়া নেই। শিল্পলোক অধ্যাত্মলোকে ওঠবার একটা ধাপ। বিলাসীর কাছে বিলাসিতার ইন্ধন, ধর্মাশ্রয়ীর কাছে পাথেয়।

বিদ্যাপীঠে শিল্প ও সঙ্গীতের নতুন বিভাগ সৃষ্টি হলো। কিন্তু সারদা মন্দির বিল্ডিং-এর সঙ্গে ক্লাসঘর যুক্ত হলো। দুটো ঘরে গান ও বাজনার ক্লাস, দুটো ঘরে ছবি ও মূর্তির ক্লাস।

খরচ সাশ্রয়ের জন্য দুখানা-দুখানা ঘর নিয়ে দোতলা বাড়ি তৈরির কথা ভাবা হয়েছিল। ঐ মত আমার মনে ধরেনি, মহারাজও নাকচ করলেন। বরাদ্দ অর্থের মধ্যেই নতুন প্ল্যান ডিজাইন করলাম, মহারাজ অনুমোদন করলেন। বাড়িটার একটা নতুন টাইপ তৈরি হলো, আর বিশেষ রকমের হলো জমি থেকে দু-ফুট উঁচু প্লিন্থের সমান করে কুড়িয়ে আনা পাথরের ঢেলায় বাঁধানো ছোট বাগান রচনা করেও খাজুরাহোর সিংহের মতো সিংহের সারি বসানো তোরণ তৈরি করে।

মহারাজ নাম দিলেন নিবেদিতা কলামন্দির। একসময় সিস্টার নিবেদিতা শিল্পের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালকে। সেসব কথা লোকে বিস্মৃত হয়েছে। আজ পণ্ডিত শঙ্করীপ্রসাদ বসু সমস্ত নিহিত সত্য সপ্রমাণ উদ্‌ঘাটন করছেন তাঁর গবেষণায়। আমাদের নিবেদিতা কলামন্দির উদ্বোধন করেছিলেন ডঃ ধীরেন্দ্র মোহন সেন, ১৯৬০ সালে।

নিবেদিতা কলামন্দিরের গান ও বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষক হয়ে এলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র নেপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আর রবীন্দ্রনাথের গানের জন্য মহারাজ শান্তিনিকেতন থেকে শৈলজানন্দবাবুর বেছে দেওয়া ছাত্র সব্যসাচীকে এনে সঙ্গীত শিক্ষার ভার দিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তখন বিশেষ সমাদর ছিলনা সন্ন্যাসীদের মধ্যে। আমায় দ্যাখ তো একরকম মহারাজই বিদ্যাপীঠের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান প্রবর্তন করলেন। তিনি যে সত্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও অনুরাগী তার এক দৃষ্টান্ত আমি চোখে দেখেছি। এক দোলের সকালে অর্জুন বনের প্রাঙ্গণে সভাবেদিতে দোলোৎসব হলো ছাত্র আর গুরুরা মিলে। ছেলেরা সমবেত সঙ্গীত গাইল—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। এ গান শেষ হতেই সন্ন্যাসী শিবশঙ্করদা গান ধরলেন—"জয় রামকৃষ্ণ'। মহারাজ যথেষ্ট বিচলিত বোধ করেছিলেন, গান থামতেই ভর্ৎসনা করলেন, "তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, এমন সুর তৈরি হলো, আর তুমি ধরলে জয় রামকৃষ্ণ!"

অনেক ভাল গান আছে, আবার যথেষ্ট ভক্তি -আদিখ্যেতার গানও আছে ঠাকুর আর স্বামীজীকে নিয়ে। অনেক গান গানই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে চালালেও চলে না, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের পর। গান দিয়ে যদি চরণ ছুঁতে হয়, রবীন্দ্রনাথের গানই ঠাকুরের পুজায় লাগবে। যেমন একটা গান আছে "ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়।" এ গান একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিই প্রযোজ্য, আর কাউকে মানায় না। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ থেকে হালে স্বামী উমানন্দের উদ্যোগে এক সুন্দর জিনিস হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে - সকল গান স্বামীজী ঠাকুরকে গেয়ে শোনাতেন, বিদ্যাপীঠ থেকে তার এক ক্যাসেট হয়েছে নানান প্রসিদ্ধ গায়কের কণ্ঠে গাওয়া। যুগ-দেবতা, যুগ-আচার্য, যুগ-কবিকে বাঙালিরা বড় কাছাকাছি পেয়ে ধন্য হলো।

চিত্র ও ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষকদ্বয় আমারই পছন্দ করা। শিল্পী রামানন্দকে আমি আগে চিনতাম, তার কাজ জানতাম। শান্তিনিকেতন কলাভবনে পাশ করা, আশ্রমিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তাছাড়া নন্দলালের সান্নিধ্যে ও স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ। রাম তখন ফুলিয়া পলিটেকনিকের শিক্ষক। মহারাজের অনুরোধে ডঃ ডি. এম. সেন রামকে বিদ্যাপীঠে বদলি করে এনে দিলেন আমাদের মধ্যে। আর মডেলিং শেখানোর জন্য আমার আর্ট কলেজের ছাত্র জয়ন্ত এসে যোগ দিল। জয়ন্ত বিদ্যাপীঠে কিছু কাল ছিল, মূর্তি গড়ে চিহ্ন রেখে এসেছে; রাম ছিল দীর্ঘকাল। সারদা মন্দিরের বাইরে খিলানে মা সরস্বতীর মূর্তি, ঠিক তার পিছনে ভিতরের দেওয়ালে সিল্কে আঁকা নয় ফুট মাপের মা সারদার ছবি আমার আঁকা। একপিঠে মা সরস্বতী আর এক পিঠে মা সারদা। এছাড়া বিদ্যাপীঠের প্রধান প্রধান সব ছবি রামের আঁকা। বিদ্যাপীঠের সরস্বতী পূজা, আরো নানান উৎসব-অনুষ্ঠানে রাম সাজাত। একটা পবিত্র আবহাওয়া তৈরি হতো। ছেলেদের থিয়েটারে, কম্যুনিটি হল -এ, স্টেজের সাজসজ্জায়, পাত্র-মিত্রের সাজ পোশাকের বৈচিত্র্যে আচার্য নন্দলালের একটা প্রতিবিম্ব নাটক ও উৎসবাদিকে রুচিস্নিগ্ধ করে তুলত।

স্বামী বিবেকানন্দের সেন্টিনারি উৎসব উপলক্ষে স্বামীজীর জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে রাম খুব তাড়াতাড়ি বোর্ডের উপর ম্যুরাল এঁকেছিল, আর চৈতন্য ভাগবতের কবিতার ছন্দে এই ছবির বিষয়গুলি মহারাজ কবিতায় বর্ণনা করেছিলেন। রামানন্দ অনেক বছর বিদ্যাপীঠে কাজ করে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের কালচারাল ইনস্টিটিউটে নতুন কাজে যোগ দিল। বিদ্যাপীঠের ছবি আঁকার কাজ এখন পাঁচু দত্ত দেখছে। আমার পুত্র ধর্মপালও কিছুকাল এই কাজ করেছে এবং প্রি -বেসিক স্কুলের দেওয়ালে মিথিলার ঢঙে কিছু ম্যুরাল এঁকেছে। আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মহীপাল ও তার সহপাঠী বন্ধুরা মিলে শিবানন্দ সদনে ছোটদের ডাইনিং হল-এ নানা পশুপক্ষীর ছবি এঁকে সাজিয়ে এসেছে।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ যতদিন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন শিল্পের ব্যাপারে রামানন্দের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিদ্যাপীঠে স্বামী বিবেকানন্দের সেন্টিনারি উৎসবে স্বামীজীর শিক্ষাভাবনাকে কেন্দ্র করে প্রকাণ্ড সারদা মন্দির স্কুল বিল্ডিং জুড়ে ছাত্রদের রচনা করা শিল্প ও বিজ্ঞানের নানা নিদর্শন এবং ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়দের সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজি সাহিত্যচর্চার হাতে লেখা পত্র -পত্রিকা প্রভৃতি নিয়ে আশ্চর্য করা এক প্রদর্শনী সংগঠিত হয়েছিল, এইসঙ্গে হয়েছিল সঙ্গীতাদি আনন্দ উৎসবের নানা আয়োজন ও মেলার অনুষ্ঠান।

এই সেন্টিনারি উৎসবে রাম, রথীনদা (শিল্পী রথীন মৈত্র), বঙ্গসংস্কৃতির বীরেন সেন, মুরারি সাহা প্রমুখ মহারাজের অনুরাগীর ও পুরুলিয়ার ভূজঙ্গবাবু, অনিল সরকার প্রমুখ সকলের এবং সর্বোপরি বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়দের অমানুষিক পরিশ্রমের কথা মনে পড়ে। আর ঐতিহাসিক কারণে মনে পড়ে রবীন্দ্রভারতী (সোসাইটি) আর পাঞ্চেত রাজবাড়ির সহযোগিতার কথা। প্রদর্শনীর জন্য পাঞ্চেত দিয়েছিলেন প্রাচীন তৈজসপত্র, রবীন্দ্রভারতী দিয়েছিলেন তাদের কালীঘাট-পটের সমস্ত সংগ্রহমালা।

"বিলাতি গেলাসের চেয়ে চুমকি ঘটিতে আর্ট আছে।" স্বামী বিবেকানন্দের কথা এটা। ঘরকরনার ব্যবহার বস্তুতে, আঞ্চলিক পট-পাটা-প্রতিমায় সারা ভারতবর্ষে উন্নত রুচির প্রয়োগ ছিল। "আমরা স্বদেশের ভালটাও খোয়ালাম, বিদেশের ভালটাও নিতে শিখলাম না "আমাদের যে সবই যেতে বসেছে, স্বামীজীর এই সতর্কবাণী। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি এবং পাঞ্চেতের দেওয়া প্রদর্শনী দ্বারা সাধারণের চোখের সামনে কিছু নিদর্শন তুলে ধরা সহজ হয়েছিল।

এটা একটা মাঝের ঘটনা। কিন্তু ব্যাপক ও অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। পুরুলিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন এবং বিদ্যাপীঠ যে মানুষের মনে ঠাঁই পেয়েছে তা দেখলাম। তখন তেমন বাসের চলাচল ছিল না। পুরুলিয়া শহর ছাড়াও দূর-দূরান্তর গ্রাম থেকে কাতারে কাতারে নর-নারী পায়ে হেঁটে স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ উৎসব দেখতে এসেছিল।

বিদ্যাপীঠের ঘরবাড়ি তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হবে। মহারাজ বিদ্যাপীঠের প্রবেশদ্বারের ডিজাইন চাইলেন। বিদ্যাপীঠের উপযুক্ত ভেবে ম্যাসিভ গড়নের গেটের নক্সা আঁকলাম, মহারাজ পছন্দ করলেন। আমার বড় আনন্দ এবং সৌভাগ্য যে, আমি ভেবেচিন্তে যা করতাম মহারাজের তাতে পুরো সায় থাকত। তবু আমার মনে সংশয় ছিল খরচের কথা ভেবে। সুদীর্ঘ প্রাচীরের উচ্চতা সামনের অংশে একটু কম করায় ব্যয় কুলিয়ে গেল। রামানন্দের ডিজাইনে ফটকের গ্রিলের সুন্দর নক্সা করা হলো।

এই সময় প্রাচীন বয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারের দেখা পেলাম পুরুলিয়ায়— নাম গোপেন সরকার। তিনি সুদীর্ঘ কাল মঠের সঙ্গে জড়িত। মিশনের নানা আশ্রমের জন্য কাজ করেছেন, বেলুড় মন্দিরের আদলে অনেক মন্দির গড়েছেন। তিনি একসময় মার্টিন-বার্নের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বেলুড় মন্দির নির্মাণের তত্ত্বাবধানেও ছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল নির্মাণের সময় তিনি তখন সে কাজের একজন ভারপ্রাপ্ত নবীন ইঞ্জিনিয়ার। ভিক্টোরিয়া হলের যিনি আর্কিটেক্ট সেই সাহেব তাকে ভালবাসতেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "সেঞ্চুরিতে এমন বিল্ডিং একটাই হয়, আমার সৌভাগ্য আমি তার সুযোগ পেয়েছি।" কাজ জানলেই হয় না, জীবনে কাজের সুযোগ পাওয়া চাই, সুযোগের সদ্যবহার করা চাই। তাঁর মুখে সেই আর্কিটেক্টের একটা কথা শুনেছি। অবিস্মরণীয় কথা। আর্কিটেক্ট বলতেন, "আমার সঙ্গে সঙ্গে এস না, ঘুরে ঘুরে আমাকে একা কাজ দেখতে দাও।" সব আর্টিস্টেরই পরামর্শ তার নিজের সঙ্গে, নিভৃত মনে একা শিল্প-অধিষ্ঠাত্রীর সঙ্গে কথা কওয়া। গোপেনবাবু আমাকে ভালবাসতেন।

সারদা মন্দির শেষ হওয়ার আগেই ক্লাস নাইনের এক ব্যাচ ছেলে এসে গেল দেওঘর থেকে। তাদের থাকার ও পড়ার টেম্পোরারি ব্যবস্থা করা ছিল। তারপর তিন বছরে IX, X, XI ক্লাস পূর্ণ হলো। হস্টেল, জিমন্যাসিয়াম, কম্যুনিটি হল (সভাগৃহ) তৈরি হলো। বড়দের প্রথম দুটো হস্টেল শুধু আমার করা নয়।

কম্যুনিটি হল গড়তে হবে। বিদ্যাপীঠের রেললাইনের দিকে নাবাল ঢালু জমিতে, জমির স্বাভাবিক উঁচু-নিচু বজায় রেখে তার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে সভাগৃহ। ডায়াস, স্টেজ লাইব্রেরি প্রভৃতি একসঙ্গে জুড়ে একটু পাহাড়ি জায়গার ভাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। বিদ্যাপীঠের সীমানার মধ্যে একটা পাথরের টিবি পাব পুরুলিয়া অঞ্চলে এমন একটা আশা ছিল, সে আশা মেটেনি। তাই কিছুটা ন্যাচারাল, কিছুটা আর্টিফিসিয়াল মিশিয়ে জমির উঁচু -নিচুর বশে, কোথাও বা মাটি ফেলে টিবির আকার দেওয়ার বাসনা এই প্ল্যানটায় ছিল।

কিন্তু সেই প্ল্যান মানা সম্ভব ছিল না। অনেক প্র্যাকটিকাল কথা ভেবে হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ সমস্ত ঘরবাড়ির সাইট নির্বাচন করতেন এবং তা যথোপযুক্ত হয়েছে। এমনকী, কবে বিদ্যাপীঠে মন্দির হবে তার ঠিক নেই, কিন্তু তার স্থান নির্বাচন করে রেখেছিলেন মনে মনে। রাঁচি আশ্রম থেকে তখন মঠের ভাইস -প্রেসিডেন্ট স্বামী বিশুদ্ধানন্দ কলকাতার ফিরতি পথে একবেলার মতো পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে অবস্থান করছিলেন। আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল, মহারাজ তাঁর হাত দিয়ে মন্দিরের ভিত পুজা করে রাখলেন। কেমন মন্দির হবে, কত বড় হবে, কবে হবে-তা স্থির না থাকলেও, আন্দাজমতো ভিত প্রতিষ্ঠার জায়গা ঠিক করে রেখেছিলেন। এখানে-ওখানে নানা দিকে ছড়ানো এক একটা বাড়ি, এলোমেলো কত আগে করা। তবু অনেকদিন পরে যখন মন্দির তৈরি হলো তখন দেখলাম বিদ্যাপীঠে ঢুকতে আগে চোখে পড়ে মন্দির এবং মন্দির ঘিরেই যেন আর সব। কম্যুনিটি হল বিদ্যাপীঠের পিছন দিকে হয়ে সামনের দিকে আনা হলো এবং সেই অনুযায়ী নতুন প্ল্যান ভাবা হলো।

কাগজে ইঞ্চি-ফুট আন্দাজ করে আমি বাড়ির খসড়া করতাম। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং আমার রপ্ত ছিল না। মহারাজের প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্লাসফ্রেন্ড মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার সুচিত ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমার আর্ট স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিস্তা নদীতে করোনেশন ব্রিজের একটা শিল্পকাজে তখনকার ইংরেজ সরকার আমাকে সেখানে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল। তখন তিনি এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর কাছে জঙ্গলের বাংলোয় থেকে সেই কাজ

করেছি এবং তাঁকে জেনেছি। ব্রিজে বাঘের মূর্তি গড়তে গিয়েছিলাম স্নেহবশত আমাকে তিনি "বাঘবাবু' টাইটেল দিয়েছিলেন। কম্যুনিটি হলের নতুন খসড়া আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ তাঁর নিউ আলিপুর বাসগৃহে গেলেন। দুই বন্ধুর দেখা হলো কত কাল পরে। আমার স্কেচ ড্রইং সুচিতবাবু দেখলেন। তাঁর বিশেষ ভাল লেগেছিল বাড়ির সাইড এলিভেশনে স্টেজ বা ডায়াসের উচ্চ থাক থেকে অডিটোরিয়ম বেরিয়ে আসছে। এই অংশের আর এক থাকে নিচু থেকে লবি বেরিয়ে আসছে। রূপ কল্পনা করা আর তার লাইন ড্রইং করা, এ আমার কাছে সহজ ; কিন্তু ইঞ্চি, ফুট কষে working plan করা আমার কাছে কঠিন কাজ। এই অসুবিধার কথা তাঁকে জানালাম। আমাকে উপদেশ দিলেন, কিছু ভাবতে হবে না। যা আঁকবেন গ্রাফ পেপারে আঁকবেন, আপনি মাপ বেরিয়ে আসবে। আমার আঁকার সমস্যা মিটিয়ে দিলেন।

পরে আমি গ্রাফ কাগজে যা আঁকতাম গোপেনবাবু সহজেই তার হিসাব পেতেন। গ্রাফ কাগজে আঁকার মজা আগে জানতাম না বলে সারদা মন্দিরের মাথার মকরের প্রপোরশন বুঝতে কত বেগ পেতে হয়েছে। ঠিক মাপে আনবার জন্য কত বার পিজ বোর্ড নক্সা এঁকেছি। নিচে এক মাপ, ওপরে সেটা খাটালে দেখি টিম টিম করছে। বারবার নতুন ফর্মা আঁকতে আঁকতে, বড় করতে করতে তবে বুঝলাম, কত বড় মকর মুখ এ উঁচুতে ঠিক মানাবে। পিজ বোর্ডে এঁকে এনে কলকাতায় বসে তার মডেলিং করেছি। গ্রাফ কাগজে আঁকার কথা জানা থাকলে কাজ কত সহজ হতো। তবে, কোনো কিছুই সহজে শেখা যায় না, ঠেকলে শেখা যায়।

কম্যুনিটি হল তৈরি হলো। তার সামনের দেয়ালের গায়ে এক সারি মূর্তি করা আছে-কিশোর ছাত্রের দল। মাঝখানে মঠ মিশনের এমব্লেম—মিশনের কর্মধারার প্রতীক। প্রতীকের অর্থ স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ প্রভৃতি এক এক আইডিয়া ছাত্ররা শিক্ষা সমাপনান্তে যেন এখান থেকে দিকে দিকে বহন করে নিয়ে চলেছে। এর ক্লে-মডেল টিন শেডের বারান্দায় করেছিলাম।

এই সময়টা বিদ্যাপীঠের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে। এখনো বিদ্যাপীঠের সাধুদের কাছ থেকে কত স্নেহ-ভালবাসা পাই। তবু সেদিন একটা থ্রিল ছিল। হয়তো জীবনে প্রথম সাধুসঙ্গ পেয়েছিলাম বলে, হয়তো একটা ভিন্নতর জীবনযাত্রা, একটা উচ্চতর আচার-আচরণ দেখেছিলাম বলে। আজও মনে পড়ে শ্রীনাথ মহারাজ, দ্বারকা মহারাজকে। সব মানুষের মধ্যে মেয়ে এবং পুরুষ একই সঙ্গে বিরাজ করে। বিদ্যাপীঠের বাড়ি -ঘরের কাজ দেখতেন শ্রীনাথ মহারাজ; সেই সুত্রে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। সেই বৃদ্ধ সাধুর মধ্যে আমি মাতৃভাবও লক্ষ্য করতাম। গরমের ছুটিতে বিদ্যাপীঠে কাজে গেলে সর্বদা নজর রাখতেন আমার ওপর। ঠিক সময়ে খেয়েছি কি না, বিশ্রাম নিয়েছি কি না, যেন অযথা রোদ না লাগে ইত্যাদি। কাজ দেখতে বেরিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ শুনে আমার বালক পুত্রকে হাঁক পাড়তেন, "বুড়াই, আম পড়ল।" স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের কাছে শুনেছি যে, যখন তিনি বাড়ি ছেড়ে মঠে এলেন ঠাকুরের আশ্রয়ে, শ্রীনাথ মহারাজের স্নেহচ্ছায়া তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। এখনো দেখি তা-ই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং -এর লাগোয়া ছোট ছোট কুঠুরিতে সাধুরা থাকেন। হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজও এই রকম একটা ঘরে থাকতেন। বিদ্যাপীঠের ক্যাশও থাকত সেই ঘরে। জানালার ধারে মহারাজের চৌকি পাতা। এ নিয়ে শ্রীনাথ মহারাজ কোনোমতে সুস্থির থাকতে পারতেন না। হয়তো রাতে সজাগ থাকতেন তিনি তাঁর পাশের ঘরে, কে জানে! এই উদ্বেগে আমি তাঁর স্নেহই দেখতাম।

দ্বারকা মহারাজ হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজকে স্নেহ করতেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ধরে বিজয়ানন্দ বলে ডাকতেন, বড় ভালবাসতেন। মঠ থেকে বিদ্যাপীঠে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার লোক। তাঁদের সময়ে বেলুড় মঠে সন্ন্যাসজীবনের কত কষ্ট, কত আনন্দের কথা আর্টিস্টিক করে বাঁধানো প্রাচীন আমগাছের বেদিতে বসে গল্প করতেন। আর সেই সব পুরানো স্মৃতিতে উদ্বেলিত হয়ে হা-হা করে হাসতেন, আর বলতেন, "বুঝল্যা বিজয়ানন্দ।"

প্রাণ পবিত্র না হলে ভিতর থেকে অমন হাসি বের হয় না। দ্বারকা মহারাজ অরগানাইজার বা ক্রিয়েটিভ, বা বড় কিছু ছিলেন না, কিন্তু সাধু ছিলেন। এইরকম আনন্দধারার মধ্যে আমার বিদ্যাপীঠের শিল্পকলার কাজকর্ম ভেসে চলতে লাগল। আজও সেই স্রোতে চলেছি, তবে মোহনার দিকে।

এই প্রসঙ্গে হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটা কথা মনে পড়ল। সাধুদের নিয়ে রঙ্গ করা-একটা অবোধ অহঙ্কার শিক্ষিতদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মহারাজের সমবয়সী এক ইঞ্জিনিয়ার প্রথম দিকে বিদ্যাপীঠের কিছু কাজ করেছিলেন। মানুষটি আমুদে ছিলেন, কিন্তু রসবোধ একটু মোটা। একদিন টিন শেডে ছোট মজলিসে হেসে বলেছিলেন, "আপনারা বিয়ে-থা করেননি, সংসারের মর্ম বোঝেন না। আমার এক বন্ধুও আপনাদের মত ব্যাচিলার।" রসিকতা অবশ্য বেশি দূর গড়ায়নি, গড়াতও না। ব্যাচিলার আর সন্ন্যাসী এক জিনিস নয়। অনেক কারণে লোকে বিয়ে করে না। ইচ্ছা করেও করে না। আবার হয়ে ওঠে না বলেও হয় না। সন্ন্যাসীদের জীবন ঈশ্বর অভিমুখে। বিয়ের কথাই অবান্তর। কথাটা উল্লেখ করবার নয়, ভুলে যাওয়ার। তবে মনে আছে আর এক ঘটনার ব্যাক গ্রাউন্ড হিসাবে, সে একটা দৃষ্টান্ত। গৃহীদেরও এত পরিচ্ছন্ন সংসার জ্ঞান থাকে না।

মহারাজকে প্রায় দেওঘরে ছুটতে হতো। পুরুলিয়ায় এক ওভারসিয়ারকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, যেন কাজটা অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শেষ হয়ে থাকে। মহারাজ ফিরে এসে দেখলেন কাজ ঠিকমতো এগোয়নি। ওভারসিয়ার জবাব দিল, "—কে তার বিয়ের ছুটি দিয়ে গেলেন। চার দিন আগে তার জয়েন করার কথা, এখনো ফেরেনি।" সহকর্মীর ওপর দোষ চাপাল। মহারাজ বিরক্ত হলেন। বললেন, "তার নতুন বিয়ে, দু-চার দিন কামাই হতেই পারে, কাজটা তুমি সেরে রাখতে পারনি!" আমার কাছে এ পরিস্থিতিতে সাধু -সন্ন্যাসীর মুখ থেকে কোনো দার্শনিক কথার চেয়ে কামাই–এর কারণটা ঢের বেশি হৃদয়বত্তার কথা বলে মনে হয়েছিল।

আর এক বিয়ের ঘটনায় মহারাজ রসিকতা করে কপট হতাশা প্রকাশ করেছিলেন মধুকে নিয়ে (এখন সে বিদ্যাপীঠ অফিসের হেড ক্লার্ক)। মধু মিত্র পুরুলিয়া শহরের কিছু দূরে গ্রামের ছেলে। লেখাপড়া শেষ করে মিশনে চাকরি নিয়েছে। '৫৮ সাল হবে, এক সকালে মধুর বাবা এলেন, তার বিয়ের কথা জানিয়ে মহারাজকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। বাবার বিদায়ের পর মধুর সঙ্গে দেখা হলে বললেন, "কোথায় ভেবেছিলাম তোমাকে আমরা সাধু করে নেব, আর তুমি কিনা বিয়ে করতে চলেছ ?" মধুর তখন অল্প বয়স, মহারাজের কথায় বিভ্রান্ত ও দুঃখিত হয়ে বলেছিল, "এঃ, মহারাজ আগে বললেন না ! বাবা যে বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছেন।" মহারাজের সামান্য বিলম্ব ঘটায় আজ মধু পরিণত বয়সে সংসারের ঘানি টানছে।

একসময় জানলাম বিদ্যাপীঠে জুনিয়র সেকশন হবে। দেওঘর বিদ্যাপীঠের আর extension নয়, পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের একটা স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ, ক্লাস VI থেকে XI পর্যন্ত একটা সম্পূর্ণ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হিসাবে পরিগণিত হবে।

জুনিয়র ছাত্রদের স্কুল ভবন নির্মাণের নক্সার জন্য মহারাজ আমাকে বললেন। সরকারের নির্ধারিত কতগুলি ঘর এবং ঘরের কি মাপ হবে আমাকে বলে দিলেন।

বিদ্যাপীঠের ডাইনিং শেডটা নিয়ে আমরা সকলে বিব্রত বোধ করতাম। ওটা মিলিটারিদেরই পরিত্যক্ত একটা লম্বা শেড। খুবই কাজের সন্দেহ নেই— ভাঁড়ার, রান্না, খাওয়া সবই তাতে হতো। কিন্তু শেডটা তেরছাভাবে থাকায় সারদা মন্দিরের পারিপার্শ্বিকে বড়ই বেমানান ও চোখের পীড়াদায়ক ছিল।

মহারাজের সিদ্ধান্ত ছিল যে, সময় এলে ওটা ভেঙে নতুন ডাইনিং হল হবে, তবে এখন নয়।

নতুন স্কুল ভবনের জন্য ভাবনা শুরু হলো। সারদা মন্দিরের কাছাকাছি করতে হবে। আশ্রমের পিচের রাস্তাটা বাঁচাতে হবে একধারে, এধারে খেলার নির্দিষ্ট জমি ছেড়ে রাখতে হবে, দৃষ্টিকটু ডাইনিং শেডটা আড়ালে ফেলতে

হবে এই সুযোগে এবং স্কুল বিল্ডিং-এর প্রয়োজনমতো এরিয়া বের করতে হবে। এতগুলো 'হবে' নিয়ে ঠিক ধাঁধার মীমাংসার মতো কিউরিওসিটি জাগল। সুন্দর সমাধান পাওয়া গেল।

রাইট এঙ্গেল ভেবে বাড়ির প্ল্যান করলাম, দুই বাহুর আড়ালে ডাইনিং শেড পিছনে পড়ে গেল। গ্রাফ কাগজে প্ল্যান ও এলিভেশন এবং চোখের আন্দাজে এপাশ-ওপাশ মিলিয়ে বাড়ির কীরূপ দাঁড়াবে তার ছবি দেখে ইঞ্জিনিয়ার গোপেনবাবু আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, "খুব অরিজিনাল হয়েছে।" এই স্কুল বাড়ির নাম দিয়েছেন মহারাজ "বিবেক মন্দির"। বাড়ির দুই ব্লকের কোনা যেখানে মিলেছে, সেই উত্তর-পশ্চিমের প্রশস্ত জায়গাটায় ছোট মন্দিরসদৃশ চন্দ্রাতপে স্বামী বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জ বাস্ট স্থাপন করা আছে। আর পশ্চিমের বারান্দায় আটটা খাটালে মহারাজের নির্বাচিত সাবজেক্ট—বৈদিক যুগে ঋষির আহ্বান —শৃন্বন্তু বিশ্বে থেকে পৌরাণিক যুগের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক রাজা, রামচন্দ্র ও সীতা, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য এবং আধুনিক যুগের পঞ্চবটী পর্যন্ত কর্নিক দিয়ে সরাসরি দেওয়ালে মূর্তি গড়লাম। উত্তরের প্রবেশদ্বারের মাথায় এগারো ফুট/সাত ফুট জায়গাটা রাখা আছে কৃষ্ণার্জুন মূর্তির জন্য। এতদিন পর বাড়ি বসে এখন সেটা গড়ছি।

বিবেক মন্দিরে শিল্পরীতির ধারা বদলালাম। সারদা মন্দির থেকে এর ধরন আলাদা। নন্দলাল বসুকে রামানন্দ সারদা মন্দিরের ফটো দেখিয়েছিল। রামের মুখেই শুনেছি যে নন্দলাল ফটোতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "সব জায়গায় কাজ মোলায়েম হয়ে নেমে আসছে, গেটের কাছে ছাত্র-দুটির মূর্তি অত 'খোঁচা' কেন?" বিদ্যার্থীর মুর্তি-দুটি বেশি স্পষ্ট করার জন্য বেশি উঁচু করেছিলাম; প্রায় রাউন্ড, শুধু পিঠটা ঠেকানো। রাম মারফত নন্দলালের অভিমত শুনে আমার ভুলটা বুঝেছিলাম। শিল্পে কোনোকিছু চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো বিধি নয়। এরপর বিবেক মন্দিরে করা মূর্তিগুলি দেওয়ালের সঙ্গে মাখো হয়ে আছে। বিনম্র একটা স্টাইল। নন্দলালের মতো শিল্পীর সামান্য ইশারায় কত শেখা যায়, রূপের সামান্য হেরফেরে শিল্প কত স্বাভাবিক হয়।

এই বিবেক মন্দিরেই স্বামীজীর বাস্টের চন্দ্রাতপের পিছনের দুই দেওয়ালে পঞ্চাশ ফুট মতো একটা টানা বড় মূর্তির জায়গা করা আছে। বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ যেন ভগীরথ, যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-প্রবাহ সংসারে বয়ে আনছেন। এই সাবজেক্টটির আইডিয়ার পিছনে একটা পুরানো ইতিহাস আছে। স্বামী বিবেকানন্দের সেন্টিনারির সময় উৎসবের চাঁদা তোলার জন্য স্মারক -স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সমেত একটা সুদৃশ্য কুপন করার বাসনা প্রকাশ করলেন হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ। সাধারণ বিল বই হলে চলবে না। শিল্প নিয়ে একটা এলাহি ব্যাপার মহারাজের মনে সর্বদাই ছিল। এ আমি অনেক আগেও দেখেছি। সারদা মন্দির তখনও শেষ হয়নি। দেওঘর থেকে পাস করে এসেছে, ক্লাস IX-এর এমন গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে প্রথম সরস্বতী পূজা হবে। মহারাজ আমার আঁকা রঙিন ছবি থেকে হাফটোন ব্লক করে যথেষ্ট ব্যয়ে নিমন্ত্রণপত্র ছাপলেন। আমি তাঁর শিল্প -প্রীতি দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। চিঠি পত্র নিয়ে শিল্পোদ্যম আমারও ছিল। "রূপযানী" শিল্পী সংঘে এ-বিষয়ে একদা অনেক চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু সে লাইন-ব্লকের সীমার মধ্যে। রূপযানীর সরস্বতী প্রতিমার পুরানো রঙিন স্কেচ ছিল। সেটাই মহারাজ পছন্দ করলেন এবং ছাপলেন। সে-হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের সেন্টিনারির ব্যাপারে কুপনে শিল্পকাজ বিধৃত থাকবে, এটা ভাবা মহারাজের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। দণ্ড হাতে স্বামীজীর পরিব্রাজক ছবিখানার সঙ্গে মকরবাহিনী গঙ্গার ছবি আঁকলাম। মহারাজের সংস্রবে এসে স্বামীজীর কথা জানতে জানতে আমার চেতনায় এল যে, স্বামী বিবেকানন্দ এ-যুগের ভগীরথ, মানব-সভ্যতার নতুন বার্তাবহ। সমাজের মরা গাঙে বান এনেছেন। এই কুপনে স্বামীজীর বাণী যুক্ত করেছিলাম — I Shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God . আঁকা ছবিটা দেখে মহারাজ বলেছিলেন, "এমন একটা vision মা সারদা দেখেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণের গা বেয়ে গঙ্গা নামছেন।" Vision-এর কথা আমার বোধের বাইরে এবং এ-ঘটনার কথাও জানতাম না। তাই

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি এতে আঁকা ছিল না। আধ্যাত্মিক ভাব দিয়ে দেখার চোখ আমার হয়নি। আমি দেখেছি আইডিয়া হিসাবে শিল্পীর চোখ দিয়ে। কিন্তু একই জিনিস দেখলাম কি করে? মহারাজের কাছে শোনার পর এই সাবজেক্টটাই পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমেত ড্রইং করে রেখেছি মূর্তি গড়ব বলে। দীর্ঘচর্চায় এটুকু জেনেছি "বাসন মাজাটাও' পূজা। মনে মনে শুধু মাজা আর ঘসা।

ছোটদের বিবেক মন্দির তৈরি শুরু হলো ১৯৬৪ সালে। এই সঙ্গে তাদের ছাত্রাবাস 'শিবানন্দ সদন,'-ও গড়ে উঠছে দ্রুত। খোলা জমি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিদ্যাপীঠের সকল ছেলের খেলার মাঠ ছেড়ে রেখে এই এত বড় হস্টেলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। বিদ্যাপীঠে খেলাটাও প্রতিটি ছাত্রের জীবনযাত্রার একটা প্রধান অঙ্গ। খেলার মান বাড়াবার জন্য কলকাতা থেকে কোচ আমন্ত্রণ করে আনা হয়। জায়গা অনেক আছে, কিন্তু আম আর অর্জুনের বন নষ্ট করা চলবে না। জিমন্যাসিয়ামের কোলে খানিকটা জায়গা পড়ে ছিল। তারই অর্থাৎ জমির বশে প্ল্যানের ভাবনা মাথায় ঘুরতে লাগল। সব ঘরে সমান আলো-হাওয়া খেলবে। ঘরের সামনে দালান থাকবে। সংলগ্ন ডাইনিং হল থাকবে। রান্নার মহল যুক্ত অথচ আলাদা থাকবে। ধোঁয়া ভিতরে আসবে না, আর এরই মধ্যে ঘেরার ভিতর এক ফাঁকে ছোট ছেলেদের ছোটাছুটির ব্যবস্থাও থাকবে। এমন সব নানা বিষয় ভেবে বড় ঘাসের উঠান সহ একটা প্ল্যান ভাবলাম এবং মহারাজকে কিছুটা মুখে, কিছুটা একে বর্ণনা করলাম।

আমার ছেলেবেলায় রিখিয়া বেড়াতে গিয়ে দেওঘর বিদ্যাপীঠ দেখেছিলাম। খাবার জায়গা আলাদা, পায়খানা দূরে। তখনকার খাটা পায়খানা দূরে রাখাই বিধেয়। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে এখনকার মতো তখন রেললাইনের দিকে এত জমি ছিল না। জায়গার টানাটানির কথা ভেবে রান্না-খাওয়া স্নান -পায়খানার ব্যবস্থাটা বাড়ি থেকে বিশ্লিষ্ট করা যায় কিনা মহারাজকে জানালাম। একটু না হয় ছেলেদের কষ্ট হবে। মহারাজ আমায় নতুন কথা শোনালেন, "খাওয়া-দাওয়া, স্নান-পায়খানা—এসব নিয়ে ব্রহ্মচর্যের আইডিয়া পালটাতে হবে। এখানে ছাত্রদের যে ডেলিরুটিন সেটা পালন করাই যথেষ্ট আসটারিটি (austerity)। ছাত্রদের আর কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্ট বাড়ানো উচিত নয়। সবই এটাচ্‌ড করুন।" তা-ই করলাম, মহারাজ তৃপ্তি পেলেন। জমির বশেই প্ল্যান করেছিলাম। গোপেনবাবু তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং মাপজোখ করে খতিয়ে নিলেন। ভাগ্যক্রমে টায়-টায় জায়গা কুলিয়েছিল। উপরন্তু জিমন্যাসিয়ামের পাশে ভাণ্ডারে লরি যাওয়ার মতো বারো ফুট পথও বেরিয়েছিল। আমার ওপর গোপেনবাবুর স্নেহ বেড়ে গেল।

ডঃ ডি. এম. সেন তাঁর বাল্য থেকে হয়তো শান্তিনিকেতন আশ্রম গড়ে উঠতে দেখেছেন। বিদ্যাপীঠ আশ্রম গড়ে তোলায় তাঁর টান ছিল, সহায়তা ছিল। মন্ত্রী বিধানচন্দ্রের আমলে D.P.I.-এর সেক্রেটারি হিসাবে তিনি এবং ডঃ অমিয় সেন বিদ্যাপীঠে মহারাজের বিবিধ আইডিয়া ও কাজের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। ছাত্রদের জন্য মহারাজ যা চাইতেন, সরকার থেকে তা মঞ্জুর করতেন। একথা বলা দরকার এই কারণে যে, শুধু অনুকূল সহায়তায় নয়, প্রতিকূল অবজ্ঞার মধ্যেও বিদ্যাপীঠ উজান ঠেলে চলেছে। অধস্তন বড় অফিসাররা সকলেই আগ্রহশীল নয়, অনেকে বাধা দিয়েছে।

তবু সারাদেশে যতটুকু কাজ হয়েছে, তা রাইটার্সের জন্যই। আর যে -অধঃপতন, যে-সর্বনাশ হয়েছে তা-ও রাইটার্সের জন্য। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধি, কার্লমার্কস সব তল হয়ে গিয়েছে।

শিক্ষা দফতরের এক অফিসারকে রাগ করতে দেখেছি। এডুকেশন সেন্টারে আমরা আর্ট-ফার্ট পছন্দ করি না। আমাদের দেশে আর্টের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ থাকে না। ইউরোপ, আমেরিকায় শুনেছি প্রতি বিল্ডিং-এর শিল্পসৌকর্যের জন্য মোট ব্যয়ের একটা পার্সেন্টেজ ধরা থাকে। সেটা তাদের নিয়ম। শিল্প পরিবেশের জন্য পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের আরম্ভকাল থেকেই প্রচেষ্টা আছে। একটা পরিচয়ও গড়ে উঠেছে। সেটা বাড়তি গৌরব। বিদ্যাপীঠের আসল পরিচয় তার ছাত্র, তার শিক্ষক, তার পরিচালনার আদর্শ।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে শুনেছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারি বর্ষে পার্কসার্কাস ময়দানে স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের উৎসব উপলক্ষে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "আমার তো মনে হয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা মিশনের হাতে তুলে দিই।" অবশ্যই কথাটা মন্ত্রীর বা সরকারের নয়। প্রফুল্ল সেনের নিজের শ্রদ্ধার কথা।

আর্ট করতে মানা। তবু শিবানন্দ সদনে আবার নতুন আর্টের সংযোগ হলো, একেবারে শ্রীরামকৃষ্ণের আঁকা আর্ট দক্ষিণেশ্বরের দেওয়ালে ঠাকুর কাঠ কয়লা দিয়ে জাহাজ আর আতা গাছে তোতা পাখির ছবি এঁকেছিলেন। নন্দলাল নিজচোখে সে ছবি দেখেছিলেন এবং তাঁর memory drawing করে গিয়েছেন। সেই ছাপা স্কেচ থেকে বালকদের জন্য শিবানন্দ সদনের বাইরের দেওয়ালে এনগ্রেভ করে তাতে কালো রং দিয়ে আট-দশ ফুট মাপের বড় করে ঐ দুটি ছবি আঁকা হলো। আমাদের শিবানন্দ সদনের ছেলেদের জন্যই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে এঁকেছিলেন।

বিদ্যাপীঠের ছেলেদের প্রায় সব কাজ মহারাজের শেষ হয়ে এসেছিল। লাইব্রেরি বিল্ডিংটাও অল্পের মধ্যে একটা রূপ পেল। সব বাড়িই আধুনিক সুখসুবিধা বজায় রেখে করা। এই গৃহ মাথায় বাংলার বাস্তু-সৌষ্ঠবের মুকুট ধরে রয়েছে। এইটুকু এর অলঙ্কার। এর অভ্যন্তরে বইয়ের সম্ভার আর দেশের প্রতিভূ রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে নেতাজী, বিধানচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের বাস্ট এবং ছবি সাজানো রয়েছে। স্মরণীয় মানুষদের মূর্তির মধ্যে জিমন্যাসিয়ামের সামনে শহিদবেদিতে শ্রীমান তাপস দত্তর অনুমতিক্রমে তার রচিত ফাঁসির মঞ্চে দণ্ডায়মান ক্ষুদিরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ছেলেরা রোজ দেখে।

আর যে ডাইনিং শেড নিয়ে এত মাথাব্যথা ছিল সেটা বিবেক মন্দির, শিবানন্দ সদন, লাইব্রেরি প্রভৃতি বাড়িতে নানা দিক থেকে আড়াল পড়ায় এবং সেটি সুসংস্কার করে বড় ছাত্রদের প্রয়োজনে আরো সুবিধার জন্য আরো রান্নাঘর, খাবার ঘর প্রভৃতি যুক্ত করায় একটা সম্পূর্ণতা এল। ডাইনিং শেডের বড় বদনাম ছিল। এখন তা ঘুচেছে।

ছাত্রদের প্রথম ব্যাচ যখন দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে এল, টিন শেড থেকে রিডিং রুমে ঠাকুর -মা-স্বামীজীর আসন পাতা হলো। মাঠ পার হয়ে ছাত্রদের সান্ধ্য -প্রার্থনা, ভজনের সুর ভেসে আসত আমার কাজের জায়গায়। এমন সে -সুর, যেন ছন্দে ছন্দে সন্ধ্যা ঘন হয়ে নামছে। আমার কলকাতার পরিবেশে এসব দেখিনি, শুনিনি, উপভোগ করিনি। মাঠ -ঘাট, গাছপালা, উদার প্রকৃতি, স্বামীজীর ভাব, মিশনের কাজ—এর মধ্যে আমার শিল্পচিন্তাও আমার বিদ্যাপীঠের জীবনে একটা মিশন হয়ে উঠল। সেই আনন্দ আমায় আকুল করে রাখত।

এর অনেক পরে শিবানন্দ সদনে যখন ছোটরা এল, সেখানে তাদের স্টাডি হলে তাদের আলাদা ঠাকুরঘর হলো। হস্টেলে পড়ার ঘরেই ঠাকুরঘর থাক, মন্দিরের দরকার নেই—অনেক সাধুই এই মত পোষণ করতেন। মহারাজ বরাবরই মন্দিরের পক্ষপাতী, বিদ্যাপীঠের ছোট-বড় সব ছেলে একসঙ্গে উপাসনায় বসবে। তাছাড়া পুরুলিয়ার মানুষের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হোক—এটা মহারাজের শুধু বাসনা নয়, সঙ্কল্প।

বিদ্যাপীঠের শিক্ষার একটা উচ্চ স্ট্যান্ডার্ড আছে। পুরুলিয়ায় যাতায়াত করতে করতে দেখলাম গ্রামের কি অসহনীয় দুরবস্থা। মোটরে বা রেলগাড়িতে চেপে গ্রামের ছবি দেখতে বেশ। এখানে চোখে দেখলাম কি দুর্দশা। বিদ্যাপীঠের যে উচ্চশিক্ষা তা প্রধানত সঙ্গতিপন্নদের পক্ষেই সম্ভব। ইংরাজি আদর্শের দার্জিলিং, দেরাদুনের রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আরো অনেক বড় লোকের ছেলেদের জন্য এবং যারা ছেলেদের সাহেব করতে চায় তাদের জন্য। অবশ্য বিদ্যাপীঠের শিক্ষাদর্শ আলাদা, গুরুগৃহে আধুনিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে পুরাতন ভারতবর্ষকে চেনা, সেইসঙ্গে নতুন ভারতবর্ষকে গড়া। তবু যে-দেশে এখনো ভাত-কাপড় সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি সেখানে শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠবে কেমন করে? তাই উচ্চশিক্ষা নিয়ে যারা ভাবতে পারে সেই সব গার্জেনই বিদ্যাপীঠে ছেলে

মানুষ করার কথা ভাবে। শিক্ষাটা man-making' এখনো যথার্থ সম্ভব হয়নি।

শুধু বিদ্যাপীঠ নয়, রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধেই একটা ধারণা ঘন হয়ে উঠেছে যে, ওটা বড়লোকদের জায়গা। এটা ভুল অভিমান। টাকাপয়সার বেড়া সমাজের মস্ত বেড়া সন্দেহ নেই। গরিবেরা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। তবে মিশনের সঙ্গে যোগ যারা রাখতে চায় তাদের কোনো আড়াল নেই। যারা সম্পর্ক রাখতে নারাজ "বড়লোকটা" অজুহাত মাত্র। যেন, বড়লোকের বেড়ার জন্য তারা ঢুকতে পায় না।

অবশ্য এ-ধারণার পিছনেও একটা সামাজিক মর্মান্তিক সত্য আছে। শুনেছি, একবার শিল্পী নন্দলাল গরিব ক্রেতার কথা ভেবে এক জাতের ছবি এঁকে সুলভে প্রদর্শনীতে দর দিয়েছিলেন বোধ হয় পাঁচ টাকা। দেখা গেল, প্রদর্শনী খুলতেই তখনকার রাজামহারাজা ধনীদের মধ্যে থেকে একাই একজন সব কিনে নিল। শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাটুকু নয়, পৃথিবীতে যতদিন বড় লোক টিকে থাকবে, তত দিন তারা গরিবের সব কিনে নেবে। শিল্প -বিজ্ঞান-ধর্ম তাদের কাছে সবই অর্থমূল্য। যদি রাগ দেখাতে হয়, নরম মাটি মিশনের ওপর নখ আঁচড়ে লাভ নেই। দোষ আমাদের রাষ্ট্রের। অসহায়ের মতো, নির্লজ্জের মতো ধনকুবেরদের মাথায় তুলে নাচছে। এই স্বাধীনতার জন্যেই লোকে আত্মবলি দিয়েছে। এই সাম্যর জন্য লোক সংগ্রাম করছে।

দীর্ঘকাল ধরে আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। "Commune life " বলে যদি সত্যই কিছু থাকে একমাত্র তা আশ্রমিক জীবনধারাতেই আছে। নিজস্ব বলে কারও কিছু সম্বল নেই, তারা কাজ করে শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ হিসাবে, তারা খায় এক ভাঁড়ারে, তারা থাকে এক কম্যুনে। আশ্রম-জীবন ছাড়া কম্যুন লাইফ সম্ভব নয়। কম্যুনিজম ভোগীদের আদর্শ হতে পারে না। তারা গরিব হলেও নয়। জীবনে কোনো না কোনো উচ্চ মিশন বা আদর্শ না থাকলে সুখে-দুঃখে মানুষ এক হয়ে থাকতে শেখে না। গৃহীরও সংসার যাপনের উচ্চ আদর্শ আছে।

প্রথম বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ-মা সারদা-স্বামী বিবেকানন্দের উন্মাদনায়, মানুষের সেবায় ঘর-সংসার ছেড়ে মিশন এসে উঠেছে। এ-জীবন সকলের জন্য নয়। সবাই সন্ন্যাসী হতে পারে না। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন শুধুমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া ও আশ্রম নয়, গৃহীদেরও ভরসা। মিশনকে যারা দিনে দেখেছে, রাতে দেখেছে, তারা দেখেছে একটা মহৎ ভারতবর্ষ সন্ন্যাসীদের মধ্যে চাপা আছে। "ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি।"

বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার সময় আশেপাশের ছড়রা প্রভৃতি গ্রামের ছেলেদের পাঠশালা ও স্কুল দেখতে যেতেন মহারাজ। দু-এক জায়গায় আমিও সঙ্গে গিয়েছি। বিদ্যাপীঠে শিক্ষার সুবিশাল ব্যবস্থা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বিদ্যাপীঠের মধ্যে গ্রামের ছেলেদের জন্য মিশন প্রি বেসিক স্কুল স্থাপন করলেন। আমার অনেক আজগুবি সখ ছিল। যদিও বিদ্যাপীঠ নিছক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তবু মহারাজকে সে-সব কথা বলতাম। কি দারুণ জলকষ্ট! যদি একটা পাইপ টেনে রাস্তার ধারে এনে দেওয়া যায়। কিন্তু ছেলেদেরই যেখানে জল কুলায় না, জলসত্র হবে কি দিয়ে? প্রাচীরের ধারে একটা ছোট ডাক্তারখানা হোক, যা লোকের কাজে লাগবে ইত্যাদি। মানুষের সেবা করাই যাঁদের মিশন, যাঁদের ব্রত, আমার এইরকম নানা সৌখিন আবেদনে হয়তো হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ মনে মনে কৌতুক বোধ করতেন।

তবে মহারাজ যদি পুরুলিয়ার জমে ওঠা হাট ভেঙে দিয়ে মঠের নির্দেশে বোম্বাই আশ্রমের ভার নিয়ে হঠাৎ চলে না যেতেন, হয়তো এই বিদ্যাপীঠে বসেই অনেক কিছু গড়তেন। সৃজন করার শক্তিসম্পন্ন মানুষ তিনি। পরে এখানে আমার এক পুরানো সাধ মিটেছে। স্বামী প্রভানন্দ যখন বিদ্যাপীঠ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে এলেন, বিদ্যাপীঠের সীমানায় রাস্তার ধারে সাধারণের জন্য একটা ডিসপেনসারি, একটা পোস্ট অফিস, একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যাপীঠ শুধু একটা স্কুল নয়, একটা দৃষ্টান্ত।

কী কথায় কোন কথা এসে গেল। তবে সবই বিদ্যাপীঠের কথা। শুধু কোনোটা সদর কোনোটা অন্দরের কথা,

কোনোটা আগের কোনোটা পরের কথা। বিদ্যাপীঠের তখন খুব জোর কাজ চলছে। একদফা শেষ হয়েছে। সারদা মন্দির শেষ হলো, টেকনিক্যাল বিভাগের যন্ত্রপাতি বসল, নিবেদিতা কলামন্দির প্রতিষ্ঠিত হলো, জিমন্যাসিয়াম, এডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, কম্যুনিটি হল, গেস্ট হাউস— এসব শেষ হলো। আর এক দফা আরম্ভ হলো, বিবেক মন্দিরের ভিত গাঁথা চলছে— এই সময় মহারাজ একদিন আমার আর্ট কলেজের ক্লাসে এলেন। গল্প মহারাজের ফুরাত না। তবু দু—কথার পর মহারাজ বললেন, "এবার মন্দিরের ভাবনা ভাবুন।" মহারাজ আগেও বলেছেন, আমিও ভাবতাম। এক্সারসাইজ বুকের পাতায় আমি তখনই একটি পেনসিল স্কেচ করে দেখালাম। মনে মনে যেটা অনেক দিন ধরে পোষণ করে রাখা ছিল, মহারাজের সামনে দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে এঁকে দেখালাম। হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ বেশ প্রফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি এটাই করব। আপনি ডেভলপ করুন।" এভাবেই আমাদের মনের মিল হতো। আর্ট কলেজে টেবিলে বসে আঁকা সেই আদি স্কেচটা এখনো রয়েছে।

মহারাজ গল্প বলতেন। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার গল্প বলেছিলেন। কোন একসময় বলেছিলেন, "খুব সাদাসিধে ঠাকুরের জীবন, খুব সাদাসিধে একটা মন্দিরের কথা ভাববেন।" বিদ্যাপীঠের মন্দিরের বাইরের রূপের এইহলো অন্তরের ভাব।

মন্দিরের নক্সা তৈরি শেষ হলো। টেপারিং উচ্চমুখী দেওয়াল–স্তূপের মতো, মাথায় কল্পতরু বৃক্ষ। কলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে, ঢুকেই বাঁ-ধারে পাথরের কল্পতরু রাখা আছে - আর্ট স্কুলে ছাত্রাবস্থা থেকেই মূর্তিটা আমার বিশেষ প্রিয় তার গঠনের সিমপ্লিসিটির জন্য। ভারতীয় ভাস্কর্যের একটা উদাহরণ। গর্ভমন্দির, নাট-মন্দির একত্রে সংযুক্ত করলাম বেলুড় মঠের মন্দিরের মতো। অর্থাৎ, স্বামীজীর আইডিয়া- মতো মন্দিরের বিগ্রহ আর ক্যাথিড্রালের সমাবেশ দুই এক করে।

কমপ্লিট ড্রইং দেখে মহারাজ মত প্রকাশ করেছিলেন, "মায়া-আর্কিটেকচার ঘেঁসা।" ঠিকই বলেছিলেন। অবশ্য হেলানো দেওয়াল পাঠান -আর্কিটেকচারেও আছে। এ আমার নতুন নয়। আমার ইনস্পিরেশন অন্যত্র, অনেক ছোট জিনিস থেকে পাওয়া। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে আশ্রমে আসতে রাঁচির ছোট রেললাইন পার হলেই অনেক ইঁটের পাঁজা চোখে পড়ত। এ আকৃতিটা আমার কাছে খুব সরল, ম্যাসিভ এবং স্তূপের মনে হতো। আমার ভাল লাগত।

এই ভাললাগাকে আমি আগেই কাজে লাগিয়েছিলাম বিদ্যাপীঠেরই আর্কিটেকচারে। জিমন্যাসিয়াম- বাড়িতে মহাবীর হনুমানের গন্ধমাদন বহন করা মূর্তির উঁচু দেওয়ালের সঙ্গে দুটো স্টোর রুম যুক্ত করে একটা আর্কিটেকচারাল ফিচার করা হয়েছিল। ইঁটের পাঁজার গড়ন ভেঙে জিমন্যাসিয়ামে পরখ করা হয়েছে, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে তারই পূর্ণ বিস্তার ঘটানো হলো।

আমি মন্দিরের ডিজাইন দিলাম, গোপেনবাবু তার ইঞ্জিনিয়ারিং নক্সা করলেন। আমি কাঠের স্কেল– মডেল করলাম। শুধু মাথার কল্পতরুটা করলাম না। কল্পপতরুর কাজের নিশানার জন্য বড় আকারের আলাদা মডেল করা দরকার, পরে করব। তাছাড়া মাথায় কাজ পৌঁছাতে মন্দিরের তখন অনেক দেরি।

বিবেক মন্দির আরম্ভের পর মন্দির শুরু হয়েছিল। কিন্তু কাজ চলত থেমে থেমে। যখন অর্থসংগ্রহ হয় তখন কাজ চলে, আবার বন্ধ থাকে।

পরে, মহারাজ মন্দিরের আর এক সমস্যা তুললেন। সমস্যা নয় — Refinement. মহারাজ একদিন বললেন, "ঠাকুর কল্পতরু ছিলেন। কিন্তু যে যা চেয়েছে তাকে তা দেননি, এটা তাঁর ভাব নয়। যার যা দরকার ঠাকুর তাকে তা-ই দিয়েছেন।" পরে বললেন, "কল্পতরু বাদ দিয়ে পঞ্চবটী করা যায় না?"

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পঞ্চবটীর সম্পর্ক আরো ডাইরেক্ট, সন্দেহ নেই। গড়নের দিক থেকে মন্দিরের মাথায় বৌদ্ধ কল্পতরু করা স্ট্রাকচারালি অনেক সুবিধার, অনেক নিরাপদের। কিন্তু পঞ্চবটী গড়তে হলে আকার–আয়তন

অনেক বাড়বে, ডায়ামেটার, সারকামফারেন্স বড় হবে, অনেক ছড়ানো করতে হবে, তাতে ভার অনেক বাড়বে। সৌভাগ্যবশত গোপেনবাবু সেই সময় মন্দিরের কাজ সুপারভাইজ করতে বিদ্যাপীঠে এসেছিলেন, মহারাজের বাসনার কথা তাকে জানালাম। শুনে উনি ভাবিত হলেন। বললেন, "ওজনের দিক থেকে ভাবছি না। অদলবদল হতে পারে, সেই ভেবে অনেক বোঝা সইবে তেমন বিম তিনটে করা আছে। তবে একটা গুড়ি থেকে ডালপালা কতটা ছড়ানো সম্ভব, কতটাই বা সারকামফারেন্সের এরিয়া বাড়ানো যাবে, দেখছি হিসেব কষে।" বললাম, "শুধু গুঁড়ি কেন, পঞ্চবটীর ঝুরি নামবে।" ছটা ঝুরির সাপোর্ট থাকবে বলে পঞ্চবটীর রাফ ড্রইংটা দেখালাম। দেখাবার আগেই উল্লসিত হয়ে বললেন, "তবে তো হয়েই গেল।" মহারাজ নিশ্চিন্ত হলেন। আমিও কল্পতরু ছেড়ে পঞ্চবটীতে মনঃসংযোগ করলাম।

গোপেনবাবুর কথা আমার বলা দরকার। তাঁর মতো সহানুভূতিশীল ইঞ্জিনিয়ারের সহযোগিতা না পেলে আমার পুরুলিয়া মন্দির ঠিক এইরূপ পেত কিনা সন্দেহ। অনেক ইঞ্জিনিয়ার দেখেছি বড় পায়াভারি, আর্টিস্টের কথায় আমল দেয় না। যা চলতি তার বাইরে কিছু ভাবে না। কোনো কিছু বললেই "হবে না, হবে না" বলে এড়িয়ে যায়। গোপেনবাবু সস্নেহে আমায় বলতেন, "আপনি কি চান বলুন না। আমি হিসেব করে দেখব।" তাঁর কথা আমার সব কাজে মনে পড়ে। একটা গল্প বলেছিলেন, তার moral হলো-কোনো কাজ লোকে দেখুক না দেখুক, যত উপেক্ষা করুক—ফাঁকি না থাকলে God will see'.

মহারাজ বলেছিলেন, "খুব সাদাসিধে একটা মন্দিরের কথা ভাববেন।" জীবনে নিরহঙ্কার হতে পারা একটা মস্ত অহঙ্কার। কিন্তু এক্ষেত্রে নিরলঙ্কার নিরাভরণ করতে পারাই এ-মন্দিরে পরম অলঙ্কার হয়ে উঠবে, আমি সতর্ক ছিলাম যে আর গয়না নয়। দেহের গঠন-সৌন্দর্য আচার-আচরণের খজুতা মানুষের বিনম্র শোভা। প্রতিজ্ঞা হিসাবে কণামাত্র আরোপ করা অলঙ্কার প্রয়োগ করিনি এ-মন্দিরে। গোটা গর্ভমন্দির বেদি সহ পঞ্চবটীকে শিরে ধরে রেখেছে। পঞ্চবটী আমাদের যুগের প্রতীক। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের মাথায় কবি সত্যেন দত্তর কবিতার একটা কলি লেখা আছে --"শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী, তাহারি তলায় মিলাব আমরা জগতে শতকোটি"। কবিতার ছত্রটি মহারাজের বেছে দেওয়া।

বিবেক মন্দির প্রভৃতির কাজ চলছে। মহারাজের সঙ্গে বিদ্যাপীঠের ভাবী কর্মকাণ্ড, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ নিয়ে কত রকমের গল্প হতো, কখনো স্বদেশবেদিতে, কখনো নিবেদিতা কলামন্দিরের সামনে, কখনো আম গাছের তলায়। রাম তখন বিদ্যাপীঠের একজন। মহারাজের ইচ্ছা ছিল, বিদ্যাপীঠের এই সকল কাজ হাত থেকে নামলে একটা স্বতন্ত্র ইউনিট হিসাবে বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গণে একটা পূর্ণাঙ্গ স্কুল অব আর্ট স্থাপন করা হবে বেলুড় মঠের অনুমোদন নিয়ে। ভারতীয় শিল্পের চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। স্বামীজীর ভাবধারা হবে শিল্পকলার মেসেজ। আমাদের এ -কাজ আরম্ভ করা হয়নি। আর স্বামী বিবেকানন্দের সেন্টিনারি ইয়ার পার হয়ে গেলেও আমাদের জল্পনা-কল্পনায় স্থির হয়েছিল যে, শতবর্ষের স্মারক হিসাবে একটা বড় মাপের স্বামীজীর সন্ন্যাসী মূর্তি গড়ব, আর মাঠের মাঝখানে ষাট ফুট উঁচু কংক্রিটের প্রজ্বলিত হোমশিখা গড়া হবে, সারনাথ স্কুপের মতো তার ভাব হবে গুরু-গম্ভীর। হোমকুণ্ডের সামনেটায় হবে ওপেন এয়ার ডায়াস, যেখানে শুকনো দিনে ছাত্রদের নানা অনুষ্ঠান হবে।

এই সব কল্পনা আমাদের পূরণ হলো না। হঠাৎ একদিন মহারাজ হাসতে হাসতে জানালেন যে, তাঁকে বোম্বাই চলে যেতে হবে সেখানকার আশ্রমের দায়িত্বভার নিয়ে। কয়েক দিন পরে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মঠের আদেশে। হাওড়া স্টেশনে তাঁকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। বিদ্যাপীঠ নিয়ে কত বড় কল্পনা। কত মায়া। কত টান অথচ এক ঝটকায় সব ঝেড়ে ফেলে চলে গেলেন মঠের আদেশে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের এই তফাত। মনে পড়ে,

আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "আস্তিক্য বুদ্ধি নিয়ে চলুন, তাতেই জীবনের শান্তি।" ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

আমার জীবনের কাজের একটা ছেদ পড়ল, হঠাৎ তাল ভঙ্গ হলো। তবে এসব কিছু না। "জীবনে যত পূজা হল না সারা...যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে-নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।" সবই হবে। অনেক বড় কিছু হবে। আমাদের কালে হলো না।

প্রভু বুদ্ধের রথচক্র বহু শতবর্ষ ধরে চলেছিল। সেই প্রেরণায় কত শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল। সংসারে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবধারা ছড়াবে। নব প্রেরণায় নব শিল্পের উদয় হবে।

এর অনেক আগে, একদিন মহারাজ পুরুলিয়া থেকে কলকাতার পথে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। আমি আর রাম সঙ্গে ছিলাম। মহারাজ রামানন্দর বাবা-মার অতিথি হয়েছিলেন। নন্দলাল তখন জীবিত, কিন্তু স্থবির। মহারাজ দেখা করতে গেলেন। রামই আমাদের নিয়ে গেল। মহারাজের মুখে নন্দলাল বিদ্যাপীঠের অনেক কথাই শুনলেন। স্বামীজীর হোম-বহ্নির মেমোরিয়াল গড়ব আমরা। তার বীজ আকারের পেনসিল নক্সাটা আমার কাছে ছিল। সেটা দেখালাম। খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন, "এত বড় স্ট্রাকচার কেমন করে করবে কে জানে, বাবা।" জীবনে অনেক শিল্পকাজ তিনি করেছেন। একনজর দেখেই আমাদের দিনের সম্ভব অসম্ভব বুঝেই কথাটা তিনি বলেছিলেন সেদিন।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্মকাণ্ড সমানে চলছে। স্বামী চন্দ্রানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী উমানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী একে একে এসে বিদ্যাপীঠ পরিচালনার হাল ধরেছেন। আজ বিদ্যাপীঠ দেশের এক শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যাপীঠের নানান সঙ্কটকালে মহারাজ মাঝে মাঝে বোম্বাই থেকে পুরুলিয়ায় এসেছেন পরামর্শাদির জন্য। আরব্ধ মন্দির যাতে দ্রুত শেষ হয় তার জন্যও কয়েক বার এসেছেন। স্বামী প্রমথানন্দ অধ্যক্ষ থাকাকালে মন্দির উদ্বোধনের উৎসবে এসেছিলেন এবং স্বামী প্রভানন্দের কালে তাঁর উদ্যোগে মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেত পাথরের বিগ্রহ গড়লাম, মহারাজ তার প্রতিষ্ঠার সময়ও এসেছিলেন। বেলুড় মঠ থেকে এবং মিশনের আরো নানা আশ্রম থেকে সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে উৎসব করে শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরুলিয়ায় বসিয়ে দিয়ে গেলেন।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ নিয়ে বিদ্যাপীঠে কালক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। যেমন ধীরে ধীরে নালন্দা গড়ে উঠেছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, সেবাব্রতীর অভাব নেই। সকলেরই কাজের প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্বামী বিবেকানন্দ। অনেক শিক্ষাবিদ সন্ন্যাসী আত্মনিয়োগ করেছেন শিক্ষণ কাজে। তাঁদের কারো অনুভবই ভ্রান্ত নয়। দীর্ঘদিন পরে আজ মনে হয় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দকেও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর—স্বামীজীর ভাবে চলতে দেওয়া উচিত ছিল।

সামান্য উপলক্ষে একটা গুরুতর কথা শুনেছিলাম, সেও এক মস্ত শিক্ষাবিদের কথা। তাই আগামী দিনের শিক্ষাবিদের কাছে আমার সেই শোনা কথাটা একটা উদাহরণ হিসাবে শুনিয়ে রেখে যাই।

হরেন মুখার্জি তখন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর। একদিন কয়েকজন শিল্পীকে মধ্যাহ্নে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বলেছিলেন, শিল্পীদের নিয়ে একসঙ্গে একটু বসব, তাই ডেকেছি আপনাদের। লেডি রানু মুখার্জি, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ এবং আরো কয়েক জনের সঙ্গে আমিও ছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠল। আচার্য সত্যেন বসু তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। গভর্নর বলেছিলেন, "সত্যেন বসু মস্ত লোক, তবু বিজ্ঞান নিয়ে শান্তিনিকেতনে অত করবার দরকার কি? বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আরো অনেক center খোলা যেত অন্য জায়গায়। আমি যদি বিশ্বভারতীর ভার পেতাম, রবীন্দ্রনাথ যে-শিক্ষাধারা প্রবর্তন করেছিলেন, ওখানে আমি তা-ই বজায় রেখে চলতাম।"

শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন মানুষ একত্রে শিখবে এই শিক্ষাই স্বামীজীর শিক্ষায় স্পষ্টতর। আমি শিল্পী, রামকৃষ্ণ মিশনকে

শ্রদ্ধার সঙ্গে শিল্পীর আর্জি জানিয়ে রাখি। মিশন তো শুধু আজকের জন্য নয়, দেড় হাজার বছর ধরে এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণ মিশন ব্রত হিসাবে অনেক কাজ করে থাকেন। মনুষ্য সাধারণের ঐহিক ও পারমার্থিক কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর গুরুভ্রাতা ও নবীন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে এবং নিজে মঠের কার্যপ্রণালী প্রণয়ন করে দিয়ে গেলেন।

সেই পরাধীনতার দিনে, ভাত-কাপড়ের সচ্ছলতার জন্য, সমাজ সংস্কারের জন্য, চিত্তবৃত্তির উন্মেষের জন্য স্বামীজী বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবক্তা ছিলেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির মধ্যে দেখেছি, শিল্পের পুনর্জাগরণও ছিল মঠের সন্ন্যাসীদের কর্তব্য কর্মের একটা মূল প্রোগ্রাম। ক, খ, গ—এই তিনটি কর্মসূচির মধ্যে "খ' সূচিতে উল্লেখ আছে "শিল্পকলাদির বিবর্ধন ও উৎসাহ দান"।

আজ মিশন জ্ঞান -বিজ্ঞান বিস্তারকল্পে স্কুল, কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতি মাধ্যম তো অনেক করেছেন। কিন্তু আর্ট স্কুল করা আজও হয়নি।

আমরা প্রত্যাশা করব মিশন একটি সর্বভারতীয় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করুন, যেখানে বিশেষভাবে ভারতীয় শিল্পের চর্চা হবে।

'ভারতীয় শিল্প" এই কথাটা আজ আচমকা কূপমূণ্ডকতা বলে মনে হবে। এ ধারণা মিথ্যা। নিজের দেশকে বড় করতে হলে অপর দেশকেও জানতে হবে বইকি। আজকের দিনের যেকোনো উচ্চশিক্ষাই comparative study নির্ভর। এক একটা যুগের শিল্পচিন্তা এক একটা যুগের ভাবের বিকাশ। নবীন ভারতবর্ষের সত্যই যদি কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি কোনো message থাকে, নিশ্চয়ই তার আর্টে তা ফুটে উঠবে।

স্বামীজী ঘোষণা করে গিয়েছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-প্রবাহ দেড় হাজার বছর ধরে চলবে।" এই চলাকে রসে-বশে রাখার জন্য শিল্প কলার প্রয়োজন, শুধুমাত্র প্রারম্ভ হিসাবে একটা পূর্ণাঙ্গ আর্ট স্কুল প্রবর্তনের কথা মিশনকে আজ ভাবতে হবে। "There must be art in everything"–এ শুধু নির্দেশ নয়, স্বামীজীর আদেশ। সম্পূর্ণ মানুষ হতে হলে এ-আদেশ আমাদের পালন করতে হবে।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বোম্বাই আশ্রমে চলে গেলেন। স্বামী চন্দ্রানন্দ পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারি হলেন। স্বামী চন্দ্রানন্দ (চন্দনদা), স্বামী প্রমথানন্দ (ধীরেনদা)— এই সকল কর্মী সন্ন্যাসীকে আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে চিনি। দেখেছি, বিদ্যাপীঠকে এঁরা বুকে করে ধরে রেখেছেন।

বিদ্যাপীঠে ছেলেদের মধ্যে স্বামী পূতানন্দের একটা আলাদা আসন আছে। তিনি চিফ ওয়ার্ডেন, আসলে তিনি সকলের কালীপদদা। কোন্ ছেলে কবে বিদ্যাপীঠে এসেছে, কবে পাস করে বেরিয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে তার নাম -ধাম, গার্জেনের নাম সব তাঁর মনে থাকত। অশান্ত ছেলেও তার স্নেহে বশ মানত। বিদ্যাপীঠের ছাত্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আমার সর্বদা মনে পড়ত। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে, শান্তিনিকেতনের কোনো ছাত্রের দুষ্টামি নিয়ে তাঁকে নালিশ জানিয়েছিল কেউ। পত্রোত্তরে রবীন্দ্রনাথ ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, "শার্ঙ্গরব, শারদ্বত যে কণ্বমুণির আশ্রমের খুব শান্ত ছেলে ছিল, তা মনে করবার কোনো কারণ নেই।" তবে দুর্বিনীত ও অসভ্য ছাত্রকে বিদ্যাপীঠ স্থান দেয়নি আর পাঁচটা ছাত্রের কুদৃষ্টান্তের কারণে। ছেলেদের লেখাপড়া, খেলাধুলা, আমোদ-আহ্লাদ সবকিছু ডিসিপ্লিন মেনে। কেউ দণ্ড পেলে মনে মনে কালীপদদাও দণ্ড পেতেন। "দণ্ড দেন, দণ্ড পান তিনি, নতুন বিচারে তাঁর নাহি অধিকার।" বিদ্যাপীঠের ছেলেরা এইভাবে মানুষ। বিদ্যাপীঠে থাকতে ছেলেরা এসব বুঝতে পারে না। বিদ্যাপীঠ থেকে বেরিয়ে এলে বিদ্যাপীঠকে চিনতে শেখে।

বাড়িঘরের কাজ মোটামুটি শেষ, মন্দিরের কাজ ঢিমেতালে চলছে। ছাত্র এবং শিক্ষক মহাশয়দের নিয়ে

বিদ্যাপীঠের এখন আসল ভাবনা, কিসে শিক্ষার মান উঁচু হয়।

কিছু দিন পর পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারি হলেন ধীরেনদা, আর চন্দনদা গেলেন দেওঘরে সেক্রেটারির পদ নিয়ে। মন্দিরের কাজ কিছুদিন স্থগিত ছিল অর্থাভাবে, এই সময় চন্দনদার আহ্বানে আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠের দু-একটা কাজ করে এসেছি।

ছেলেবেলায় পশ্চিমের হাওয়া খেতে গিয়ে বিদ্যাপীঠ দেখেছিলাম, সে দেখা আলাদা। বিদ্যাপীঠে শিল্পকলার কাজ করব বলে গিয়েছিলাম স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের ডাকে, ১৯৫৭ সালের কোনো সময় হবে। সবে ভোর হচ্ছে। আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠের ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, গেট খুলবে তার অপেক্ষায়। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম! ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। সেই আবছা ভোরে সাদা রঙের সারি সারি বাড়ি থেকে সাদা ধুতি -জামা পরা ছোট-বড় ছাত্রের দল একঝাঁক সাদা পায়রার মতো বেরিয়ে চলে গেল। প্রার্থনাসভায় গেল। দূর থেকে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি দেখে হোক অথবা গেট খোলার সময় হয়েছে বলেই হোক, ফটক খুলে দিল। আমি ভিতরে এলাম হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজের সন্ধান নিতে। একজন সাদা পোশাকের ব্রহ্মচারী মহারাজ (ধীরেনদা) আমাকে রিসিভ করলেন। সেই উষাকালে আমি প্রথম দেখলাম নির্মল সাদা রঙের বিদ্যাপীঠের ছবি।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমি উল্লেখের মতো তেমন কোনো কাজ করিনি। শুধু চন্দনদার অধ্যক্ষ থাকাকালে অল্পের মধ্যে মন্দিরের গেট আর সিঁড়ি মিলিয়ে একটা কাজ করেছি। এছাড়া এই প্রসঙ্গে একটা প্রকৃত বড় কাজ করেছি। সেখানকার একটা পাকা সিদ্ধান্তকে আমি কাজে পরিণত হতে দিইনি। আমি মনে করি, আদি বিদ্যাপীঠে সেটাই আমার প্রকৃত বড় কাজ।

স্বামী চন্দ্রানন্দ দেওঘর বিদ্যাপীঠে আর জায়গা খুঁজে না পেয়ে অবশেষে সামনের সারি সারি হস্টেল বাড়ির পিছনে নতুন মন্দির নির্মাণ করলেন। একতলায় লাইব্রেরি হল আর দোতলায় প্রার্থনাগৃহ। বেলুড় মন্দিরের একটা ছোট এবং সাদামাটা সংস্করণ। স্থানাভাবে লাইব্রেরি থেকে মন্দিরে ওঠার সিঁড়িটা যেন কোনোরকমে করা।

সামনের দু'টো একতলা হস্টেলের ফাঁক দিয়ে মন্দির দেখা যায়। আর একটু ফাঁকা হলে মানাত, তাই ঠিক হয়েছিল এবং ইঞ্জিনিয়ার গোপেনবাবু অগত্যা মত দিয়েছিলেন যে, সামনের বাড়ি-দুটোর কিছু অংশ ভেঙে ফেলা হোক।

এ ঘটনা আমি ঘটতে দিইনি। সাবেক দুটি বাড়ির মাঝখানে একটা মনোরম তোরণ, আর সেখান থেকে সরাসরি দোতলায় মন্দিরে পৌঁছাবার প্রশস্ত সিঁড়িটাই প্রধান প্রবেশদ্বার হলো। মন্দিরের অন্য রূপ খুলে গেল। পুরানো বাড়ির অংশ আর ভাঙতে হলো না।

ইংরাজ রাজত্বের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কত সন্ন্যাসীর জাগ্রত আদর্শে, তাঁদের প্রাণান্ত পরিশ্রমে, ভিক্ষালব্ধ অর্থে এই বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছিল। সে কালের সুযোগ সুবিধা মতো ঢাকাই ঢঙের বাড়ি। একটা যুগের চিহ্ন। পুরানো মিশনের স্মারক হিসাবে আমাদের তা রক্ষা করা উচিত। ভাঙব মনে করলেই পুরানো জিনিস ভাঙতে নেই। উপায়ান্তর না হলে বজায় রাখা দরকার। যাই হোক, দেওঘর বিদ্যাপীঠের কর্মকর্তা সাধুরা আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করেছিলেন। বাড়ি ভাঙা হয়নি।

একদা ইংরাজ শাসনের পরিপূর্ণ উদাসীনতার দিনে রামকৃষ্ণ মিশন বন্যায়, মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে ভিক্ষার দানে স্বামীজীর ভাবধারায় আর্তসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাতে এই বিরাট দেশের দুঃখ দূর হতো না। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে সেদিন লোকের মনে বল আসত, একটা প্রেরণা জাগত। যে-কাজ তখনকার গভর্নমেন্ট করত না, দেশাত্ম বোধে উদ্বেলিত মিশন তা পালন করত। 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম'।

অনুরূপ প্রেরণায় দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দেশের সব অশিক্ষা দূর করবার স্পর্ধা নিয়ে নয়, একটা

শিক্ষাদর্শ চোখের সামনে তুলে ধরবার মানসে। আজ আমরা আশা করব আমাদের স্বদেশী শাসন দেশসেবাকেই আদর্শ জ্ঞান করবে। একটা-দুটো বিদ্যাপীঠ এত বড় দেশের পক্ষ কিছু নয়, সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের মতো। শিক্ষাবিভাগের কর্তব্য ধাপে ধাপে শত শত বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলা।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের পরামর্শে বিদ্যাপীঠের মন্দিরের কাজ আবার নড়েচড়ে উঠল। মন্দির শেষ হলো এবং তার প্রতিষ্ঠা হল চুয়াত্তর সালে।

আমার জীবনে একটা মস্ত পুরস্কারের কথা বলি। হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ আমাকে স্নেহ-সম্মানে সবচেয়ে উজ্জীবিত করেছেন একটি কথায়। কথাটা আমার কানে এসেছিল। পুরুলিয়ায় সন্ন্যাসীদের মধ্যে পরামর্শ হচ্ছিল। মহারাজ আমাকে সেই আলোচনায় ডেকে পাঠালেন। কোনো কাজের বিষয় নিয়ে মহারাজ আমার মত জানতে চাইলেন। আমি আমার অভিমত জানালাম। সেটাই মহারাজ সঠিক বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, অন্য সন্ন্যাসীরাও rectification হিসেবে নিজের নিজের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করলেন। আমিও আপত্তি করিনি, কার্যকালে বিচার-বিবেচনা করে সকলের কথাই কিছু কিছু মানা চলে। কথা হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। একটা কাজ থেকে এসেছি, দ্রুত সে-কাজে ফিরে যাওয়া দরকার। ঘরের বাইরে আসতে শুনলাম, মহারাজ ধীরেন মহারাজদের বলছেন, "সুনীলবাবু প্রথমেই যেটা বলবেন, জানবে সেটাই আসল opinion। ওনাকে interrupt করলে উনি copromise করেন, কিন্তু সেটা ঠিক নয়।" কত বড় শিল্পের দরদী হলে শিল্পীর কথায় এতটা মর্যাদা, এতটা মান দিতে পারেন তাঁর মতো একজন বিদ্বান আর জ্ঞানী সন্ন্যাসী।

এই রকম মান দিতে দেখেছি বিরূপাক্ষ মহারাজকে, অবশ্য অন্যভাবে। অনেক দিন আগে শ্রীনাথ মহারাজ বয়সের ভারে মঠে ফিরে গেলে তাঁর জায়গায় বিরূপাক্ষ মহারাজ এলেন বাড়ি-ঘরের কাজ তদারক করতে। আমাকে নিয়ে আর মিস্ত্রিদের নিয়েই তাঁর কাজ। আমি যখন পুরুলিয়ায় যেতাম তিনি আমার কাজের নিত্যসঙ্গী থাকতেন। কাজ বুঝতেন, কাজে আনন্দ পেতেন। একটা নর্দমা হবে, তা-ও আমার সঙ্গে পরামর্শ করে করতেন। নর্দমাও ফেলনা কাজ নয়। বিরূপাক্ষ মহারাজের সন্ন্যাস নাম স্বামী গৌরীনাথানন্দ।

মনে পড়ে তাঁর ভালবাসার কথা। মন্দিরের মাথায় পঞ্চবটীর পাতার গড়ন করছি। সর্বদা গোপাল কি গোবর্ধন পাঁচতলা উঁচু ভারাতে আমায় চা দিয়ে আসত। একদিন ওরা কেউ আসেনি। দেখি কি, বিরূপাক্ষ মহারাজ হাতে ছোট কেটলি আর কাপ নিয়ে ভারায় আমার পাশে বসলেন। হাতে কেটলি দেখে আমি অবাক, সঙ্কোচে ও লজ্জায় মরি। বয়সে আমার চেয়ে খানিকটা ছোট, কিন্তু সন্ন্যাসী তো! আমি চা খেলাম। একেই বলে 'চা-পান না বিষ-পান' আর একেই বলে 'চা-পান না সুধা-পান। এই রকম কত সাধুর কত মধুর ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। অনাদি মহারাজ, চুনী মহারাজ, অনিল মহারাজ, শিবশঙ্কর মহারাজ— এখন তাঁরা মিশনের কোন্ আশ্রমে ঠাকুরের কোন কাজে ব্রতী আছেন, কে জানে।

স্বামী প্রমথানন্দ অরুণাচলের নাগারাকোট আশ্রমের ভার নিয়ে চলে গেলেন। স্বামী প্রভানন্দ (বরুণ মহারাজ) এলেন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারি হয়ে।

নতুন বদল এল। বরুণ মহারাজের সময় থেকে, বিদ্যাপীঠের লেখাপড়া একটা বিশেষ স্ট্যান্ডার্ডে উঠল। অনেক কল্পনা নিয়ে তিনি বিদ্যাপীঠে এলেন, অনেক কাজে হাত দিলেন। আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি যে, যত বছর তিনি পুরুলিয়ায় ছিলেন, অধিকাংশ সময়েই দেখেছি তাঁর হাই-ফিভার। কিসের জ্বর কেউ ধরতে পারে না। এ জ্বরের মধ্যেই বিদ্যাপীঠের সব রকমের কাজ করতেন। কিন্তু কি করে করতেন, আর কিসের জোরে!

প্রভানন্দ মহারাজকে বিদ্যাপীঠের সংস্রবে আমি আগে দেখিনি। তাঁকে দেখেছি সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে। বিদ্যাপীঠে যোগ দিয়ে প্রথমে ছেলেদের হাসপাতালের বিস্তার ঘটালেন ছাত্রবৃদ্ধির অনুপাত অনুযায়ী। তাঁর সঙ্গে

আমার কাজ শুরু হলো, তারপর যেন অনেক দিনের জানার মতো আমাদের সম্পর্ক হলো। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের স্নেহের সূত্রে আমরাও বিদ্যাপীঠের কর্মসূত্রে এক হলাম।

হাসপাতাল extension-এর পর গ্রামবাসীদের জন্য একটা ছোট আকারের ডিসপেনসারির প্ল্যান করতে বললেন। ধীরে ধীরে রোগীদের বসার জায়গা হলো, চিকিৎসার আরো সুযোগ বাড়ল। এর পাশে পোস্ট অফিস হলো। বিদ্যাপীঠের পোস্ট অফিসটাই স্থানান্তরিত করে আরো বড় করা হলো, গায়ে ব্যাঙ্ক। পোস্ট অফিসের ওপর পোস্ট মাস্টারের, ব্যাঙ্কের ওপর ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কোয়ার্টার্স হলো। রাস্তার ওপর বাড়ি। পথ চলতি গাঁয়ের মানুষের জন্য ব্যাঙ্কের দেওয়ালে বড় বড় রিলিফ মূর্তি গড়লাম। একদিকে লাঙল নিয়ে চাষি, আরেক দিকে শিশুপুত্রসহ আনন্দোজ্জ্বল কৃষক দম্পতি। চিকিৎসালয়ের দেওয়ালে উৎকীর্ণ করলাম ওষধি হাতে 'ধন্বন্তরি'। আর আমাদের প্রথম স্মৃতি জড়িত সেই পুরানো টিন শেড নতুন করা হলো। একদিন প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে টিন শেড ধুলিসাৎ হয়ে গেল। সেই জায়গায় নতুন বাড়ি হলো নতুন প্ল্যানে। নতুন দেখতে। পাকা তার ছাদ। তবু আমাদের মতো পুরানো লোকের কাছে ওটা এখনো টিন শেড।

স্বামী প্রভানন্দের কালে বিদ্যাপীঠের বড় কনস্ট্রাকশন এবং এক বড় কাজ হলো মিউজিয়াম বিল্ডিং করা। এর জন্য আমি আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ বলাটা ঠিক হলো না। কেননা মিউজিয়াম আমার নয়, বিদ্যাপীঠের— তবে আমার সামান্য সংগ্রহ নিয়ে এর আরম্ভ। তাই আমার– আমার। বিদ্যাপীঠের মিউজিয়ামের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়ে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কিনে এনেছেন অথবা সমসাময়িক শিল্পীদের দানে সংগৃহীত (এমনকী, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ, মণীন্দ্র গুপ্ত, রমেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের দু-একখানা করে চিত্র ও ভাস্কর্য থাকায়) আর্ট গ্যালারিটিও মূল্যবান হয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠের মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি পুরুলিয়ার লোকের জন্য অবারিত হবে, অথচ ছেলেদের পড়ায় ও খেলায় বিঘ্ন হবে না, এর জন্য কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা আলাদা ভবনের পরিকল্পিত প্ল্যান ও মডেল রচিত হয়েছিল।

স্বামী প্রভানন্দ নতুন উদ্যমে, নতুন উদ্যোগে দিল্লির সহায়তায় আরো ফলাও করে যাদুঘর ভবন নির্মাণ করলেন। নতুন নক্সায় বিদ্যাপীঠের যাদুঘর এখন নতুনরূপে গড়া হলো রাস্তার ধারে, সর্বসাধারণের দেখার সুবিধার জন্য। পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ এন. আর. ব্যানার্জি দিল্লি থেকে এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা না করলে হয়তো এতটা হতো না। তিনিও দেওঘর বিদ্যাপীঠের বয়োবৃদ্ধ প্রাক্তনী, বিদ্যাপীঠের বৈভবকে উজ্জ্বল করলেন।

মিউজিওলজি সম্বন্ধে স্বভাবতই আমাদের জ্ঞান নেই। বিদ্যাপীঠের যাদুঘর সম্বন্ধে পানুদার কথা আমাদের ভোলবার নয়। শ্রদ্ধেয় প্রাণকৃষ্ণ পাল শিল্পী হিসাবে আমার অগ্রজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম তাঁর হাতে সাজানো এবং গোছানো। ১৯৮০ সালে বিদ্যাপীঠ মিউজিয়ামের যখন আলাদা ভবন হলো সাধারণের জন্য, স্বামী প্রভানন্দের আমন্ত্রণে পানুদা বিদ্যাপীঠে এসে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই মিউজিয়াম একা সাজিয়ে দিয়ে গেলেন। খাতাপত্র তৈরি করে, নম্বর করে, জিনিসের বিবরণ, কোথা থেকে পাওয়া, কার দেওয়া— সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। বিদ্যাপীঠের মিউজিয়ামকে বিধিমতো গড়ে তোলার জন্য অভিজ্ঞ পানুদাকে আমাদের দরকার ছিল। আশুতোষ মিউজিয়াম থেকে তাঁর অবসর নেওয়ার সময় হয়ে এসেছিল, আমরা তার অপেক্ষায় ছিলাম। পরে বিদ্যাপীঠের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী উমানন্দের আহ্বানে পানুদা বিদ্যাপীঠ মিউজিয়ামের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। বছর চারেক কাজ করেছেন। সেবা হিসাবেই করে গিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, অকস্মাৎ ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের এ ক্ষতি কথা দিয়ে বোঝাবার নয়।

বিদ্যাপীঠ যাদুঘর সম্বন্ধে কিছু কথা বাকি রয়ে গিয়েছে। বলা দরকার। দেখেছি, পুরুলিয়া অঞ্চলে চারিদিকে

ইতস্তত জৈন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন উপেক্ষায় পড়ে আছে। পার্শ্বনাথের পাথরের ভাঙা বিগ্রহ কোথাও শিব বলে পূজিত হন, কোথাও বা কোনো দেবীমূর্তির সামনে বলিও হয়ে থাকে। কারুকার্য করা থাম, লিন্টেল মাটিতে প্রোথিত রয়েছে। আর্কিওলজি বিভাগের এনামেলের বিজ্ঞপ্তিও সেখানে নেই।

বিদ্যাপীঠের পাশেই ছড়রা গ্রামে কতকগুলি ছোট জৈন ধাতুমূর্তি একটা চণ্ডীমণ্ডপের মতো চালায় জড়ো করে রাখা আছে। পাইকারি হিসাবে নিত্যপূজাও হয়। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ খবর পেয়ে দেখতে গেলেন। গ্রামের প্রধানকে বলেছিলেন যে, এ মূর্তিগুলির বদলে মিশন থেকে একটা পাকা চণ্ডীমণ্ডপ করে দেবেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা রাজি হলো না, গ্রামের অমঙ্গল হবে এই ভয়ে।

আরম্ভর সময় থেকে মিউজিয়ামের সংগ্রহ আশানুরূপ বাড়েনি। রানাঘাট বীরনগর অঞ্চল থেকে রামানন্দ কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তি দিয়েছে। আর স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ নন্দলাল বসু রচিত কামারপুকুর পাথরের মন্দিরের পোড়া মাটির স্কেচ মডেলটি কামারপুকুর থেকে এনে দিয়েছেন। এবং এ অঞ্চলের কিছু টেরাকোটা ও পুরুলিয়ার দু-তিনটা পাথরের জৈনমূর্তি দান হিসাবে গ্রহণ করে বিদ্যাপীঠে এনেছেন। সারদা মন্দিরের পিছনের দিকটা যখন বাড়ানো হলো, তার বেসমেন্টের ঘরে মিউজিয়াম স্থানান্তরিত হলো। এই রকম সময়ে এক ঘটনা ঘটে গেল। কোনো এক গ্রামের কিছু লোক একটা পাথরের বড় জৈনমূর্তি গরুর গাড়ি করে এনে বিদ্যাপীঠকে দান করে সারদা মন্দিরের সামনের প্রান্তরে রেখে গেল। দু-তিন দিন পরে পুলিশ এল সেই গ্রামেরই অন্য দলের নালিশ মতো। মহারাজ সে– মূর্তি ফিরিয়ে দিলেন। উপরন্তু বিদ্যাপীঠে নিয়ম করে দিলেন যে, সর্বসম্মতভাবে কোনো দান না পেলে তা গ্রহণ করা হবে না। হালে কমলে– কামিনীর একটি প্রাচীন চিত্র আমাদের সংগ্রহে এসেছে। ছবিটি দিয়েছে আমার ছাত্র, শিল্পী গৌর মৌলিক।

কে আর দান করার স্পর্ধা রাখে। রোদে-জলে মাঠে পড়ে নষ্ট হয়। লাইব্রেরি, মিউজিয়াম বাতিকগ্রস্ত লোকের গোপন সংগ্রহ। একে চুরি বলে না। ভদ্র ভাষায় বলা হয় collection, মিশনে collection করাও মহারাজের আদেশে নিষেধ। তাই মিউজিয়াম আর বাড়ছে না। শুধু আর্কিওলজি বিভাগ সচেষ্ট হলে পুরুলিয়ার পুরানো জিনিসের কিছু সংগ্রহ বিদ্যাপীঠের মিউজিয়ামে গচ্ছিত রাখতে পারে। দান ছাড়া কিনে সংগ্রহ বৃদ্ধি করার সামর্থ্য বিদ্যাপীঠের নেই।।

যাদুঘর গৃহের ক্রমান্বয়ে দিল্লী যাতায়াত করতে করতে স্বামী প্রভানন্দের হাই-ফিভারের কারণটা ধরা পড়ল। বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গণে ঢুকলেই তাঁর জ্বর। জ্বরের কারণ এলার্জি। অর্জুন গাছের সংস্রবে তাঁর জ্বরের প্রকোপ। রোগের কারণ ধরা পড়ায় পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের অর্জুনের হাওয়া থেকে দূরে তিনি বেলুড় মঠের কাজে বদলি হলেন।

সেই থেকে, বর্তমান বিদ্যাপীঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন স্বামী উমানন্দ। বিদ্যাপীঠ একটা পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে। শিক্ষার মান এখন সর্বোচ্চ। বিদ্যাপীঠ আর উচ্চ মাধ্যমিক নয়। মাধ্যমিক স্কুল। বাইরে থেকে দেখলে একটা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল মাত্র। শুধু পিছনে এর স্বামীজীর ভাবধারা, তাই জাগ্রত এক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যাপীঠের ধারে কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যবিধ নানা উদ্যোগ চলছে। অবশ্য উমানন্দ মহারাজের বিশেষ লক্ষ্য বিদ্যাপীঠের ছেলেদের মানুষ করা। সেদিক থেকে তিনি সর্বদা জেগে আছেন। যে কোনো স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষার রেজাল্ট একটা বড় সার্থকতা। সে বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক। প্রতিটি ছাত্রই এখানে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বিদ্যাপীঠের পাঠ সাঙ্গ করে বেরিয়ে আসছে। এই সঙ্গে আমরা আরও চাইব– চাইব শুধু ভাল ছেলে নয়, বিদ্যাপীঠ থেকে শিল্পবুদ্ধি, বিজ্ঞানবুদ্ধি আর শুভবুদ্ধি নিয়ে ন্যাশনাল ফিগার বেরিয়ে আসুক। বড় হয়ে মানুষের দুঃখ মোচন করুক। এই হোক শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্বামী উমানন্দের ও মাস্টারমশাইদের জেগে থাকা সফল হোক।

বিদ্যাপীঠ এখনো বাড়ছে। ছাত্রদের লেখাপড়ার সঙ্গে তাদের খেলাধুলার আরো উন্নতির জন্য একটা স্টেডিয়াম

বা ক্রীড়া-অঙ্গন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আর এক কাজ আমাদের এখনই করতে হবে। বিশেষ তত্বাবধানে ও নজরে রাখার জন্য বিদ্যাপীঠের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে, যেখানে সর্বদা প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে মিউজিয়ামের অংশ হিসাবে ছোট এক নতুন গৃহ নির্মাণের একান্ত আবশ্যক। যাদুঘর থেকে চুরির একটা হিড়িক চলছে এবং অমূল্য সম্পদ বিদ্যাপীঠ যাদুঘরে বেশ কিছু আছে।

আর এই সব নতুন নতুন সৃষ্টির সঙ্গে আরো কঠিন দায়িত্ব রয়েছে স্বামী উমানন্দের ওপর। সৃষ্টি করা এক কাজ, তাতে উন্মাদনা থাকে, থ্রিল থাকে, কিন্তু বজায় রাখা আর এক দায়িত্ব। বড় ক্লান্তিকর, বড় বিরস। আমরা উৎসাহভরে তৈরি করি, কিন্তু ধৈর্য নিয়ে বজায় রাখার কথা আর ভাবি না। ইংরেজরা মেন্টেনেন্সের চিন্তা মাথায় নিয়ে তবে সৃজন করে। এ আমাদের শিখতে হবে। বিদ্যাপীঠের প্রয়োজনে কত বিষয়ে কত কি বেড়েই চলবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা— Expansion is life বিস্তারই প্রাণের লক্ষণ। বিদ্যাপীঠের ছাত্রদেরও হৃদয়-মনের বিস্তার ঘটুক- 'নতুন ভারত বেরুক'।

ক্লাস আরম্ভের সময় বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা সারদা মন্দিরের ভিতরের প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষের পিতলের মানচিত্র এবং সিস্টার নিবেদিতার প্রেরণায় অবনীন্দ্র নাথ অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে গড়া ভারত-মাতার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা করে— "I am an Indian...every Indian is my brother." বিদ্যাপীঠের এ প্রার্থনা সত্য হোক।

লেখক প্রসিদ্ধ ভাস্কর ও বিদ্যাপীঠের আদি থেকে যুক্ত ছিলেন

প্রবন্ধটি স্বামী শিবপ্রদানন্দের সৌজন্য প্রাপ্ত ও পুনঃমুদ্রিত

শ্রী সুনীল পাল মহাশয়ের সৃষ্ট কিছু শিল্পকীর্তি

সারদা মন্দির-১

সারদা মন্দির-২

সারদা মন্দির-৩ ও ৪

নিবেদিতা কলামন্দির-১

নিবেদিতা কলামন্দির-২ ও ৩

নিবেদিতা কলামন্দির-৪

প্রধান প্রবেশদ্বার

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-১

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-২

শ্রী সুনীল পাল মহাশয়ের সৃষ্ট কিছু শিল্পকীর্তি

মূল মন্দিরের

ঠাকুরের প্রস্তর মূর্তি

ঠাকুরের আঁকার অণুকরণে–জাহাজ

সেন্ট্রাল অফিস

ঠাকুরের আঁকার অণুকরণে– আতা গাছে তোতা পাখি

উপরে বিবেক মন্দির, বাঁদিকে উপরে সভাগৃহ, বাঁদিকে নিচে জিমন্যাসিয়াম

Gone with the wind

Subrata Chakrabarty (1981)

Our Vidyapith

Swapan Bandyopadhyay (Former Teacher)

On this barren remote land
Ushered in a dawn of hope
Reflecting rays of Ideal grand,
Vistas opened ample scope.
In this serene, serving place
Divinity dispels doubt – duress,
Yon peeps the aura of space,
Always prompts for right progress.
Purity – Practice – Prayer mould
Inspires growth of selfless go,
Together in Love and Spirit bold
Humbly tread to steal the Show.

Book Review

Review of 'Esecho Jyotirmoy'

Md. Anwarul Haque (Teacher)

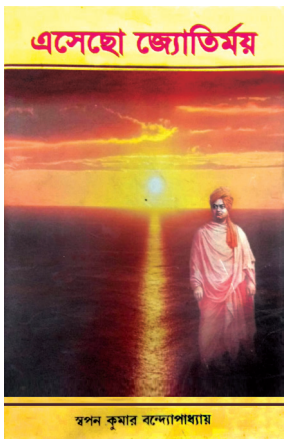

Poetry writing is an art only a few can master. It requires a poet to have insight and be a keen observer. A poet translates his observations and thoughts into well-set lines which become poetry. The lines contain the emotions and surging feelings of the poet. Robert Frost has said once that, *"Poetry is when an emotion has found words."* A poet banks on the power of vocabularies. He uses the words to express his feelings and emotion, which he gathers from his surroundings and arranges them in quietude. William Wordsworth expresses this feeling very beautifully, *"...It takes its origin from emotion recollected in tranquility."*

Shri Swapan Kumar Bandyopadhyay, popularly known as Swapan-da to one and all, has the power and energy of a keen observer and is an obedient disciple of nature. He has a heart of a child and energy of an untiring soul. He is a man full of positivity. Besides all these extraordinary qualities, he is a poet par excellence. He has to his credit innumerable poems and especially acrostic ones. It is a kind of poem whose first letters of each line, when read downward, make the title. He in fact inherited it from his late father Shri Sailendra Kumar Bandyopadhyay, who himself was also a poet of great repute.

Swapan-da presented a book entitled, "ESECHO JYOTIRMOY", which is a collection of poems in Bengali and English. He is a great devotee of SRI THAKUR-MA-SWAMIJI and teaches the message of the trio. Swami Suprananda Maharaj has opined that "He taught English at Vidyapith and preached Swamiji-Ma-Thakur literally through his words and deeds." (p.101). The lines of the poems are true and refined expressions of a devoted poet. This fact is attested by Sri Mahesh Prasad Mishra, who opines that "It is obvious that the lines composed are but a spontaneous expression of a candid heart that merges deep into the ever free Soul." (from back cover page of the book). His impressive teachings have inspired the young minds, especially students, to be ardent and aggressive followers of Swamiji. The following lines from his book are the reflections of his love for Swamiji. *"Second to none, at the top—,/ Welcome note to awaken play,/ Ask to advance*

without stop,/ Making man to try and pray. Invigorate the weak in gloom,/ Joy for ever in hearts may bloom—,/ Invincible spirit in zeal must fume." (p.114).

His poems clearly emit a message to be brave and fearless like Swamiji. He says that, *"Hail thou blend of heart, head, hand!/ Endow man with boldness great,/ Odds and ill may brave we straight."* (p.117). He further says that, *"Inspires children to be heroes, /Encourages to become brave, sincere, selfless, pure and true,/Enlarge vision, positive, views."* (p.116). Our mother India, even after her independence, requires selfless and tireless young men to consolidate her further. Swapan-da expresses this dynamic thought in the following lines. *"Peerless love you bore in heart; /Awaken Nation from deep,/ To raise the people did you dart,/ Ignite the robust zeal."* (p.116). The poet through his poem has stressed the invoking and appealing ideas of Swamiji on man-making and character-building. He unfolds Swamiji's ideas as, *"Able, agile, serving self,/ Gearing up to move inside,/ Chariot grand will forward go, /'Help not fight' will make his guide,/ Rays of love and trustfulness,/ Aura of selfless feel will do–,/ Novel training, lesson true–,/ Godly self beams cosmic blue."* (p.143). He, a staunch follower of Swamiji, believes firmly in his ideology and preaches the same to people about love and selfless service that Swamiji stands for. He, being a good teacher, orator and beyond doubt an able administrator, asserts the dictum of Swamiji that, "Love is the law of life." In this regard, he sums up this soaring idea in his poem that, *"Love that knows no condition,/ or that does not know return–, /Embracing, rolling, serving trait, /Leads men all from dark to light. / Loving kinship causes thrill, / In love all the feelings merge./Fathomless is love's deep sea–,/Elevates life, emanates glee."* (p.142). He further says that, *"Love upon man as God in frame,/ Overwhelmed feel in empathy, love–,/ Imbibe broadness, love for all, / Solemn, sacred spirit till, / Fathomless being your love for man, / Embolden your zealous span."* (p.153).

Swapan-da has stuck to the high ideology of Swamiji's selfless service to humanity. He is a matchless social worker and he is attached to uncountable social organizations where he serves men as God. He has expressed this noble and kind idea in the following lines, *"Serving man in real zeal,/ Earns for one divine bliss–, / Imbued with the selfless zest, /Candid serves bubble in glee, Extract out from within the best–,/ Tussles win and come out free,/ oozes out deep love for man, / melts the heart in cosmic feel,/ Inspired feel the man who serves,/ Sure to get a divine touch, Inner self makes ceaseless hay,/ clearly feels what man does need, / On serving god in man one feels, / Divine joy and virtue reels."* (pp.154 &-155). Swamiji dreamt of a materially and spiritually dominating and successful India. He had firm faith in each and every Indian soul for her prosperity and development. He once said, "Each soul is potentially divine." The poet has reflected Swamiji's lofty and rare idea in his poem, *"Cheer he gets in zeal to serve–, Heart and head in zest does build, / Untiring spirit man thus gets, / Love's lap lists lingering flow, / In man dazzles Supreme Soul, / Nonchalant the self-divine–, / Eager to trace a selfless mine."* (p.156). To make India a bright and powerful country,

we must accept our duty as worship. He has beautifully moulded Swamiji's ideas in his poem. "Work is what man does with zeal, open mind will help advance--, Indeed work turns worship--, Sublime, solemn, people feel—Spirit of service, calmness grow, Hearty traits develop all." (p.155).

This book contains 158 pages having two sections i.e., Bengali and English. There are 75 Bengali and 75 English poems. The front cover has a full photo of Swamiji and beside him the rising sun with its beautiful beams on the flowing water of the sea. It was published and printed by Nanritam, Kolkata and Modern Press, Purulia respectively. This book is dedicated to Swami Lokeshwarananda Maharaj. Swami BalabhadranandaMaharaj is the cause behind the existence of this book. He had in fact gifted Swapan-da a diary and urged him to compose a poem daily in it. Hence, his inspiration resulted in a form of book which we have in our hands today. The cost of the book is affordable for all. I appeal to students to get a copy to dive deep into Swamiji's thoughts through the poems of Swapan-da.

Humanistic Training in Writing and Renaissance Pedagogy

Dr. Niranjan Goswami (1976, Madhyamik)

It is a commonplace to say that educational reformers in the fifteenth and sixteenth centuries, whom we call humanists, were preoccupied with the teaching of writing orations or literary compositions or letters in an elegant way. In their teaching of the trivium, or the three propaedeutic disciplines of grammar, rhetoric and logic, they were committed to nurture and develop in their students a love for elegant expression and refined style in speech and writing. But the seven liberal arts, i.e. the *trivium* and the *quadrivium* entered the western tradition through the early fifth century Martianus Capella's *Marriage of Philology and Mercury*. Scholastics and humanists alike used this framework of arts course as an ideal frame of reference. Not only that, the medieval traditions of *ars arengandi, ars versificatoria,* and *ars dictaminis* also taught some kind of rhetoric and composition. The medieval *grammatici* were quite strong a pedagogical force in their own way. In the present essay, therefore, I will try to trace how some of the major humanists were effective in bringing about a change in the arts course through their reform in rhetoric and dialectic so that the 'humane studies' through gradual adjustments in syllabus and teaching practice tended to be most importantly a teaching of writing. Such an excessive engagement with writing problems could not but have influenced the Renaissance authors, many of whom had a literary training in grammar schools and universities where the precepts of humanist writing were taught.

Rudolph Agricola:

The humanist dialectician who was responsible for major academic re-orientation in favour of writing was the Frisian scholar Rudolph Agricola. He studied Latin and Greek for ten years in Italy. Unlike the Italian humanist Lorenzo Valla, who was some sort of revolutionary in his views of dialectic and therefore was strongly resented by the establishment, Agricola was widely accepted and his *De inventione dialectica* remained a text for logic replacing Peter of Spain's scholastic manual in European universities for a long time. Agricola, however, accomplished a silent revolution by giving priority to topical invention over judgement or disposition, i.e. the part of logic which was concerned with the theory of proposition, syllogism and their arrangement. His detailed discussion of the process how arguments should be generated from the different topical heads promoted a practice of dialectical invention in literary writing. He was a pioneer in giving literary examples of invention and showed how literary texts could be dialectically analysed. In both of these he was later followed by Ramus. His technique of a dialectical reading

that uncovers the argumentative structure of an oration has been exemplified in his dialectical and rhetorical commentary on Cicero's oration *De lege Manilis*. Besides this new approach Agricola's logic was further a curiosity being delicately balanced by such parts of rhetoric as status theory, exposition, the handling of emotions, and disposition of an oration.

Aphthonius's *Progymnasmata*

The second volume of Alardus's Cologne (1539) edition of Agricola contains a series of teaching works associated with a graded programme of instruction in the liberal arts. It contains Agricola's translation of Aphthonius's *Progymnasmata* to which Alardus added his own commentary and Priscian's Latin version of Hermogenes's work of the same name. The volume also includes fragments of a commentary by Agricola on Seneca's *Declamationes*, and some of Agricola's important and influential orations and letters including the essay-letter *De formando studio lucubrationes*. This last work is supposed to have provided a blueprint for humanistic teaching practice including much 'Erasmian' features as commonplaces and notebooks. Agricola as mediated by Alardus and praised by Erasmus effectively set an ideal of a self-sufficient programme of the liberal arts.

The *narratio* (illustrated story) of Venus and Adonis in Aphthonius:

The exercises in Aphthonius aimed at producing a routineness of imaginative writing by reducing its variety systematically to a sequence of specified types of verbal composition, including both narrative forms and argument forms.The types were mainly *chreia*, or the ethical issue, *maxim*, *encomium*, *ethopoeia*, and *ekphrasis*. Each type will gradually become second nature to the student and will shape his public speech. As example of Agricola's Aphthonius being used for such a purpose I may mention Edward VI's student exercises, as represented by T.W. Baldwin. Sometimes in Elizabethan literature traces of such Aphthonian exercises in writing may surface. I wish here to quote an example discussed by Lisa Jardine. In Aphthonius the second example is the imagined narrative with illustrative point or the *narratio*. The example in the text considers the way in which the beauty of the rose brings to mind the 'wound' of Venus – her love for Adonis and her subsequent grief at his death:

"If anyone marvels at the beauty of the rose, let him consider with me the wound of Venus. The goddess loved Adonis, while Mars loved the goddess… Mars, in envy of Adonis, decided to kill him, thinking that his death would be the only remedy for (the goddess's) love. When Adonis was struck down, and the goddess has learnt of this, she rushed to his aid; and having in her haste chosen a path that led through rose bushes, she encountered their thorns, and grazed her heel. The blood which flowed from the wound changed the colour of the rose. That is how the rose, initially white was transformed in colour to that which we now know."

Succinctness, simplicity and emotional compactness of the narratio are to be emulated by the student. As if it were not enough, Alardus adds to this Politian's version of the same narratio. Quoting the following stanzas from Shakespeare's 'Venus and Adonis' Jardine reads an Aphthonian/Agricolan influence in them:

Even as the sun with purple colour's face
Had ta'en his last leave of the sleeping morn,

Rose-cheek'd Adonis hied him to the chase;
Hunting he lov'd, but love he laugh'd to scorn.

Sick-thoughted Venus makes amain unto him,
And like a bold-fac'd suitor 'gins to woo him.

'Thrice fairer than myself', thus she began,
'The field's chief flower, sweet above compare;

Stain to all nymphs, more lovely than a man,
More white and red than doves or roses are:

Nature that made thee with herself at strife,
Saith that the world hath ending with thy life.

'Purple-color'd' (In Elizabethan English 'purple' often meant a colour ruddier and brighter than in modern usage… Shakespeare often uses it of blood'), 'rose-cheek'd', 'More white and red than doves and roses', must surely remind the sixteenth-century schoolroom-product, drilled on Agricola's Aphthonius, that Venus's infatuation is doomed, just as her rose is doomed to change from white to red. The kind of 'readiness' these exercises give the student is readiness of expression and readiness of expectation: the ability to select, and to anticipate the right turn of phrase, the appropriate commonplace reference point for a given (typical) occasion. 'Exemplary', in this context, taken on the specific meaning of 'forceful and emotionally compelling because all-too-well-known.'

This reminds us of Milton's use of the myth of Thammuz and Astarte (Syrian transformations of Venus and Adonis) in *Paradise Lost*, *Book I*. But there it is not the rose that changes colour but the river that turns red. I quote this all-too-familiar passage for the sake of present convenience:

"…Thammuz came next behind,
Whose annual wound in Lebanon allured
The Syrian damsels to lament his fate
In amorous ditties all a summer's day,
While smooth Adonis from his native rock
Ran purple to the sea, supposed with blood
Of Thammuz yearly wounded…." (Paradise Lost, Bk. 1, 445-452)

I do not suggest that Milton was guided by the same passage in Aphthonius/ Agricola, though he was no less a product of humanist education. But it is likely that he was familiar with the complex nebula of Renaissance myth and might have stored it away in memory or in his Commonplace Book for future use. We also note Milton using the same word 'purple' in connection with blood as Shakespeare often did. Doubtless the two authors were working under the literary compulsions and propensities of similar kind.

Desiderius Erasmus Roterodamus: Writing Exercises:

The different kinds of exercises that a student should routinely perform were laid down by Erasmus in his *De ratione studii* (1511). As his prescriptions remained highly influential for the next hundred years or more it is worth quoting at some length:

"The form of the exercises can generally be as follows: At one time he should set out the subject-matter of a short but expressive letter in the vernacular which is to be construed in Latin or Greek or both. On another occasion he should set a fable, on another a short but meaningful narrative, on another an aphorism composed of four parts, with a comparison between each of the two parts or with an accompanying reason attached to each. At one time the adducing of proofs should be dealt with in its five parts, at another the dilemma in two, at another what is called expolitio or refinement should be developed in its seven parts. Sometimes, as a prelude to rhetoric, the pupil should deal with one of the parts separately. Aphthonius has written rhetorical exercises of this sort. Sometimes they ought to deal with praise, censure, mythology, simile, comparison; sometimes with a figure of speech or description, division, impersonation, rhetorical question and answer, signification. They should be regularly instructed to turn verse into prose, and at different times to put prose into verse. From time to time they should imitate in vocabulary and style a letter of Pliny or Cicero. Sometimes they should express again and again, the same proposition in different words and style. Sometimes they should vary the expression of the same proposition in Greek and Latin, in verse and prose. Sometimes they should express the same proposition in five or six kinds of metre which the teacher has prescribed. Sometimes they should recast the same proposition in as many forms and figures as possible."

Peter Ramus and his *Dialectic*:

The French humanist Peter Ramus rose to great fame as well as notoriety because of his participation in academic politics and polemics. His reforms in dialectic and rhetoric had far-reaching influence and were accepted in most Protestant countries. For us he is important because he intimately linked the teaching of dialectic and rhetoric with good literature. The influence of Ramus's logic on literature is manifold; Ramus's theory of method, dialectical and rhetorical analysis of texts, his views on Ciceronian style, his own analysis of Cicero's speeches – all affected in some way or other the literary men of his time. Here we will discuss only one of his classroom exercises – that of analysis and genesis.

For Ramus analysis is a kind of exercise in reading a literary text:

"[It is]… the examination of our own or others' examples in which invention and composition are to be looked into… In logic analysis is the marshalling of the argument, enunciation, syllogism, method, in short of the whole art of logic, as it is prescribed in the First Book of Analytics [of Aristotle]."

The Ramist method of analysis which is a way of didactically operating upon a text became immensely popular and such relentless exercises taught men how to extract arguments from a text and trace the places from which these arguments were derived; what were the syllogisms involved in the arguments and how they were finally methodically arranged in the text. The complementary exercise of genesis was also called *compositio*. This exercise aimed at imitation of the method of an author and finally moving out to greater freedom of expression.

"Genesis is not the study of given examples as analysis is, but is rather the making of a new work. This exercise follows the one and the same way of writing and teaching. Now, in writing, the first and easiest way is imitation. Hence we must look carefully too whom we imitate… But next we must strike out for ourselves, and take our independent arguments from popular daily affairs close to ordinary life; then draw the causes, effects and other genera of the available arguments from the source of invention; and finally, make use of all the rules of disposition with equal care, concluding now this way, now that way… "

By the second half of the sixteenth century, to be more specific, in the last three decades Ramist texts were eagerly studied in most European universities. In England whereas Cambridge was the hotbed of this new academic movement, Oxford also could not escape its influence. For the next hundred years Ramist studies would steadily pervade the world of letters in Europe and in New England and the movement that started during Philip Sidney's lifetime would continue to be influential till the age of Milton.

In this essay I have touched upon some of the major reformers in educational theory and tried to show how they were greatly concerned with the teaching of writing in various forms.I do not claim to have discussed in detail the major types of writing taught in the grammar schools like the theme, the essay, the declamation, the letter or the disputation; instead my focus was on the theoretical aspects of writing and the changes taking place therein. It will, however, be wrong to assume that the scholastic genres like the question, the lecture, the disputation and the declamation were completely replaced by the humanistic modes. Those continued to be taught and written even in the seventeenth century – but they were then no longer fashionable and had lost their original force.

1. Walter J. Ong, *Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason* (Cambridge, Massacusetts: Harvard University Press, 1958); Chapter 6.
2. P.O.Kristeller, *Renaissance Thought and its Sources* (New York: Columbia University Press,1979), Chapter 6.

3. On the development of *studia humanitatis*, see P.O. Kristeller, Ibid. p. 98ff.
4. Peter Mack, *Renaissance Argument: Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric andDialectic* (Leiden: Brill, 1993)
5. Anthony Grafton and Lisa Jardine, *From Humanism to the Humanities: Education and Liberal Arts in Fifteenth and Sixteenth-Century Europe* (London: Duckworth, 1986), p. 129.
6. T.W. Baldwin, *William Shakespeare's Small Latine and Lesse Greeke* (Urbana: University of Illinois Press, 1944) Vol.1, pp. 233-34.
7. Agricola, *Lucubrationes 10*, cited and trans. by Grafton and Jardine, *From Humanism to the Humanities*, p.132.
8. William Shakespeare, *The Poems* (London: Methuen, 1960), ed. F.T. Prince, p.11, 1 -12.
9. Grafton and Jardine, *From Humanism to the Humanities*, p. 133.
10. Erasmus, *De ratione studii ac legendi interpretandique auctores* trans. Brian McGregor in *Literary and Educational Writings* 2 Ed. Craig E. Thompson, *Collective Works of Erasmus*, 24, Toronto, 1978, p.678ff.
11. Renaissance humanists preferred the term dialectic over logic. The latter was favourite of the medieval scholastics.
12. Ramus, *Scholaedialecticae*, Lib II, Cap.VIII in *Scolae in Liberals Artes* (1569).
13. Ibid.
14. William T. Costello, *The Scholastic Curriculum at Early Seventeenth-Century Cambridge* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1958).

Associate Professor and Head of the Department of English at Chandernagore College, Hooghly and Guest Lecturer at the Postgraduate Department of English at Loreto College, Kolkata. He was a Fulbright Senior Research Fellow at the Department of English, Harvard University (2010 -2011).

Autism Creates: An Inspirational Journey

Dr. Somnath Sengupta (1976, Madhyamik)

[Somnath is an alumnus of the 1976 Madhyamik batch. After graduating from IIT (Kharagpur), University of South Florida, Tampa, USA, and then working at MIT (Cambridge, Massachusetts) he has had a successful career in engineering entrepreneurship. One of his four children is in the autism spectrum; this made him embrace the cause of upliftment of autistic children and their employment in the USA. In India he advises similar organizations. Somnath has told his story in a matter-of-fact way, but we can discern the high passion and commitment running below. – Niranjan Goswami]

An estimated 5,437,988 (2.21%) adults in the United States have ASD. Of those people, it is safe to assume that there are about 1 to 2 million people of working age that are either underemployed or unemployed. With more than 80% unemployment or underemployment for adults with ASD, they are the least employed of all disability groups, yet this community possesses skills desperately needed in STEM fields and other fields. Superior visual discrimination ability (i.e., pattern recognition), attention to detail, and unique approaches to problem-solving are hallmarks of an Autism diagnosis.

Figure 1. The AUTISM CREATES® trademark signifies the positive attributes of adults with autism

With that clear need for employment and a son diagnosed with autism, Dr. Somnath Sengupta set forth to apply his successful small business skills towards creating opportunities for adults with autism. The autism spectrum includes a variety of levels of competence and support required for succeeding. Under the banner of AUTISM CREATES® (Figure 1) My Life Learning Center, (www.mylifelearningcenter.org) founded in 2016 by Dr. Somnath Sengupta, focuses on the training of these adults who are at the L2 and L3 levels (Figure 2). It is clear that any employment opportunities available to Autism Spectrum Disorder (ASD) individuals are only truly accessible for adults at Level 1 on the ASD spectrum, the mildest form of autism. In order to significantly impact the estimated 5.4 million adults in the US with ASD, there is a need to develop a training program that can address the adults at Level 2 and beyond; hence the focus of My Life Learning Center.

The center is located in Ellicott City, Maryland, USA. Over the past six years we have trained our students on sustainable life skills and job skills. They

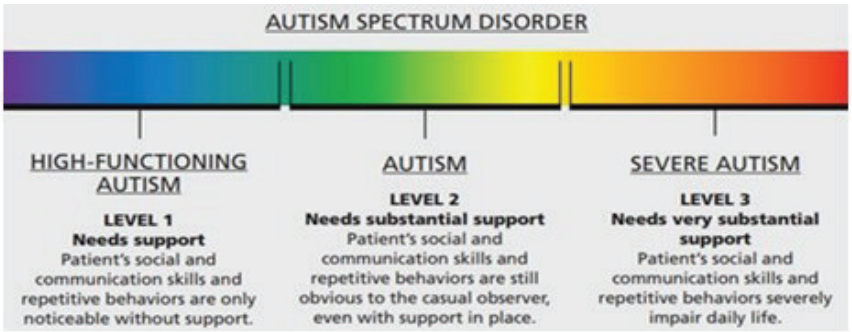

Figure 1. My Life Learning Center focuses on developing skills for Level 2 and Level 3 adults with autism.

include STEM (science, technology, engineering, math) skills, assembly skills, laboratory skills, art, and screen printing. The objective of this training is to offer a multitude of avenues of introducing these adults to a variety of skill development paths to (a) understand their likes and dislikes and (b) develop on their likes while making them familiar with the skills that they may not have thought of. We focus on developing comprehension skills through a variety of ways while enhancing their fine and gross motor skills. The services are habilitative in nature, meaning that they should be focused on keeping, learning or improving skills, and functioning for daily living. We provide the participant with opportunities, via meaningful activities, for the participant to acquire, develop, and maintain skills to support functioning independently on a daily basis and integrating into the community. In addition to instruction from qualified instructors, we also encourage peer-to-peer learning amongst our students (Figure 3).

Figure 1. Peer-to-peer learning is encouraged at My Life Learning Center

The success of our training programs has resulted in three microbusinesses that are showcased at www.everylifeworks.com. The students earn from the sale of the art, screen printing of apparels, and assembly of small electronic products. The STEM training is focused for employment in other high technology businesses. The

training program has received multiple awards from the community and from the Washington DC/Maryland/VA press association.

How do we measure success? - We measure success qualitatively and quantitatively. The quantitative measurements of the time to completion of a task are perhaps the easier measures of progress. The higher standards of measure of success seem to be the qualitive ones. At My Life Learning Center, we achieve those by talking to the caregivers and the students to learn if they look forward to coming to the center, how their attitudes are after their sessions. These are clear indications of how these students are learning the skills. We also provide the parents with tasks as "homework" to provide continuity of learning.

As part of our commitment for autism training in India, Dr. Sengupta is on the advisory board of Neelakash AIU (Autism Intervention Unit). He advises the founder on training skills for young students with autism. He also supports the National Center for Autism (http://www.autism-india.org/) by procuring their art products for sale in the USA. You are encouraged to visit the My Life Learning Center website and contact Dr. Sengupta for further information if you are interested to collaborate with him.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/features/adults-living-with-autism-spectrum-disorder.html
https://www.marketwatch.com/story/most-college-grads-with-autism-cant-find-jobs-this-group-is-fixing-that-2017-04-10-5881421
https://www.stairwaytostem.org/autism-and-stem-considerations-for-students-thinking-about-careers/

Charaiveti: Keep Walking, Keep Moving

Aloknath De (1978)

Vidyapithertarulatamugdhakoremon: the chanting of yesteryear became vivid in my mind during the recent sojourn at the alma mater, RKMV Purulia. The last visit was to receive the 1978 Madhyamik award and I had a great sense of accomplishment that time. And the recent visit in April, 2022 was to give away the awards to the accomplishers in the annual prize-giving ceremony. Then, it was the enthusiasm and aspiration of a sixteener. And now, it is looking back and taking stock by an about-to-be sexagenarian. Nonetheless, it is the Charaiveti mantra learnt in the school that still keeps us going, keeps us moving. Our transcendental life in Mission has taught us how to 'make the rest of life as best of life'.

In the cradle of the mango trees, a beautiful clay-cladded pedestal gave us the platform to address the youngsters—today's striplings who grow to tomorrow's leaders.During the speech, I recapitulated many of cherished moments. After securing the National Merit Scholarship from Govt of India, I opted for RKMV Purulia as my choice school. It is extremely hard to express how the longing for learning grew at the very first glance of SaradaMandir. But I can profess that, with all the tutelage received then,the glow of learning is still radiant in my mind! In today's fast-changing world where continuous learning is of essence, Vidyapith alumni survive and thrive wellin their lives.

It was heartening to hear the inaugural messages of our beloved Secretary MaharajSwami Shivapradananda. My guest-in-chief address emphasized how collaboration is important and possible amidstall kind of competitions. In fact, coopetition is a skill that many CEOs pay a hefty fee to learn in later part of the life whereas we practiced it so easily during our stay in Vidyapith. I used to review essays in Bengali written by some English-medium students; and they did so for English essays penned by me. I remember how, with limited resources, some of us pooled books and had disjoint study time of a subject. That helped all of us to benefit from a cluster of reference books and we did well in the school and board exams.

Vidyapith has taught us the power of discipline. The cadence of events throughout the day happening in a timely manner seems mundane, but thisserves as the basis of habit formation. The interviews of successful people in different fields have revealed that the discipline indeed is a common attribute in a majority of them. It is the early morning chime to get up and make way towards prayer hall. It is the cleaning of dorms and having the Dham competition results during

the dinner time. It is the after-school bell to have the snacks and head for sports activity. Being in Purulia, we had to endure the water-depleted summer months to cold-blanketed winter months. At the end, we get a disciplined and resilient mind.

As they say, sound mind resides in a sound body. The early morning physical training, in free hand as well as with lathi-and-dumbbells was a health-sustaining ritual. Our 88-acre school campus has many playgrounds. And teams had sports-on-rotation every afternoon —from cricket to hockey, from football to volleyball. In fact, the volleyball has been my favourite one. A few students loved playing indoor sports like table-tennis. The annual sports day had some record-breaking performances and students have been extremely passionate about making their platoon win. It is nostalgic to add that we had our share of win too for Subhas platoon!

I have rich memories of my four years of stay —Vidyapith is not just about study, it is about the holistic development. We took part in a plethora of extra-curricular activities. Our hobby classes ranged from book-binding to lathe machines, from tailoring to gardening et al. I fondly reminisce the debate contest that we have had among class-9 and 10 students. The motion was: "India has not progressed enough in last 30 years post-Independence". I spoke against the motion with examples of our great institutions, white and green revolutions, product-building like HMT watch that I could proudly show to the audience. A memorable experience! In fact, students could freelyparticipate from debate to drama, from elocution to essays in English, Hindi and Bengali, of course.

Additionally, one thing that distinguishes Vidyapith is its strong focus on foundational integrity and character building. Care for nature, respect for seniors, thrust for values have been an integral part of our upbringings. I have had high fever two days prior to my board examination and the care that I received could not have been any better elsewhere! It is superfluous to add that the influence of Vidyapith trinity of our time, the-then Secretary Swami Pramathananda's vision, the headmaster Swami Amarananda's knowledge and the chief warden Swami Putananda's administration, has been enormous in our lives. Indian Culture was a unique compulsory subject. The Headmaster Maharaj had mastery over multiple languages. Once I was writing an essay about the river Ganges. I showed him the draft and he helped me make it better; his knowledge has been profound. I would say that it is the best piece in Bengali that I have written till date.

Though history chapters have given us the broader perspective of India, my on-ground interaction with Indian people was more-or-less limited to Bengalis thus far. Vidyapith gave us friends from Orissa, Bihar and also seven sister states of theNorth-Eeast. We used to have a great time during the weekly programme where we could show our performances in regional attires or sing a song in respective mother tongues. Post graduation from school, our friends have spread

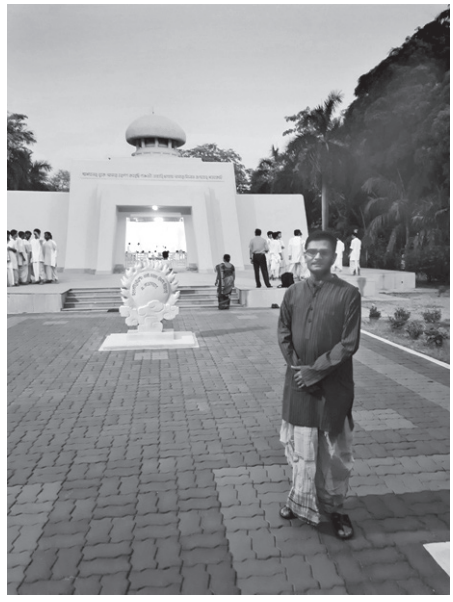

out to vast expanse of India and even beyond India. It will be hard for us to find out a profession which none of our batch-mates has embraced. Here are a few professions where our friends have made an indelible mark: from banking CEO to electronics CTO, from film actor to product entrepreneur, from school headmaster to nuclear scientist, from medical doctor to high-court judge.

Let me conclude with a conundrum that would be to surmise who we would have become or what we would have achieved if we were to subtract our Vidyapith life from our traversed life. The vote of thanks for the 2022 prize-giving ceremony was given by Shakti da who was our senior when I studied class-11 and 12 at RKM Residential College, Narendrapur. He ruminated about our hymn singing and my reading out Swami Vivekananda's teachings during the evening prayers. India has established Swamiji's birthday as National Youth Day and his crisp messages, undoubtedly, are inspirational yet practical. As I wrap up this article, let me recollect five of Swamiji's quotes:

- All power is within you. You can do anything and everything.
- The highest manifestation of strength is to keep ourselves calm and be on our own feet.
- If I love myself despite my infinite faults, how can I hate anyone at the glimpse of a few faults.
- In a conflict between the heart and the brain, follow your heart.
- Take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide.

The author is a 1978 Alumnus. Dr. De has been Corporate Vice-President of Samsung Electronics, Korea and Chief Technology Officer, Samsung India.

Honour-bound with Vidyapith

Debasis Ray (1979)

It was 1992. After five years as a journalist, I had recently transited to the world of business and industry. I had joined a company as a communications manager. To toughen me up, the company placed me at a large factory of about 2000 employees as a Personnel Manager. One of the first assignments was to refurbish the factory canteen's kitchen rather urgently.

So, there I was interviewing a recommended vendor. At the fag end of the conversation, which showed that the firm was capable, the owner tells me: *"Jodi kichhu dite-tite hoi, debo aapnaake (We are ready to pay you up)"*. I went dumb for a couple of seconds. Never before had one faced such a situation; neither has one ever after. When I gathered myself, my response, as you would expect, was to ask the individual to leave. We kept the kitchen as it is for several months, before we found another agency.

Later that day when I played back that incident, I recalled a summer morning in 1979. We had come to Vidyapith to collect our Madhyamik Pariksha marksheets. Kalipada Maharaj (the Late Swami Putananda) was addressing us.

"Mone raakhbi, pithe chhap diye dilaam (We have pinned a Badge on you)," he told us. Indeed, the six years, I spent at Vidyapith from 1973, comprised, at the hands of the revered monks and revered teachers, iteration of and coaching in the values that one had acquired in one's family, through, in Swamiji's words, 'man-making education'.

It is over 40 years now that I left Vidyapith for the last time. But every day is living yet another twenty-four hours, trying to honour that Badge, invisible to the eye but felt in the heart.

How does one honour the Vidyapith Badge? I have interpreted it in my life as a set of two practices. My batchmates too surely have in various other ways in their respective contexts.

To me, the first is to be leading edge at one's work and conduct. The result of this practice is that one is entrusted with larger responsibilities, and one becomes worthy of emulation. The second is deep and genuine concern for the people one leads (colleagues), the people one serves (those whose custom we receive), and the people one lives among (the community and the country).

I had studied in residential schools since Class III. Like the earlier ones, Vidyapith disciplined me to be deadline-oriented, pay the minutest attention to details, and always strive for perfection. As a journalist and then as a communicator for large and internationally renowned companies, more so now in the midst of split-second social media, I have and live in a zero-mistake world. It is Vidyapith's

training which has stood me in good stead.

I recall Snehamoy Maharaj taught us the life of Jesus, the Christ, at the Indian Culture class. Then he gave us a test. We wrote exactly what he told us, but I scored a zero. When I expressed my angst, he said it was 'Jesus, the Christ' and not, as I had written, 'Jesus Christ'. That day I hated it, but today, after four decades of being a professional, I realise that perfection in execution is a critical differentiator.

As leaders in our various walks of life we must have the concern to inculcate others too with this pursuit of excellence. I at least try to do it. One is disliked at the beginning and then admired when associates understand its import in their career. In one team, I had recruited this youngster, for her potential. A couple of months down the line, she proved she was bright but also required to be more focused on minutiae. It took several months to hone her competencies. Eventually she moved on. A year or more after that, one morning I received a message from her. She had wished me. It was Teachers' Day.

As the expanse of one's job grows, responsibilities increase. In my job, for about two decades now, my responsibility, along with some other functional leaders, is to protect and enhance an organisation's reputation.

A few years back, in the organisation I was then in, some units of a product malperformed. We were acting on it. But I thought our reputation demanded that we did so with greater alacrity, and made that submission to our chairperson, explaining lest what could be at stake. In a short time span, all the necessary steps fell in place. My understanding of Vidyapith's accent is that one must stand up for what is right.

As a community, society, and country, we are often exasperated by the experiences meted out to us. My sense is that our underlying angst is because of the absence of morality, in every such situation, among people we interact with or witness. In the world of business and industry, close to sixty per cent of reputation issues worldwide are due to the conduct and character – the lack of it – of people. It finds expression in their behaviour and work inside their organisations and with stakeholders in the external world. In most cases, they stop short of shuttering the organisation. It is because eventually individuals of character step in, correct the deviations, and steer their ships back to the chosen course to the benefit of all – those who work for them, those whose custom they earn, and the larger civil society which has accorded them with the right to exist.

I count myself blessed that the foundation at Vidyapith continuously keeps me sensitive to the difference, at times hazy, between right and wrong. It will be displaying hubris to claim that one is infallible. But I can confidently say that one is always steered by what is the honourable step to take – honourable in intent, honourable in the means, and honourable in execution.

I was once in a conversation with a few individuals about my work. It led to a

discussion on what have been and are my fundamental beliefs as a communications chief of successive world-renowned organisations. Later, one of them, a friend for a long time, said the others found me rigid.

When it comes to character-defining beliefs, I would rather be rigid than be pliable. That is what Vidyapith and its Insignia – *chhap* – on me would exhort.

Debasis Ray
Batch of 1979
After five years as a journalist with The Telegraph, Kolkata, Debasis Ray became a corporate communications professional. He has worked in and led public relations in reputed international companies. A postgraduate in literature, Debasis enjoys history and poetry. He is at dero.ray@gmail.com

A Musing

Mangsatabam Harekrishna, IAS (1980)

"If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow"

— John Dewey, American Philosopher and Educationist(1859-1952)

As we look around, duly supported by many empirical studies, it is evident that the aspiration of today's generation is changing. While there are still many youths looking forward to steady and time-tested traditional career choices like Medical, Engineering, Law, Management etc., there is almost an equivalent number of youths who want to experiment with new-age career choices like entrepreneurship, start-up, app development, system analysis, fashion, sports etc. They are no longer satisfied with the monotonous 9-5 job especially in the government sector where meritocracy perse does not prevail. There are numerous success stories in both the main media and social media which are fuelling this positive change.

Today's youth are no longer shy to take risk and make themselves count. One is reminded of the famous quote of Albert Einstein, a genius physicist and philosopher and thinker who was critical of the existing education system and wrote "Everybody is a genius. But if you try to judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid". In other words, as each individual is unique, the earlier notion of putting everyone in the same category, comparing and judging is passé and no longer appropriate. In fact, today after having been in the Government service for more than three decades, I sometimes wonder whether knowledge and skill matter because I keep rising in the hierarchy anyway. On a lighter note it may be said that the power-point and excel sheet are what counts and nothing else.

The learning one obtains in school and college is essentially limited and there is a need for continuous knowledge and skill up-gradation. It is also said that IQ (Intelligence Quotient) is what gets you a job but it is EQ (Emotional Quotient/ Emotional intelligence) which makes you successful. This essence has also been captured in the NEP (National Education Policy), 2020 which lays down the concept of "Life-long learning and learning how to learn" as one of its main objectives. Much emphasis has been laid on critical thinking, creativity, problem solving, innovation, life skill etc. There is undoubtedly a paradigm shift in the education and employment sector and reminiscences of yesteryear days will enable better appreciation of the same.

I would urge my friends and colleagues to remember and recollect the days in 1970s, 1980s and early part of 1990s. Teachers, parents and books were our sole

source of information and knowledge. There was no television (it made its foray in Manipur during the 1982 Asian Games) or social media. In fact, landline phones were the only telephones available with BSNL as the sole service provider and to obtain a connection one had to submit an application and wait for a long time. The same was the case for buying a vehicle, both two wheeler and four wheeler. I also remember visiting the office of the Director, Civil Supplies with my father for permit to buy MS rod and cement from the government authorized shops – the days of so called "Permit Raj". I will, however, refrain from passing any value judgement for my intent here is to only highlight the journey that we have traversed.

Today Information and knowledge seekers have been empowered with numerous search engines like Google, Wikipedia et al. We see the changing roles of teachers from the days of Gurukul to today's Internet era. There are the print and electronic media and also the social media which is connecting the world in a 24*x7 mode. (There is undoubtedly a case of information overload with vested interest also pushing in misinformation and personal agenda to influence the gullible.) The product life cycle is getting shorter and shorter. Some vivid examples are the models of mobile phones and vehicles that comes in the market.

With the changing landscape of the material world, the mindset of people is also changing. The youth are no longer keen to follow the profession of their parents, especially in the primary sector like Agriculture and allied sector. They want to innovate and experiment with new career choices which were even unthought of during our school and college days. In the above scenario the relevance of the present day syllabus of school/college are being put to test. This essence has also been rightly captured in the NEP 2020 and now focus is on LOCF (Learning Outcome Curriculum Framework), CBCS (Choice Based Credit System) etc.

The learning that one gets especially in school will now have to focus on value-based education and ability to keep learning continuously. (I remain ever thankful to my alma-mater Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia for the value-based education that I have been blessed with). It is my belief that it's in school where value system is inculcated in an individual and the productivity is enhanced in the HEI (Higher Educational Institutes). The changing landscape of job profile and the knowledge and skill needed for the same is something (in most cases) which requires to be acquired from time to time by adaptation. I will re-enforce this with two famous quotes which needs no explanation.

"Education is not the learning of facts but the training of the mind to think."

-Albert Einstein

"The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn."

-Alvin Toffler, Author.

To sum up, the world is changing and so is our youth. They aspire to be counted in this ever shrinking global village where competition is no longer confined to the locality. In case they are able to identify their core competency and goal, I would urge them to chase them passionately. Those of you, who are yet to make up your mind, heed the advice of parents and teachers, for they are your well-wishers. The sacred mantra for success remains hard work, perseverance and focus with an ability to keep upgrading one's knowledge and skill.

The concept of Governance is also undergoing changes and the most important question that remains today is – are the teachers ready to adapt to their changing roles to stay relevant? As the afore-mentioned quote says if they continue teaching today in the same manner as they taught yesterday, we will be robbing the students of their future. A recent phenomenon that we saw was the emergence of Edutech and On-line learning during the pandemic. Technological push in education is there to stay with concepts like blended learning becoming buzz words. It is evident that the teacher also needs to continue acquiring such new knowledge and skills to deliver and stay relevant. As of today there is also a mismatch between the degree holders that are being churned out and the skill needs of the industry. The teachers do indeed have a great role to play to groom our future pillars for tomorrow.

Pranam to all teachers.

The author is an IAS officer to the Govt. of Manipur.

Those Selfless Shepherds of My Childhood

Debasis Chatterjee (1980, Present Teacher]

'Vidyapith' is an emotion that the alumni cherish all through their lives. I have been associated with Vidyapith as a teacher for the last thirty-two years and will remain indebted to it for all the love and honour I have got. Yet, this Vidyapith does not evoke the same emotions as the Vidyapith of my childhood. Even today 'when to the sessions of sweet silent thought / I summon up remembrance of things past', those glorious days flash upon the mind's eye 'apparelled in celestial light'. And memories come unbidden of our selfless shepherds— the magnificent mentors— who shaped and shielded our plastic minds in those crucial formative years. They are the dedicated monks, teachers, wardens and worker dadas whose unstinted love and care nourished and nurtured us. They were our twenty-four into seven friends, philosophers and guides. They would be with us all the time right from the rising bell till we fell asleep at night. They lived with us in our dhams, played with us on the playgrounds, escorted us during excursions, and nursed us when we were sick. They consoled and comforted, indulged and inspired us, and did everything possible to bring out the best in us. In the forefront were, of course, the all-renouncing monastic members under whose watchful eyes we grew up. As our helmsmen, we had revered monks of the stature of Swami Pramathanandaji (Dhiren Maharaj), Swami Putanandaji (Kalipada Maharaj), Swami Prabhanandaji and Swami Amaranandaji. They were all sannyasins of a very high order and later came to be counted among the stalwarts of the Ramakrishna-Vivekananda Movement. Among them, Kalipada Maharaj, our chief warden, was closest to us. He embodied love. He knew each student by name, and looked after us with the warm affection of a fond mother.

As for our teachers, they all had exemplary dedication and excellent command over their subjects. Teaching was more a vocation than a profession to them. With their profound knowledge and high idealism, they not only enlightened us about the topics they taught but also ingrained in us the correct values, habits and attitudes. As one looks back, some memories come pell-mell to the fore. Sushil Ghoshda rigorously enforcing discipline with his inexorable whistle during morning drill, playtime and school assembly remains an abiding memory. Sushil Royda was equally dedicated. He would happily sacrifice his leisure hours to acquaint us with the charms of the English language. With untiring zeal he would glean gems of expressions from various sources just to enrich our vocabulary! It was purely a labour of love. Perumalda, too, did the same. He spared no pains

to strengthen our foundation in mathematics. A stickler for discipline, he was a man of stern rectitude. He taught us so much more beyond mathematics by his integrity, punctuality and devotion to duty. Dilip da, our Bengali teacher, was a genius. A gifted poet-actor-orator, he could easily transport us 'on the viewless wings of poesy' far beyond the prescribed texts to some exotic realm and draw out layers of meanings embedded in a text. Phanida was a perfect foil to Dilipda. He could breathe life into the bland lessons of grammar, and make even the most opaque rules as clear as crystal. Another virtuoso performer in the classroom was Kalidasda, our teacher of Life Sciences. His breezy English, fanciful hyperboles and colourful coinages would always add some extra zing to the lessons.

There were other stalwarts too. Durgashankarda, the formidable Controller of Examinations, concealed an affectionate heart beneath his forbidding exterior. Debenda and Harishankarda were both wizards of Maths. Asit Janada and Mihirda with their sincere, no-nonsense approach could be role models for teachers of any age. Debkumarda,with his erudition, humour and inexhaustible fund of stories could keep us engrossed in his class.

There were other greats like Shibsankarda, Amiyada, Rakharamda, Subhasda, Sanatda, Durgasankar Bhattacharyada, Dayakarda, Indrakantda, Panchuda, Sabyasachida, and Tulsida …the list seems endless. I wish I could write about them all at some length, but constraints of space forbid me to wax lyrical. As preceptors, they were simply non-pareil. The high benchmark of excellence that they set is almost impossible to emulate now.

The same could be said of the humble worker dadas who served us with the utmost love and care. At Shivananda Sadan Khanduda was our virtual guardian. He helped us wear our dhoti, mended our torn clothes, and stitched buttons on our shirts. When we fell ill Mahadevda, Abanida and others would take our charge at the hospital and nursed us with the same care. Mahadevda, in particular, was very soft-hearted, he would coax us to eat our food, make our bed and give us medicines at the proper time like a parent.

All our peon dadas at school were equally dedicated— Satyada, Haladharda, Habulalda, Prafullada, Judhisthirda, Rasarajda, Ganeshda, Arunda, Chepuda, Aghoreda, Dharanida, Kestoda, just to name a few. They served us with exemplary devotion and love.

Our indebtedness to all these selfless souls knows no bounds.It is thanks to their supreme sacrifice, utmost dedication and kind ministrations that Vidyapith turned into such a charming idyll for us.

The author is a Teacher of English at Vidyapith

Vidyapith: Classroom Memories

Arupratan Daripa (1981)

I had just finished an online call session with a student working on a dissertation on the economics of social polarization when a notification arrived on the phone – my Vidyapith classmate and good friend Sanjay (Mukherjee) had sent a message asking if I would write something for the alumni magazine. At the start of a busy semester, with a variety of research and teaching deadlines approaching, I had little inclination to agree at first. But then, as I worked on other things, my thoughts on incentive structures in a particular economic problem I have been working on were syncopated with flashbacks of the part of my life spent in Vidyapith, lasting until my father (Dr Sachindranath Daripa, who was the resident physician in Vidyapith over the period 1975-1998) passed away - well after I had finished school. Flashes of faces, spaces and vistas past, memories of disjointed events, some half-forgotten, forming mental images of laughter, joy, sorrow struck me. I had promised my friend that I would think about an article, but distilling myriads of experiences seemed daunting. As I had just finished talking to a student, my thoughts then turned to a time when I sat on the other side of the table. Among a trove of fragments, two images from my student days in Vidyapith stood out in more complete shape, and reflecting back I realize why these have stayed with me.

I thought I would share these with you today. Mental images from classrooms in the distant past, what they signified then and how I look back on those formative influences now. These are personal musings, an extension of diffuse memories on paper, yet I write in the hope they resonate with you in some small way, locating common ground.

The first of these comes from the Bangla classes taught by Phani-da (Sri Phanibhushan Khatua). As I came to realize later, Phani-da was not really a typical humanities teacher. Seated at the table, he fixed his intense gaze at a page of Bangla text as if critically examining some misbehaving concoction of chemicals in a beaker or a science experiment that has not quite measured up. While the comment is tongue-in-cheek, the reference to science is deliberate. Uniquely among teachers of language and literature, his approach to text was a forensic one. He would take each sentence, fixate on each significant word, and try to determine its worth from every possible angle: why the author wrote this sentence or that word, what else they might have written, what exactly this specific word connotes. This approach might not suit every type of text, but for the relatively simple and often insignificant pieces of work assigned for the school syllabus, this worked wonders. That the printed word, even when part of an uninspiring piece that would, moreover, be examined in a dreary manner later (who said what, whom they said it to, in what context they said it were standard questions that could be answered after

a single reading and without any reflection at all), can become something more than itself, parts being greater than the whole, was a striking idea. In this context it is worth mentioning a contrasting, but equally exhilarating experience that came later as part of Higher Secondary studies in Narendrapur. In the very first class, our English teacher, Dr. Swapan Chakraborty, the renowned Jadavpur University professor of his time, declared his indifference to the actual textbook. You read the textbook, he said, they contain trivial pieces, I will talk about other things. He then proceeded to take the basic idea from an assigned piece, and discussed relevant history, underlying philosophy as well as loosely related ideas from the wider literature. His dazzling breadth of knowledge and incisive arguments – often decimating claims made in the assigned text (Don't write this in the exam, he would caution us with a smile) - made an indelible impression on my young mind. Looking back, I inculcated much from both individuals, who, in their own ways, went beyond the mundane texts assigned in the syllabus and opened up glorious, inviting, exciting, unexpected vistas.

The second set of memories is of the Indian Culture classes of Swami Amaranandaji Maharaj, our beloved "Headmaster Maharaj." This was not a part of the official syllabus, which set him free to explore diverse and often complex themes far beyond the ordinary school material. One of these was a discussion of the Upanishads, focusing on the Ishopanishad in particular. Looking back, I marvel at the erudition that allowed him to have a deep discussion while keeping his young audience fully engaged. These discursive, unhurried lessons have stayed with me, forming a basis to further explore the fascinating world of the Upanishads, the ideas and research forming the historical consensus on their origin and aspects of the later age of the Mahabharata. I recall running into him one day in the school corridors and asking him about the timeline of the writing of the Ramayana and the Mahabharata. I remember with respect and fondness his long patient answer to educate a curious young mind, clarifying the right way to pose the historical question and the most plausible answer arising from extant research. In the context of the current fervour of nationalistic revisionism, his clear-sighted wisdom burns all the brighter to me.

I can recall clearly his fascinating classroom discussion on the trio of adversities – adhi-bhoutik, adhi-daibik and adhyatmik – that are supposed to be countered by the thrice repeated invocation of "Shanti" in the opening shanti-mantras of some Upanishads. I treasure his lengthy discourse on the first shloka of the Ishopanishad – listening fascinated as he weaved and picked apart the intricacies of the possible interpretations of the phrase "tena tyaktena bhunjitha." That discussion has stayed with me through the years. Indeed, beyond the proximate objective, it opened for me a door to another world – one of not simply taking Upanishads as a received body of frozen thought – but to question the interpretations, to try and forge new ways of understanding the ancient wisdom we trace our intellectual lineage

to. The discussion around shloka 15, beginning with "Hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham" seems particularly apt here, as he was for us the Pushana who would remove the dazzling façade so that we may behold the truth at last.

That clarity permeated another related topic, one of perhaps greater immediate resonance. Over several classes, Amaranandaji Maharaj discussed the origins and ideas of world religions. These included well-known ones such as Islam or Judaism, and also relatively obscure ones such as Zoroastrianism. I can remember the classroom in the front part of Sarada Mandir. This was the last period, a low afternoon sun streaming through the verandah and into the classroom, casting a multitude of shadows across the room, Maharaj seated at the table facing us, telling us about Ahura Mazda and Ahirman. We had a book, "Jogoter Dharmaguru" (I still have my copy), which explored such questions in a relatively dry manner. But in the hands of our teacher they became a glimpse into the universal quest for knowledge of the absolute that has engendered a multitude of living traditions which are but different ways of answering the same underlying questions. Over the years I had internalized the teachings of Sri Ramakrishna and Ma Sarada on the unity of all religions without conscious thought, but these classes made the implicit values of tolerance, humanism and liberalism of their teachings into a concrete reality, one that has come to be intellectually instinctive.

In the final reckoning, this is probably the greatest gift I have been bestowed over the years of formative association with Ramakrishna Mission institutions and the monks within. Asked for a religion, my standard answer is none, since the only ideal for me is the path shown by Sri Ramakrishna and Ma Sarada; that of universal values, of attempting to hold all in equal gaze, without discrimination, irrespective of creed or station in life. The history of tolerance in the west is a tortuous one, moving through centuries of darkness. The life and teachings of Sri Ramakrishna and Ma Sarada stand in contrast in that tolerance and liberalism for them were lived experiences, coming from within, not as a result of tumultous social upheaval. The quiet, everyday manner in which Ma Sarada would question why anyone would plan to hurt the English colonisers since they were also her children, or treat Amjad and Sarat Maharaj equally, or give unfettered access to fallen women rejected by society, have been a beacon for me. In these days when society is riven by divisions, the message of Sri Ramakrishna and Ma Sarada are all the more important, and I can only hope new generations of Vidyapith students carry the light to illuminate the world.

[I am part of the Madhyamik batch of 1981 from Vidyapith, later finishing the plus two level from the College in Narendrapur. Later I did a PhD in Economics. Currently I am an academic economist at Birkbeck University of London, and spend far more time than I should at the galleries and museums in London, so not entirely sure which of the two should be flagged as extra-curricular.]

Income-Tax — Uri Baba

Sanjay Mukherjee (1981)

Yes, that is the expression comes to the mind of most of the unsuspecting people when any email/ SMS is received from the Income tax Department. *Why me? I have not done anything to evade tax.* This denial then changes to anger. *This blood thirsty Department is only after simple law-abiding people like me. They cannot touch the hair of the big shots. This must be a ploy to extract some bribe out of me. I won't pay anything, come what may.* Then comes the dismay. *Why should I pay tax? Is this Government doing anything for me? Would it take care of me in my need? My hard-earned money will go for charity and unscrupulous political leaders will get a cut out of it.*

My article is not for redressing any of the above grievances, though the fundamental reasons of collection of tax out of the earnings of the citizenry has not changed much from the time of Mahajanapadas in India or the time of ancient civilisations in Egypt, Greece, Rome, China etc. Collection of tax is a sovereign function of a nation.

Tax is collected to meet the expenses of governance. This expenditure mostly includes welfare and security of the citizenry. In India, the concept of universal taxation is found in the Indirect taxation like GST, Customs Duty etc., where irrespective of income level, every citizen pays tax indirectly to the Government through the seller of any goods or through any service provider; whereas Income tax is a direct taxation, where the individual himself pays his due taxes to the Government directly. In India, Income tax is charged to those people whose net earning is more than a specified limit in a financial year. Certain sources of income like agriculture, earning out of selling agricultural land, compensation received for compulsory acquisition of land, gift received from relatives etc., are, however, exempt from taxation in India irrespective of the size of the income.

Salary Income and burden on the employee:

When I mention of income above a certain limit, it is the net income of an individual after reduction of all relatable expenses from his gross receipts. However, for salary income, except for a standard deduction of Rs 50,000/-, the entire salary income is taxed as income and no other expenditure is allowed to be reduced from it directly. In normal course, the Accounts Officer or the Drawing and Disbursing Officer responsible for the payment of salary is entrusted by the statute to deduct tax from salary at the time of payment itself and he is the person responsible to deposit the deducted tax to the Government exchequer on behalf of the salary earner. This concept is called Tax Deduction at Source (In most of the countries other than India it is known as withholding of taxes). However, it is the duty of the salary earner to make a statement before the Accounts Officer regarding his income other than the salary, as well as the investments/ expenses/ donations/

interest payments made by him during the year for which certain deductions are allowed.

Excess tax deduction at source and refunds of tax:

Many a time it is seen that because of negligence on part of the salary earner, such statements are not submitted with the Accounts Officer within time, causing excessive deduction of tax at source than the taxes that was due for deduction. In such cases, the salary earner is eligible to get a refund of such excess deduction from the Government after making a formal submission of Return of Income. It is worth while to mention that a new scheme of taxation allows a reduced rate for charge of tax, but no deduction is allowed against the gross salary in that case.

Delay in getting refunds:

I may mention that the two principal reasons of delay in getting a refund are i) mistake by the Accounts Officers to mention correct PAN in the Quarterly statements of tax deducted by him and ii) wrong mention of bank account details in Income tax profile/ Income tax Return of the individual taxpayer.

I would like to advise every salary earner to take these matters seriously by making their own calculations at any time during the month of September and advise the Accounts Officer to deduct taxes uniformly accordingly to avoid unnecessary excess deductions. You may also double check the Bank details in Income tax profile as well as during filing of Income tax Return.

I think it would be proper if I discuss certain issues now, which are very common and faced by a typical middleclass salary earner.

- **I have more than one house, but there are no tenants. What is the impact of tax?**

As per Income Tax Act, all residential properties have a potential for earning rental income and the sum that might reasonably be expected to be earned as rent from a property is to be declared as income. However, all individuals are allowed to enjoy one property as his residence, for which no income should be declared. So, if you have two houses, one is exempt but rental income is to be disclosed for the other. If there are no tenants, a notional rent which is expected as per market rate is to be declared. Against such notional income two deductions are allowed. Firstly, the municipal tax paid against such property and then a standard deduction of 30% of the annual gross notional rent. If a loan is taken for construction of the houses/ purchase of flats, an aggregate sum of maximum of two lakhs of interest payments for the loans, can be reduced for all properties taken together. Let me also clarify that if one property is shown as owned by your spouse and if the spouse does not have any independent source of income and it is funded by you, then both the properties shall be treated as your property.

- **What about interest on FDRs? Banks are already deducting tax at source. Am I to declare it again? Am I eligible to file 15G form?**

All interests earned on the FDs are your income and are to be included with

your salary to make the total income. The interests earned in savings account too are to be added. Interests earned on the FDs that you have purchased in the name of your housewife spouse, or your minor children are also to be included in your total income. Banks do not deduct Tax at Source if annual interest earning is less than Rs 10,000/-. But even if no deduction has taken place at source, you need to declare the interest earning in your total income. If your gross total income from all sources is more than the basic exemption limit of Rs 2.5 lakhs per annum, you are not eligible to submit 15G Form with the bank. For interest earned on savings bank accounts, up to a maximum limit of Rs 10,000/- can be reduced as deduction.

- **I have purchased some shares and paid for some SIP for Mutual fund units this year. Is it taxable?**

Nothing is taxable at the time of investment. Only when they are sold the difference between the sale price and purchase price is your gain, which is to be declared as income for taxation.

If your holding is for less than 1 year, the rate is a special rate of 15% (Short Term Capital Gain); if the holding is for more than one year then the gain is called Long Term Capital Gain and the special rate of taxation is 10%. There is no tax if the annual LTCG on sale of shares is less than Rs 1 lakh.

However, any profit on trading of share derivatives (Futures/ Options) or commodity futures is taxable at regular rates.

- **I had an ancestral house, which I have sold this year. What is the tax impact?**

Irrespective of the ownership through inheritance or acquisition, if the house is in your name and sold by you, income arises in your hand. The entire receipt/ sale proceeds are not your income. The difference between the sale price and the cost price is the gain which is taxed.

Now, the statute allows a level playing field for the cost of the property sold. We all know that due to inflation, the value of money gets reduced. Accordingly, value for Rs1 lakh in 1983 is not the same as that in the year 2022. Thus, there is a concept of Cost Inflation Index in Income tax procedure. Every year the Department publishes a table giving equivalence of past value with present value. Now if a property was purchased/ built before 2001 either by you or by your forefathers, firstly a valuation of the property is to be done as of 2001. Thereafter, that value is to be set in the CII table to get the value of the property as in the year of sale. The cost price of properties acquired after 2001 too can be extrapolated to its present value using the same table. That calculated Present value is considered as your **basic Cost Price.** Now any further cost of renovation/ improvement can be added to that value to arrive at the cost of the property in the year of sell.

Now for the sell price, irrespective of whatever you are getting in hand from the buyer or whatever is written as value of property in the deed of convenience, the **Sale Price** for calculation of Income tax is to be taken as the valuation made by the competent authority to charge Stamp Duty during registration of the sale.

Now difference of the value for the stamp duty (Sale consideration) and the calculated present value of cost of the property (Cost consideration) becomes

your capital gain. You are however allowed to deduct any brokerage paid for the transaction from such gain.

A simple rate of 20% of such difference will be the Capital gain tax. You can avoid payment of capital gains tax if the entire receipt is again invested in a residential property/ flat. You are allowed to defer payment of tax if you invest the receipt (up to Rs 50 lakhs) in specified Capital Gains bond/ deposit with banks and purchase/ build a house/ flat within three years and utilize such deposit. However, if the new property is not built/ purchased within 3 years, the amount invested will be taxed @20%.

If the transaction value as per deed of conveyance exceeds Rs 50 Lakhs, the buyer is responsible to deduct tax at source @1% of the aggregate agreed price. **In case of NRIs who wish to sell a property in India, the procedure is same, except for the TDS part. Here the buyer needs to deduct a tax at source @20% of the calculated gain (not on the entire aggregate value). However, for NRI transactions the buyer must obtain a Tax Deduction Account Number separately.**

In case of purchase of a property, you must be aware that if the agreed sale price and the value determined by the stamp duty assessor differs and the latter is more than Rs 50,000/- than the former, the buyer must pay a tax on such differential as if a notional gift income has arisen.

- **I have received a sum from my NRI brother who has remitted it to my account. Am I to pay tax?**

Gift of any amount received from relatives are not taxable income. However, if you make an FDR in your name with the receipt and some interest is earned then such interest is taxable in your hand.

- **What is the difference between an NRE and an NRO account?**

An NRE account is a bank account opened in India in the name of an NRI, to park his foreign earnings that is just for remittances; whereas, an NRO account is a bank account opened in India in the name of an NRI, to manage the income earned by him in India. These incomes include rent, dividend, pension, interest, etc.

I sincerely hope that the above may clarify certain doubtful issues in your mind regarding Income taxation. Because of introduction of AI in tax administration and due to fluid data sharing by many agencies, now all data regarding your cash deposits in bank accounts, share transactions, property dealings, foreign visits, credit card expenses, interest earnings etc are all recorded and even if you forget anything on these transactions, the automated messaging services through SMS/ Emails will continue to remind you of your income/ transactions. So, you need not worry. Pay your taxes properly and in time so that you can hold your head high and contribute to nation building.

Passed out in 1981 from Vidyapith and is presently working as a Commissioner of Income tax.

Vignettes

Subrata Sar (1981)

(A tribute to T. S. Eliot on the centennial of the publication of his celebrated poem, 'The Waste Land'*.)*

"Whan that Aprille with his shoures soote,
The droghte of March hath perced to the roote,"

—Geoffrey Chaucer,
General Prologue to The Canterbury Tales.

April is the cruellest month,
The month of birth and conception,
Of sabbath and benediction,
Of virtues lost and vices abundant,
While the Queen of Carnage reigns resplendent,
Encircled by her frivolous peers,
Where vultures vie for vengeful ire,
Enjoying the demonic dance of knaves and sycophants.

Here, said she, is your card,
Ladies and gentleman,
Ladies and gentleman,
Listen to the voice of the Bard—
Open your drawers and unlock your cupboard,
Shuffle through your memories—
Your laughter and your worries—
Choose gently but choose you must,
Beseech, behold, caress, and discard.

I think we are in rat's alley
Where life trundles on willy-nilly
Debating who is your foe and who's ally
Kallolini Tilottoma,
Where life sizzles in an infinite diorama
Amid the facile and the fervent
Amid the vacuous and the effervescent

Chance erected, chance directed
Unreal City,
My very own unreal city
Freezes in a dilemma of chaos and gaiety.

The time is now propitious,
Who would be the beacon to guide us—
The prophet, the pervert, or the plunderer—
A pompous professor of anthropomorphic art
Regales the flappers with his exploits of desire—
Where shadows betray shadows,
And the chimeras gloat in epiphanic glee
Doffing their lives in grim ecstacy?

These fragments I have shored against my ruins,
Where longings and lusts, losses and loves intertwine,
The beatific smile on the face of a newborn
Gives light to the desert eyes of a forlorn
And all life exalts in a melange of grief and glory,
Oh perfecto, and purgatory
Moving onto piety, patience, and peace in sublime bliss
Rudra jatte dakshinam mukham
Tena mam pahi nityam:
Sayonara—
Charaiveti! Charaiveti! Charaiveti!

The author is Associate Professor of English at Vidyasagar Collage

The Gaudiya Vaishnavite Exuberance in Manipur – Tangible and Intangible Inheritance

T. Bhabeswar Singh (1982)

Today, Manipuri Sankirtana, a performing art form, is among the fourteen elements inscribed on the Representative List of the UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity announced at the eighth session of the UNESCO Intergovernmental Committee in Baku, Azerbaijan, in December 2013. Considering the fact that Nat Sankirtana, which exhibits unparalleled religious devotion involving ritual singing, drumming and dancing performed in temples and religious spaces, has been acting as a cohesive force within the Manipuri Vaishnav community by bringing people together through festivals and life cycle events.

The north-eastern Indian state of Manipur is a blue lotus with nine blue hills as its petals and the valley as its floral core. Garib Niwas (born Pamheiba, 1690–1751) was a Meitei king of Manipur, ruling from 1709 until his death. He became a devout Vaishnav under the influence of the Sri Chaityanite Gaudiya Vaishnava Dharma preacher Santidas Goswami, who came to Manipur from Sylhet and introduced Hinduism as the state religion of his kingdom (1717). He changed the name of the kingdom to the Sanskrit *Manipur* (1724) and his royal name from his birth name Pamheiba to Garib Niwas. He introduced the Bengali script as the official script for the Manipuri language in place of the Meitei Mayek script. For the next two hundred and fifty years or more the rich Manipuri literature thrived on the Bengali script, till in the seventies of the last century, when the Meitei Mayek was reintroduced as the script of the Manipuri language.

From then on Manipuri Vaishnavism, which is a regional variant of Gaudiya Vaishnavism with a culture-forming role in the north-eastern Indian state of

Manipur, became the chief religion. Most Vaishnavites of Manipur belong to Narottama Dasa Thakura's lineage (parampara).

Garib Niwas maharaja's grandson Rajarshi (Raja Rishi) Bhagyachandra (1759-1798), fondly called as Ching Thang Khomba by the hill people, Jaysingh by the British and Ahom rulers and Kartar by the Vaishnavs of his time was the architect of Vaishnavite religion, a deeply religious, great upholder of tradition, culture and arts besides being a brave and skilled warrior. The Shreepat Kheturi Sammelan (Kheturi Utsav) of 1682 Saka conferred Joypatra Khunti and honoured the great Vaishnavite Maharaja of Manipur.

Rasa Leela (one of the eight classical dance forms of India with its forms in Basanta Ras, Kunja Ras, Maha Ras, Nitya Ras and Divya Ras) started in 1779. Shree Shree Govindaji temple was constructed in 1776 at Canchipur Royal Palace with the divine deity of Radha Govinda (Govindaji Nirupon) and similar temples of Radha Govindaji at Vijoy Govinda, Nityananda, Gopinath at Bishnupur and nearby places of the valley becomes the centres for the development of the Ras Leela which is the highest spiritual expression of worshipping Krishna in a dance form.

Nat Sankirtana which encompasses an array of arts performed to mark religious occasions and various stages of life of Vaishnavs of Manipur valley and nearby places in Assam, Tripura, Bangladesh and Myanmar had royal patronage. It is just not a mere musical performance but a way of worship and prayer. In every gesture and move the performer narrates the life and deeds of Lord Krishna through ritual singing, drumming and dancing. The pre-Hindu ethnic cultural elements of Thang Ta (Manipuri martial arts), Sarit Sara (unarmed martial arts form), Mukna Kangjei (Traditional wrestling with Foot Polo of Manipur) and war exercises are intricately blended and integrated in the Nat Sankirtana and the Ras Leela of Manipur .

The new direction to the Vaishnavite upsurge and its enrichment included the introduction of Waree-Leeba (story-telling), a traditional narrative art form that culminated from the traditional Khulang eeshei (folk songs of the fields); Moirang Parvas (stories of Loktak), and Khunung Eeshei (village folk songs). This narrative form ensured that the message of the scriptures reached the people to enrich their spiritual knowledge and also provided them with spiritual guidance.

Mention may be made also of Pung Cholom (Mridangam Dance) of Manipuri vaishnavite exuberance, which is the soul of the Sankirtana music and classical Manipuri dance form. The dancers play the pung while they dance at the same time synchronizing the dancing without breaking the rhythm of the music. It synthesizes the traditional martial arts Sarit Sara, Thang Ta, Maibi Jagoi – blending the gracefulness of dance and the athleticism of the warriors.

The traditional institutions and centres (Loishangs and Panas) like "Pala Loishang" of Nat Sankirtana were established for organizational, research and

developmental work. The Traditional centres, also called Loishangs, like Pandit (scholars) Loishang and Maibi (priestess) Loishang are centres for organizational conduct, control, research, and standardization of art, culture and religion. Pana (traditional geographical division) System – Ahallup, Naharup, Yaiskul, Khwai, etc. are the traditional decentralized units for village volunteers and work as a support system during the time of war; besides being centres for cultural troupes, games, arts, dance, music and scholarly activities, they are also the hubs for cultural exuberance with much social support that has kept the arts alive through centuries.

Manipuri rituals and refined social norms and codes needs to be mentioned in any narration of how the rich tradition of Manipur became manifold after the advent of Vaishnavite culture in the 17th century. Even the cultural code of eating different dishes according to the digestibility of the food item needs to be learned and practised. The dress codes both for male and female members for each of the ceremonies of birth, marriage, death and worshipping (going to the temples) are to be seen and cherished. The social codes and norms for the arrangement of sitting during a marriage ceremony dictate that people would sit surrounding the Sankirtan, which would be at the centre; the male party of the groom would be at the left side; the front side would be demarcated for the female party of the groom; the right side for the male party of the bride and the house for the females of the bride. That the host still followed such practices depicts the vibrant discipline of the Sankirtana of the Vaishnavites of Manipur.

Manipur, without mentioning Kangla fort, will be a body without the soul. Kangla is like a mirror through which we can have a glance of the spirit of the Manipuri Civilization, as it depicts the socio-cultural identity of the people of Manipur. Architecture, especially of Kangla and Manipur, was a grand ritual which owed its origin, development and exuberance to religion and religious upsurges. Mention may be made of 'Yumsharol Khutthek' of 'Kanglei-lai-haraouba'. The norms and codes of designing housing and architecture in the traditional Manipuri fashion as in "Yumsharol and Uyanlol", like the Hindu Shilpa-shastra or Vastu-shastra, depict the great living tradition of the people of Manipur.

From 1470, Manipur was on the way to become the easternmost citadel of Vaishnavism. The great Vaishnavite movement swept all over India in the 15th and 19th Centuries with Ramananda, Vallabhacharya, Chaitanya and Sankaradeva preaching Vaishnavism, and Chandidas, Surdas singing songs. As part of India Manipur was naturally swept by this movement, although somewhat later. The Bengal architectural style also reached Manipur. Kyamba Maharaj constructed a Vishnu temple at Bishnupur and the worship of Lord Vishnu paved the way for the rise of Vaishnavism in Manipur. Successive rulers after Kyamba continued the worship of Vishnu as the Royal Deity. Though the worship of Vishnu received royal patronage since the time of Kyamba, the fact remains that it was confined

to the royal family only and no Meitei King was formally initiated into the Vaishnava form of Hinduism till we came across King Charairongba (1697-1709 A.D). It was King Charairongba, the first Meitei King, who was formally initiated into Vaishnavism in April 1704 (5th of Sajibu, Wednesday) by a Brahmin named Krishna Charya Rai alias Rai Vanamali from Sweta Gangapur. The descendants of Rai Vanamali, the guru preceptor of the King, came to be known as the Guru Aribams or the family of the old guru. Cheitharol Kumbaba, the Royal Chronicle records that Ningthem Charairongba and others, who were to be initiated to Vaishnavism observed fast on Wednesdays in the month of Sajibu. It is said that Charairongba Maharaj constructed the temple of Krishna, Guru Aribam Leikai. It is one of the oldest temples in Manipur.

Thus the influence of Vaishnavism in art, dance, music, performing arts, culture, religion and architecture in Manipur is deep-rooted; it was carried far and wide by its princesses who were married to the kings of Coochbehar, Tripura,Nepal, Ahoms, Tais of Myanmar, and tied to the Shans bordering China through matrimonial alliances. Thus the Gaudiya Vaishnavism, also known as Chaitanya Vaishnavism, a Vaishnava Hindu religious movement inspired by Chaitanya Mahaprabhu (1486–1534) originating in medieval Bengal and spreading to the corners of India as part of the Bhakti cult with its theological basis in the Bhagavat Gita and the Bhagavat Purana, as interpreted by the followers of Sri Chaitanyadeva like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jeeva Goswami and Gopal Bhatta Goswami among others, reached the princely state of Manipur, even giving it its present name. The Vaishnavite exuberance in today's Manipur can be felt, experienced and seen in its grandeur in the grand rituals and ceremonies.

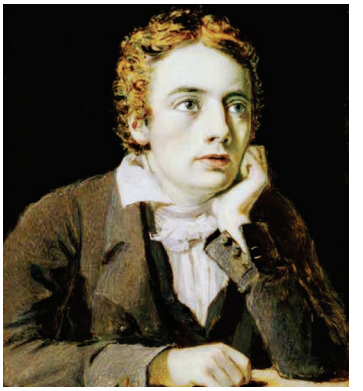

A Tribute to John Keats (1795-1821)

Rajat K S Chowdhury (1982)

As if a sense of urgency
Chased him through his brief sojourn
In such manner, yet in a cool composed way;
The nightingale sang a few melodies unheard
In a most tender, dreamlike voice.
Thence the joy of Beauty was revealed,
Melancholy finds its permanence in Beauty's shrine,
As the drowsy day passes away like a fragile dewdrop,
Sleepless night waits with the thirst of divine melodious truth,
Crimson evening clouds in the horizon sinks with its name writ in water.

IPR in Education

Pinaki Ghosh (1983)

Preface:

A future society that India should aspire to may be called "Society 5.0." The term refers to a new society that represents the next stage after the hunting society (Society 1.0), agricultural society (Society 2.0), industrial society (Society 3.0), and information society (Society 4.0). It is defined as a human-centred society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace (virtual space) and physical space (real space). All people and things will be connected through IoT (Internet of Things) in Society 5.0, enabling us to share various kinds of knowledge and information while creating new values, and giving us the ability to overcome issues and difficulties.

Knowledge conversion will lead to desire society of 5.0. The present knowledge conversion will need sophisticated and barrier free knowledge infrastructure in terms of access to knowledge and its use. The knowledge infrastructure should be based on three pillars i.e. convergence of the knowledge, knowledge management, and protection and commercial use of the knowledge as a property.

Convergence of knowledge is pre-eminent in Internet based society. Today's knowledge may secure from formal or informal sources and from depth and breadth of various subjects. For example, an online custom garment selling company requires understanding of fabric; culture and ethnicity; physiology and body type; climatic condition; personal finance and ambition of individuals; technologies related to manufacturing, Internet of things; and artificial intelligence for error free processes. The future manpower should be trained in this barrier free knowledge domain. And the future universities should create infrastructure towards that.

Inter-disciplinary and trans-disciplinary knowledge management should be the object of future research. Integrated knowledge management system will provide it a solution to the future challenges within the society, economy and business. For example, artificial intelligence (AI) will allow us to obtain information when needed, and technologies such as robotics and autonomous cars will help us overcome issues such as a decreasing birthrate, ageing, population, local depopulation, and the gap between the rich and poor.

Knowledge protection and commercial use of the knowledge as property will be the fuel of the future economy. The value of intellectual property (or information goods) will increase further in the society of 5.0. Through social reform (innovation), Society 5.0 is expected to be a forward-looking society that breaks

down the existing sense of stagnation; a society whose members have mutual respect, transcending the generations, and a society in which every person can lead an active and enjoyable life.

Introduction

In the knowledge based economy, the importance of Intellectual Property (IP) management has increased significantly. Unfortunately in India, professionals involved in a day-to-day working with IP mostly consider IP as a legal instrument, and often overlook the strategic importance of IP management. Presently, IP is being taught as a course in most of the law schools for 2-3 credits where the emphasis is mostly given on the legal aspects of IP. There is not a single institution in India that focuses on IP management. As a result, most of the Indian companies in spite of creating valuable intellectual assets are unable to manage them efficiently. Recently, I came across a news article where I read that the CSIR wants to stop random filing of patents (reference: CSIR wants labs to stop random filing of patents - Times of India) This shows that even premiere labs like CSIR is having difficulties when it comes to managing IP. I believe that there is a need to establish an IP management institute where we can teach our future generations how to manage IP so that it can be positioned strategically as part of the overall business strategy.

Intellectual property value and risk management are the key factors for economic growth and advancement in the high technology sector. These are good for business, benefit the public at large and act as catalysts for technical progress. For example, the value of intangible capital of General Electric is estimated at USD 324 billion. In the Information Technology Sector, IBM and Verizon are estimated to have intangible capital of USD 134 billion and USD 105 billion respectively. This demonstrates the immense value and critical nature of intangible assets for effective participation in the evolving 'knowledge economy' However, in past decades, most of the Indian Companies overlooked the business aspect of the IP and do not have any IP management strategy or Policy. Employees were not exposed to the basic understanding of IP and the importance of IP though there is no dearth in ideas floating in the minds of the employees. The higher management does not have any clear direction for strategic IP management or any mechanisms to leverage and exploit the IP assets for the company. Further, there are no processes, policies and guidelines to manage IP risk and compliance in these organisations. Furthermore, in the present changing business scenario companies are moving to more nonlinear growth initiatives, the overall IP risk exposure is also increasing for the company and the company processes are not adequately framed to manage this risk. Overall, the companies require robust IP management strategy to bring value addition to all its stakeholders and shareholders. All these above factors can ignite the need for starting a new era of IP initiative in our country.

Background:—

The intellectual property rights system involves the rights to achievements which result from a broad range of creative human activities, and it protects creators' rights pertaining to their achievements for a certain period of time. A characteristic of intellectual property is that it is not a physical object, but information with property value. Information can be easily imitated and is not exhausted when used, and a large number of people can use it at the same time. As such, the intellectual property rights system restricts—to the extent required by society and to protect the creators' rights—the freedom of using information which could be freely used otherwise. In order to maintain this system design, the creators of intellectual property as well as its beneficiaries must gain a proper understanding of intellectual property and appropriately use the information property system; otherwise it will result in social disarray.

The center of wealth creation witnessed significant changes over the past few decades from tangible to intangible assets or as rightly coined by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 'knowledge based capital'. As India emerges to be one of the fastest growing economies in the world, the time is ripe to leverage the country's knowledge-based assets to achieve inclusive and sustainable economic growth.

In India:-

The National Intellectual Property Rights (IPR) policy (the policy) released by the Government of India on 12 May 2016 is the first of its kind in India which encapsulates the critical role of Intellectual Property (IP) as a custodian to transform knowledge into intellectual assets. Additionally, the policy also provides for IP's enhanced role as a competition regulator, a marketable financial asset as an economic tool.

The policy has been carried out in light of other government policies and initiatives, such as 'Make in India', 'Digital India', 'Skill India', 'Start-up India' and any other programmes anticipated in the future. The policy acknowledges the growing importance of intellectual assets in the current knowledge economy. Keeping this in mind, the policy has identified three principal stakeholders – public/ private enterprises, educational and research institutes and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)/start-ups to build a multidimensional innovation ecosystem.

Here are some snippets of the **National IPR Policy**:

The national IPR Policy's executive summary, vision and mission states the following:

EXECUTIVE SUMMARY

Creativity and innovation have been a constant in growth and development

of any knowledge economy. There is an abundance of creative and innovative energies flowing in India. India has a TRIPS compliant, robust, equitable and dynamic IPR regime. An all-encompassing IPR Policy will promote a holistic and conducive ecosystem to catalyse the full potential of intellectual property for India's economic growth and socio-cultural development, while protecting public interest. The rationale for the National IPR Policy lies in the need to create awareness about the importance of IPRs as a marketable financial asset and economic tool.

VISION STATEMENT

An India where creativity and innovation are stimulated by Intellectual Property for the benefit of all; an India where intellectual property promotes advancement in science and technology, arts and culture, traditional knowledge and biodiversity resources; an India where knowledge is the main driver of development, and knowledge owned is transformed into knowledge shared.

MISSION STATEMENT

To stimulate a dynamic, vibrant and balanced intellectual property rights system in India to:

- ❑ foster creativity and innovation and thereby, promote entrepreneurship and enhance socio-economic and cultural development, and
- ❑ focus on enhancing access to healthcare, food security and environmental protection, among other sectors of vital social, economic and technological importance.
- ❑ The Policy lays down seven Objectives as:

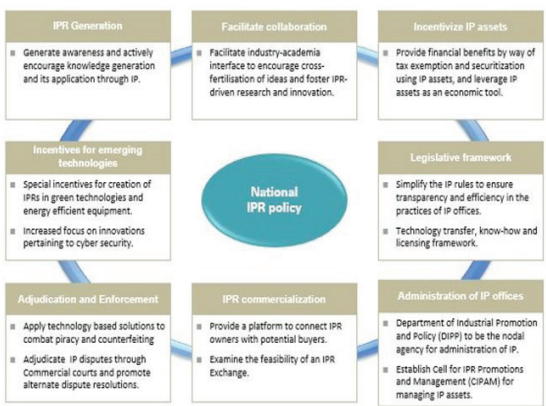

Focus areas of National Intellectual Property Rights Policy

Societal perspective:

A future society that India should aspire to may be called "Society 5.0." The

term refers to a new society that represents the next stage after the hunting society (Society 1.0), agricultural society (Society 2.0), industrial society (Society 3.0), and information society (Society 4.0). It is defined as a human-centred society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace (virtual space) and physical space (real space). All people and things will be connected through IoT (Internet of Things) in Society 5.0, enabling us to share various kinds of knowledge and information while creating new values, and giving us the ability overcome issues and difficulties. Moreover, artificial intelligence (AI) will allow us to obtain information when needed, and technologies such as robotics and autonomous cars will help us overcome issues such as a decreasing birthrate, aging population, local depopulation, and the gap between the rich and poor. Through social reform (innovation), Society 5.0 is expected to create a forward-looking society that breaks down the existing sense of stagnation, a society whose members have mutual respect for each other, transcending the generations, and a society in which each and every person can lead an active and enjoyable life.

In this society, the value of intellectual property (or information goods) is expected to increase further. It will be more necessary than ever to promote the correct understanding of intellectual property, the importance of creating new intellectual property, respect for creators and proper use of the intellectual property system to the entire nation. In other words, the need for education, dissemination nd raising the awareness of intellectual property is growing, more than ever.

Business Perspective:

The centre of gravity of wealth creation has been changing over the past few decades from tangible to intangible assets or, as rightly coined by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 'knowledge based capital.' As India emerges as one of the fastest growing economies in the world and abundance of unprotected knowledge as recognized by the policy, the time is ripe to leverage upon the country's knowledge-based assets to achieve inclusive and sustainable economic growth.

In our view, the National IPR policy has rightly identified the growing role of intellectual property in the knowledge economy, and has walked an extra mile to address the IPR challenges during generation, protection, and commercialisation of IP. To this end, it has addressed the anomalies in the existing framework and has taken significant measures to balance the interests of individuals' rights with the public interest. The policy may be used as a springboard by the stakeholders to take a proactive measure to transform their innovation capabilities. The policy also envisions the usage of intellectual assets as a 'marketable financial asset' and an 'economic tool'.

The knowledge economy has transformed business processes by elevating the role of innovation as the core production process and the main enabler of business success. As a result, the role of the employee also changed. Employees in the knowledge economy are required to do brainwork most of the time to incorporate knowledge into new applications and ~~innovate~~ invent new products, processes, and services. To a great extent the knowledge intensity of business processes and the workforce is brought about by an increased demand in the market for knowledge. The customers of the knowledge economy are knowledge thirsty, creating more demand for knowledge intensive products. Knowledge gets cycled and recycled through the innovation process to make new products, which in turn increase the body of knowledge that gets fed again into the production process.

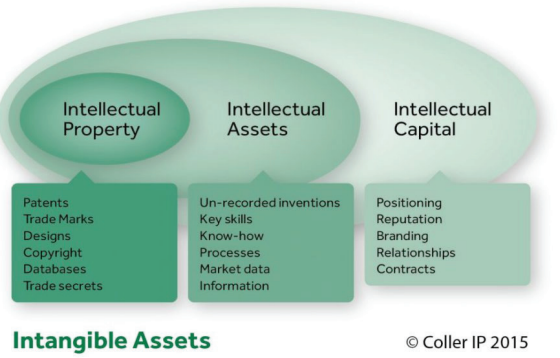

Comprehending Intellectual capital Management (CICM) as a coherent discipline with all this diversity may seem impossible. It would require the expertise of the multi-disciplines involved: business, law, technology, accountancy, industrial psychology, Management and Finance. But bringing all these perspectives under a coherent model is not the main challenge confronting ICM. The challenge is to understand the interplay between them and bring them together in an effective way to enable an organization to realize, manage, and leverage its intellectual capital effectively. The CICM approach integrates the three management approaches—KM (Knowledge Management), IM (Innovation Management), IAM/IPM (Intellectual Asset or Property Management)— while recognizing that each has unique objectives, processes, strategies, and tools. One of the functions of this institute, and perhaps the most important one, is to present the CICM approach as an evolutionary stage of strategic business management for the knowledge economy.

Why the proposal of IP Management?

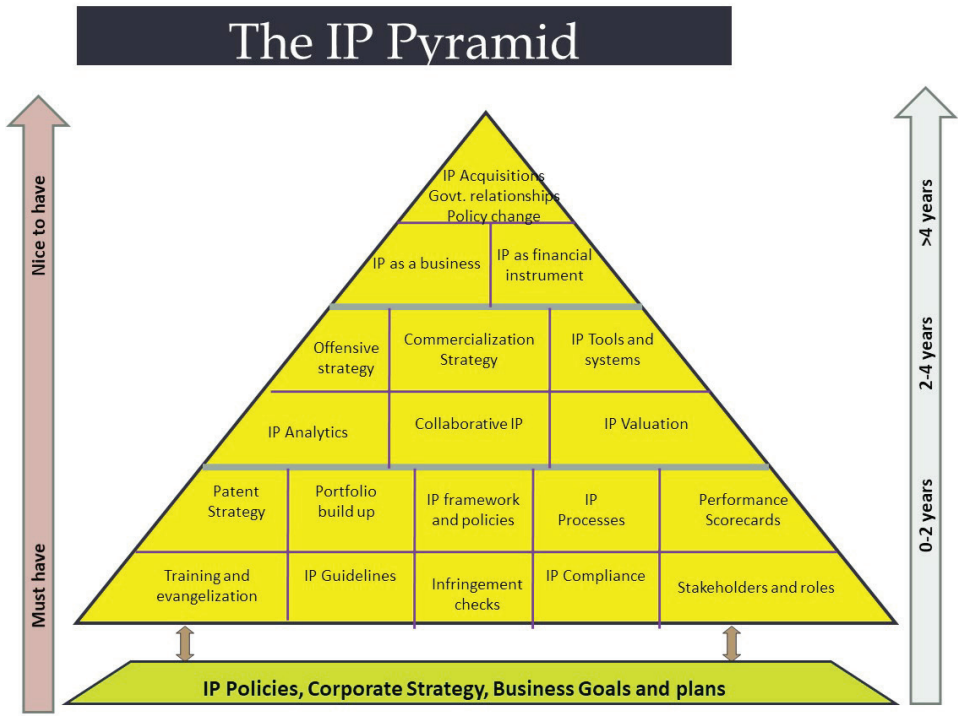

Companies routinely write comprehensive business plans to communicate their commercialization strategy, including detailed sections describing product development, manufacturing, marketing and sales, and financial projections. Naturally, such business plans help clarify the company's objectives, organization, and strategies for future growth and a competitive vision.

The adjacent figure captures the maturity level of IP in any organization which needs constant focus and needs to be embedded into the business plans and roadmaps.

The IP courses should accommodate all these aspects which have primary six pillars:

1. Anthropology
2. Basic Science / Technology
3. Finance
4. Legal
5. Data Science
6. Management

Benefits and Core Objectives

1. **Imparting IP and Innovation Education**: There is a need to uplift the IP knowledge in India and ensure that our IPs are protected and commercialized which is important for the growth of our country. The aim of the Institute is to provide high quality education which prepares students for further study and research in the field of IP and Innovation and for a wide range of career opportunities in industry and commerce. The Institute will impart various long and short term courses in IPR with comprehensive curriculum which aligns to the need of the modern industry. The Institute will not only impart IP education but also offer consultancy services to companies and institutes and other bodies, publish world class journals etc. The expert panel in the Institute will also monitor, review and enhance educational provision to ensure that it remains intellectually demanding and relevant to current needs of industry.
2. **Create Job Opportunities**: The IP education will help to re-skill the people of India and help create job market in India. The increase in the IP education in India will also enable more companies to come to India and invest, especially when they see a stronger IPR regime in India. The Institute will aim at relating fundamental concepts to practical applications, and providing students with the necessary skills to function as responsible professionals. IPR education is extremely crucial for the implementation of Digital India, Smart Cities and other important programmes of GOI. These programmes require knowledge of advanced IP based technologies which require very strong IPR regime and IP protection and commercialization framework. The Institute will aim in skilling people with this knowledge, identifying ideas/innovation, protecting these innovations and enabling commercialization of the IPs for the overall growth of our country.
3. **Commercialization of Innovation and IP** – The Institute will have various departments which will evaluate ideas/assets/innovations and IPRs from Govt. establishments and others and help commercialize the IPs in the most appropriate manner which in turn will generate revenue, growth and commercial and business opportunities for companies and for our country. The commercialization framework will help create an IP trading and brokerage framework and platform in our country. The expert commercialization panel members of the Institute will bring in advanced IP technologies to India on behalf of the Government from around the world through appropriate licensing transactions.
4. **Support to our Judiciary** – The IPR experts and Legal experts who

specialize on IP Laws will provide domain support to our judiciary to speed up IP cases and judgments in our country. The expert panel will also support our Govt. to implement best practices around IPR in our country and harmonize our Laws and Practices with the rest of the world. This will ensure FDI investments in our country.

5. **Enable Start-ups ecosystem** – The Institute will incubate new start-ups which are based on cutting edge IP/technologies. In addition to this, the Institute will support existing start-ups to protect, monetize and commercialize the IP and maximize the utility of the innovation and IPs. The Institute will work with start-ups to help them monetize their IP in the international markets and create world class companies which will create more job opportunities in India.

About education, dissemination and raising the awareness of intellectual property

Intellectual property is the result of a broad range of creative human activities. It is considered technical or business information, therefore it is difficult to see the whole picture. For example, if we look at patents, the functions and methods of rights acquisition differ greatly between machinery-related patents and pharmaceutical patents. For machinery, a single product is made up of a complex combination of numerous patented inventions, so if you decide to manufacture and sell a product, you need to use various patents of others, and they need to be mutually coordinated. To solve this, we need to standardize and to consider a combination of a general-use part and a unique part. On the other hand, a pharmaceutical product is usually composed of one or very few patents, and therefore it is very important to own that patent right. This broad range of usage styles must be established and operated as one single system.

In terms of a copyright, it arises naturally and various rights arise in different situations. For example, if you look at a song, there is a lyric writer, a composer and a singer. If you record the song, the record label will have the copyright, and if you broadcast it on media, the broadcasting company will have a right. In such cases, for example, whose permission should we obtain if we were to use a song at a school festival?

As you can see, it would be very challenging to educate young people about wide-ranging intellectual property and to correctly disseminate that information to the public. Furthermore, education, dissemination and raising the awareness of intellectual property need to be done in a way that enhances the motivation to create new intellectual property. In Japan, standards are established based on the School Education Act to ensure that a certain level of education is equally provided throughout the country, and each school creates its curriculum based on those standards. The standards state that the curriculum is to "foster creativity in each

development phase as a source of new discovery and concepts."

However, we cannot foster creativity by simply providing knowledge or by teaching skills, and there are currently no established education techniques in this regard.To promote education, dissemination and raising the awareness of intellectual property, it is essential to develop educators and human resources who can accomplish these tasks. However, the only training that school teachers currently receive is related to basic academic skills. As a result, most teachers have the same level of knowledge about this new territory of intellectual property as the general public. It would take a considerable amount of time and work to increase the knowledge of the majority of educators to a level where they can educate young people.

Efforts toward education, dissemination and raising awareness as part of strategy to become an intellectual property-based nation

In light of these difficult challenges, and as the nation strives to become an "intellectual property-based nation," the government has indicated three directions in the "Intellectual Property Strategic Programme 2016" and started taking relevant measures. The three directions are:

Implementation of systematic education focused on cultivating each person as human capital for developing and using intellectual property,

Fostering the development of creativity which emphasizes the use of communal connections and knowledge, and

Achieving collaboration with local communities and society (construction of a support system via industry-academia-government collaboration).

Furthermore, the following three initiatives were established in the "Intellectual Property Strategic Programme 2017," and these initiatives will be undertaken in the future.

Promotion of Education about Intellectual Property in Schools and Universities

Construction of an Educational Support System in Partnership with Local Governments and Communities

Infrastructure Development for Intellectual Property Education and Raising awareness.

The author is a professor in W.B. National University of Juridical Sciences, Kolkata

Deben Bhattacharya : Traveller of the Tune

Sugata Guha (1983)

"There is something incredibly beautiful about the first glimpse of an unknown city in twilight",wrote a man one evening in September 1955 when the city of Ljubljana in erstwhile Yugoslavia unfolded herself before his eyes. But he was not there as a wide-eyed tourist. He was in a Bedford milk van that had been converted into a caravan, with his tape recorder, a Frenchman and an Englishman for company and the dream of an epic journey in his mind.

To Deben Bhattacharya, it was a journey that would define his life, as the eternal gypsy who dreamt of doing what no one had done before.

Born in an orthodox Bengali Brahmin family in Varanasi in 1921, his traditional upbringing brought out the rebel in Bhattacharya and by the time he was sixteen, he had already attempted to run away more than once. The restless young man had heard a call he could not define but could not ignore either.

It was the call of music, an obsession that would change his life forever. Varanasi being a hub of Hindusthani classical music, a number of accomplished musicians was part of his family circle. Through them, Bhattacharya experienced the magic of various *ragas*. It awakened in him a lifelong curiosity to explore the journey of music.

And he jumped headlong into it,-combing the libraries of Varanasi for early musical texts, in the process acquiring an exceptional understanding of classical Indian culture. As his creative faculties blossomed, Bhattacharya learned Sanskrit, Hindi and English, writing poems in his native Bengali and translating traditional and contemporary Indian poetry.

But it was the wider world that fascinated this intrepid young man. During the Second World War, through two of his European acquaintances, he met a young officer in the Royal Engineers, Alan Colquhoun, who assured him of a job in England. So, in the winter of 1949, Bhattacharya found himself in Tilbury near London, working in the post office. It was a job that neither suited his temperament, nor his acumen. But he had one constant companion to while away the hours – BBC radio.

"We have a relationship of 200 years, but it is unimaginable that BBC has no programmes on Indian music." Bhattacharya had shot off a letter to the programme directors of BBC, with little or no expectation of a reply. But only a few days later, BBC replied, stating that they were very interested in meeting Bhattacharya. It was an interview that would, once again, change his life.

Now, he was an associate producer of Indian music for BBC radio programmes,

with a mandate to create short episodes introducing Indian music to the British audience. With a lot of trepidation, he produced his first episode, a short introduction to Indian classical music. It was an unqualified triumph. The traveller of the tune had begun his unforgettable journey.

In 1954, Bhattacharya returned to India to record folk music, and went back with a treasure trove that included songs of the *Bauls*, the travelling and singing bard-ascetics of Bengal. In his words, they were 'God's vagabonds', and the mesmerising voices of Nabanidas Baul and his young son Purnadas Baul travelled, for the very first time, beyond the shores of India.

It was in 1955 that Bhattacharya went back once again. This time, it was through an epic journey across continents, like a traveller browsing through ancient lands, gathering priceless nuggets of music for the world to revel in. With him were Henri Anneville, a French journalist and Colin Glennie, an English architect. Together, they travelled in a converted milk van through Italy, Yugoslavia, Greece, Turkey, Iraq, Jordan, Iran, Afghanistan, Pakistan and finally through India– A12,000 km long odyssey ofliving an improbable dream. Henri left soon after and Bhattacharya continued with Colin. It was an age before ultra-light portable recording devices; so with him was his Gaumont-Kaleespool tape recorder that weighed around 35 kilos, a device that needed to be powered by car batteries.

It was a journey fraught with problems and dangers. But like two young explorers going into uncharted waters, the two men ventured on, befriending people, cultures, customs and emerging with a worldview that very few are privileged to experience.

From the haunting *azaan*, the *muezzin's* call for prayer in Iran, to Turkish love songs, Syrian psalms, Bedouin ballads from Jordan and wedding songs from Punjab, Bhattacharya brought back an extraordinary bounty of world music. In the inhospitable desert, according to Bhattacharya, "…there were no flowers, but there was the perfume of melody all around."

Some parts of the journey were difficult. Early on, Bhattacharya and Glennie passed through Istanbul, where violent mobs had recently attacked the city's Greek and Jewish minority. The atmosphere was tense; it reminded Bhattacharya of riots he had experienced in India before her independence. He remarked: "I disliked Istanbul as I disliked myself for being so badly affected by it. I forgot that no nation in the world is free from fanaticism."

During the journey Bhattacharya recorded over 40 hours of music, some of which would be released on the 1956 LP *Music on the Desert Road: A Sound Travelogue*. With this journey, he changed the way people listened to music from around the world. Frank Zappa, in an interview in 1993 said, "Actually, I think my playing is more derived from Eastern music, Indian music…for years I had something called 'Music On The Desert Road'…I used to listen to that all the time."

Being a gypsy at heart, his tryst with these free spirits in Jordan and Rajasthan resulted in some extraordinary moments that have always remained close to his heart. He thought of the gypsies as a unique culture that was often misunderstood. In his own words, "Gypsy music is a myth…Whatever melody he may choose to play on a given occasion, the gypsy will stamp it with his own personality, and individuality derived from his own community."

The journey was life-changing for Bhattacharya. Apart from recording music, he became an avid photographer and kept a travel diary where he wrote about the people he met and his experiences, thoughts that would later find expression in the book 'Paris to Calcutta – Men and Music on The Desert Road', published after his death.

In the 1960s, Bhattacharya turned his hand to documentary filmmaking, and soon had a bouquet of excellent films that gave us a peek into the traditional music of India, China and South-east Asia. His penchant for recording in the proper milieu was set in stone. His wife, Jharna Bose Bhattacharya, observes, "Another impression one had about his work was his search for authenticity…he would record a wedding song at a marriage ceremony, harvest songs in the fields or the chanting of *mevlud* at a funeral."

During the liberation movement of Bangladesh in 1971, Bhattacharya was in Calcutta, recording songs that today occupy pride of place in a museum in Dhaka as part of Bangladesh's national heritage.

In 2001, this poet, writer and pioneering ethnomusicologist passed away in Paris, leaving behind about 400 hours of audio recordings of music, more than 15,000 photographs, twenty-two documentary films and several books.But to many of his admirers, he leaves behind the ballad of a restless heart, a curious gypsy that gave us a different and humane view of misrepresented countries, introducing us to their rich cultural history. He gave us a glimpse into the mysterious heart of music that transcends the ordinary, through a life that still resonates among many.

The journey of Deben Bhattacharya, the gypsy from Varanasi, continues.

The author is an Advertising profesional and Lyricist

The Blue & White Boys on the Sweet Bengal Trains

Subrato Chaudhuri (1987)

It was the scorching summer of 1985!

In the past few days, the mercury had kissed 110° Fahrenheit. Hurriedly, the school authority announced the much-cherished Summer Vacation!

Jugular, a group of boarding school boys was heading home from their serene school campus at Purulia to the hilly towns of North Bengal. The boys look elated as if they were just liberated on parole!

Purulia then (albeit, till date) boasted two of India's prestigious public schools — a missionary Ramakrishna Mission School and, the other, a squaddie-grooming regimented Sainik school.

As the students embarked upon a 500-mile home-going journey, they lugged their book-loaded heavy trunks, changing trains with five layovers. They hopped from one train to another, only to alight a few stations away, before hopscotching into a connecting train.

Purulia town proudly showcased Honeydew —a sweet delicacy, one couldn't spot alike, elsewhere, to date.

Quintessentially, Honeydew is a flavoured cheesy chhena — a lump of mildly caramelized solid-milk ball slowly simmered in the sugary syrup and with an emanating whiff of orange-lavender aroma. In the sweetshop adjacent to Purulia Railway station, the boys wolfed down a few more mouthfuls. It was a quick treat in the hour of retreat to their home. Once inside their mouth, the squishy Honeydew got melted, craving to swallow one more; for a paltry 50 paise, they would swallow one more gulp of honeydew; and then, one more! It was a piece of quaint gastronomic music; a pure epicurean joy for their salivating taste buds.

Adra Junction, the next major railway station, had a swath of confectioneries

an Indian railway traveller could imagine in the 1980's — cream rolls, veg patties, pastries, hot muffins and croissants. The food stalls on the platform were exuding a fruity aroma, atypical of bakery and patisserie. The ravenous teens got busy pigging out over the pastries and in licking the dripping creamy fondants off their fingers.

As the train halted at a nondescript railway station, the harried passengers ran pell-mell to the drinking water taps. They jostled one another, trying to fill one's bottle first. An able-bodied man held the head of the iron faucet with all the might he had in his left arm, and, a peevish bottle, in his right. A feeble water thread was dripping into his canister, and a contingent of impatient passengers was screaming behind him to hurry up. Utter pandemonium! The tap water stank of saline and tasted bland. The burly man emerged triumphant, with his all-gleaning smile touching his earlobes.

"Kwooooooo...woo...woo...," the coal-run engine screamed repeatedly, billowing plumes of dark smoke and puking coal dust into the air. The mail train Guard waved his green flag, popping his head out of his rear-of-the-train cabin. As the train trundled wearily, the boys ran frantically to board the carriage. They returned empty-handed. Vanquished-laden thirst made them doubly thirsty.

"Shingaraaaaaa... garam Shingara, সিঙ্গারা, গরম সিঙ্গারা," yelled a vendor to the top of his lung power, with a bamboo basket on his head.

The train was entering Howrah, the riverside gateway to the city then called Calcutta. Shingara is the Bengali version of Samosa and is stuffed with mashed and spiced-up potato and fried cauliflower, and then, deep-fried in oil and served with finger-licking tomato sauce. Ten pieces for a rupee; nothing beats them in price and taste. The boys snacked on, nibbling gingerly.

"Muri, Jhaal muri, মুড়ি, ঝাল মুড়ি," yelled another frail-looking purveyor.

The puffed rice, Muri, was sprinkled with pungent mustard oil, chillies, scallions, pepper and chilli powder; pungent enough to bring water in eyes and nose. Topped with a julienned coconut meat stick, and served in a newspaper cone, the piquant Jhaalmuri was ubiquitous across the Bengal trains and had resisted any changes in taste and flavour, for ages! The boys washed down a cone each, throwing the puffed rice into their mouths.

Sooner, another vendor screamed, "Fuchka, Fuchka, Fuchka, ek Takay kuri (20)–ta., ফুচকা, ফুচকা, ফুচকা, ১ টাকায় কুড়িটা."

Fuchka is the Bengali version of Panipuri or Golgappa, fried paper-thin flour balls stuffed with hot and spicy mashed potato, sprinkled with chopped chillies & oily onion and filled with tangy tamarind-and lemon-water.

"Get every one of us 20 fuchkas each," one of the boys ordered for all his mates.

As the vendor served them the Fuchka, one-on-one, in sal-leaf platters, scooping and filling each Fuchka with lemon water out of his pitcher, the boys cheerfully

stomached them down.

"Please get us one dry one, as gratis! আরেকটা ফাউ দিন, শুখনো," one of the boys pleaded persistently, after swallowing twenty acorns.

The seller smilingly obliged at the binge-end and got them two fuchkas, instead of one.

"Hobe na ki ek ta kore Mishti Doi, Khoka Babura?" হবে নাকি একটা করে মিষ্টি দই, খোকাবাবুরা?" a vendor gleefully coaxed, tempting the juveniles.

Yummy sweet yogurt — with splashes of aromatic date palm jaggery, served in an earthen pot and with a banana-leaf-rib spoon — left a permanent impression, especially with the sweet-tooths.

"Kachagolla, Kachagolla!" As one skinny vendor screamed, the freshly baked Kachagolla vanished faster in the mouths than they were baked.

As the boys peregrinated to the north, off Howrah station, the flaky Shoan Papri — a vendor hawked at Kanchrapara station — would often crumble in the fingers, even before melting in the mouth and leaving them with a half-satiated craving.

Much to the amusement of the adolescent ears, one vendor parodied, "Debo naaki, chhaal chhaariye, Nuun maakhiye?" দেবো নাকি ছাল ছাড়িয়ে, নুন মাখিয়ে? He sold peeled, salted and sliced cucumber!

On the train caravan, Rasogolla, mouth-watering Chanachur, Rajbhog and crunchy Papad topped with sprinkled onion brought in a zingy olfactory thrill in them.

Blurp! Blurp! Blurp! It's a clear signal of gastronomic satisfaction. An imminent recess was in their binge eating, but only to begin sooner.

On the train, the boys sat huddled in a general class compartment. Other passengers squatted on the floor, crowding the alleys to the toilet, even sleeping on the upper luggage rack, snoring blissfully. The wind was gushing in through the windows, which they felt was a big bonus compared to their ceiling fan-devoid hostels.

No sooner the mail train crawled onto Malda railway station, the platform started buzzing with the hawkers' humming narratives, "Maldar Aam, Aam satto, Aamer Achar, মালদার আম, আমসত্ত্ব, আমের আচার."

For the uninitiated, these were the famous mango leather and salty mango pickle. A bevy of hawkers teeming in the platforms pushed their products in, four hawkers with pickle bottles in their both hands, each pleading and soliciting, through the train window grills. Their skinny hands dangled near the boys' noses that couldn't go amiss with the aroma of the saliva-inducing condiments.

Then, Malda station had a unique aroma; the aroma of mango, succulent Lychee, and crisp-fried fish. Some rustled up omelette on a frying pan, breaking eggs and mixing with onion, scallion and salt. A few deep-fried fish and served to

the hungry passengers along with lashings of fish curry on a mound of steamed rice, saffron-tinged free-flowing potato gravy, mango pickle, and high-scoville green chillies. All for a mere Indian fiver!

"Chaye Cha, Chaye cha, চায়ে চা, চায়ে চা," the sing-song tune of the hawkers with an aluminium kettle on a burning portable box oven and the warm smell of the Dooars tea woke up the snoozy boys at Kishangunj railway station.

"Yuck!" said one of the boys, after tasting the insipid watery tea. Their hostel tea was way better! Hurriedly, he threw the earthen tumbler out through the window.

Another vendor's screaming for "Ram Pyari Chai, রাম প্যায়ারী চায়ে," created giggles wanton among the boys, even in the first-daylight-peeping dawn.

"Dim, Dim, Dim, Boiled Dim, Do khao, to nehi jana padega Gym, ডিম, ডিম, ডিম বয়েল্ড ডিম, দো খাও, তো নেহি জানা পড়েগা জিম" another hawker whispered on the train alley. He peeled and cut boiled eggs into two pieces with a cotton thread between his fingers, before unashamedly discarding the eggshells under the passengers' seats, where it secularly got mixed with the peanut shells.

Being porous to the Nepal Border, New Jalpaiguri — monikered as NJP — had myriad of fancied imported-through-India-Nepal-border foods: flavoured and pliant Candies, Lotte Chewing Gums — not available on the train anywhere in India.

Once off NJP, mercury quite down this side, the train compartment started humming with, "Chamcham, Chamcham, daanaadaar chamcham, চমচম, চমচম, দানাদার, চমচম!"

Special mention went for the ever-smiling, barefooted sweet-seller clad in a half-sleeved and frayed-in-his-armpit Kurta and a soiled dhoti worn up to his stout knees. He sold mouth-watering Kalakand, scrumptious Chamcham around Dhupguri railway station, for over fifty years. He purveyed sweets, ferrying on the moving trains and skilfully balancing his aluminium can over his gamchha towel-wrapped head. His resplendent face, with a glistening sandalwood tilak on his forehead, always exuded a greeting spirit. The aroma of the sweets he sold and his infectious pleasant smiles got ingrained intact on the palate and the memory of the school-returning boys.

After having an uninterrupted train food binge, tasting thirty different sumptuous items and, of course, becoming poorer by seventy rupees, — a princely sum in those days — the boarding school boys were home with an ecstatic delight.

They realized that the foods sold on the trains not only have a unique flavour and fragrance, but earthy music and soothing cadence, too. They realized that food is the manifestation of The Almighty. Food is the real God. All the Sun, Sunlight, photosynthesis, the lengthy reaction of Glucose $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ taught in the classroom is His work to keep mundane humankind, alive. Varied taste in a myriad of food is just His handiwork to save us from the food ennui!

Many of the above scenes at the railway stations were amiss during the lockdown because of the Covid pandemic. At times, the railway stations were desolated or without a crowd. The hawkers were not encouraged onto the platforms either. Passengers were scared to eat off the vendors, on the excuse of hygiene and contagion.

Over the past four decades, the Indian Railway stations, too, got much gentrified with snazzy food stalls that now serve warm and pre-packed foods, wrapped in aluminium foils. The major stations have shimmering vapour lamps and gleaming escalators. The stations are cleaner. The lounges became squeaky clean.

The earlier vignette of the hundreds of hawkers across the length of the train, their scouting for buyers under their kerosene-lit lamps — কুপি, cupi in local lingo — are missing nowadays. The hawkers' tossing of piping hot omelettes, their serving of paper-thin rotis, their home-made vegetable curry whose watery gravy would often spill off the newspaper tray they served upon, their animated chatters, the platform cacophony —all these are missing at today's Indian Railway platforms.

Instead, now, cleaner platforms are there, with a marked miss of the humane touch of those humble hawkers. The passengers, too, are engrossed in their hand phones, with a minimal interaction among them. It's a behavioural and digital metamorphosis, indeed.

Is it a bane in disguise, or the desired evolution, or is it a fait accompli?

**Subrato, a 1987 Madhyamik batch passout and a Director with an Indian Public Sector Unit, is available at subuchow@yahoo.com for comments.

Targeted Radionuclide Treatment and Theranostics in Cancer: A few illustrative examples

Sandip Basu[1,2] (1988)

[1]Radiation Medicine Centre, Bhabha Atomic Research Centre,
Tata Memorial Hospital Annexe,
Jerbai Wadia Road, Parel, Mumbai 400012

[2]Homi Bhabha National Institute, Mumbai

Present Designation: [1]Consultant Physician, Professor & Head, Nuclear Medicine Academic Programme, Radiation Medicine Centre (BARC). [2]Dean-Academic (Medical & Health Sciences), BARC, HBNI

Contact email: drsandipb@gmail.com

The past decade has witnessed rapid developments in the field of targeted radionuclide therapy in Cancer, with multiple therapeutic radiopharmaceuticals examined and translated into clinical practice.

Radioiodine therapy with I-131 for thyroid cancer has developed to be the cornerstone of management of thyroid cancer and some benign conditions (hyperthyroidism), since its first introduction more than 70 years ago. The first therapy was undertaken by Saul Hertz in The Massachusetts General Hospital in 1941: the year 2016, marked the 75th anniversary of Dr. Saul Hertz first using radioiodine to treat a patient with thyroid disease. The principle of I-131 treatment is based upon expression of the sodium iodide *symporter* (NIS) symporter pump, an integral membrane protein residing in the basolateral membrane of thyroid epithelial cells, which symports two sodium ions for every iodide ion, which leads to 20-40-fold concentration of iodine in the thyroid gland compared to its plasma concentration.

Presently, a vast majority of patients of differentiated thyroid cancer (DTC) and hyperthyroidism are treated with this agent successfully. The clinical examples of 3 patients of differentiated thyroid cancer are illustrated in figures 1-3. In the first patient this was used for 'residual or remnant thyroid ablation' post-thyroidectomy, the 2nd patient was a case of DTC with lung metastasis, while the 3rd patient was DTC with skeletal metastasis, for which adjuvant I-131 treatment produced excellent results even in patients with advanced metastatic disease and producing complete response to administered I-131 treatment.

Case 1. Radioiodine Ablation of Neck Residue in Differentiated Thyroid Cancer

Fig 1 in PPT: 1st Slide

Case 1. A 59 year old female with follicular variant of papillary thyroid carcinoma, underwent Total Thyroidectomy 25/09/2021 and was referred for Radio-Iodine ablation.
1 mCi diagnostic (left panel) and post-treatment scan (middle panel) showing abnormal tracer uptake in the neck (thyroid bed) representing remnant thyroid tissue post-surgery, which is completely resolved in the scan done 6 months after I-131 therapy.

Case History & Figure 1.

A 59-years-old female with follicular variant of papillary thyroid carcinoma, underwent total thyroidectomy in September 2021 and was referred for disease evaluation and radio-Iodine ablation.

1 mCi I-131 diagnostic scan (left panel) and post-treatment scan (middle panel) showing abnormal tracer uptake in the neck (thyroid bed) representing remnant thyroid tissue post-surgery, which is completely resolved in the scan done 6 months after I-131 therapy.

Case 2. Radioiodine Therapy in Differentiated Thyroid Cancer with Pulmonary Metastases

Fig 2 in PPT: 2nd Slide

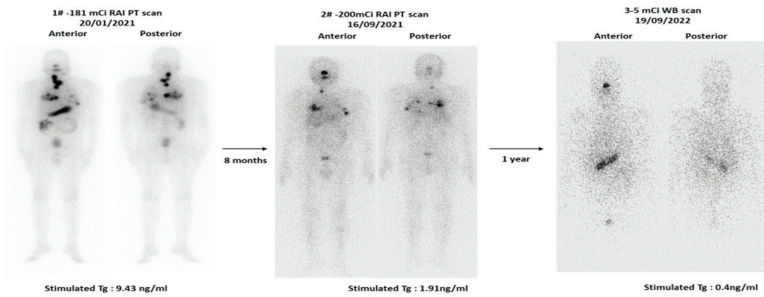

Case 2. A 32-years-old male with differentiated papillary thyroid carcinoma, classical type with lymph node and bilateral lung metastases. He underwent total thyroidectomy bilateral nodal dissection on 26/12/2019 & was considered for adjuvant Radio-Iodine therapy.
The 1st post-treatment scan (left panel) shows abnormal radioiodine concentration in thyroid bed and bilateral lungs. The 2nd post-treatmentscan (middle panel) demonstrates resolution of thyroid bed uptake and partial response of bilateral lung lesions. The diagnostic scan after 1 year of 2nd therapy (right panel) shows complete resolution of all lesions. The

Case History & Figure 2.

A 32-years-old male with differentiated papillary thyroid carcinoma, classical type with lymph node and bilateral lung metastases. He underwent total thyroidectomy bilateral nodal dissection in December 2019 and was considered for adjuvant Radio-Iodine therapy.

The 1st post-treatment I-131 scan (left panel) shows abnormal radioiodine concentration in thyroid bed and bilateral lungs. The 2nd post-treatment scan (middle panel) demonstrates resolution of thyroid bed uptake and partial response of bilateral lung lesions. The diagnostic scan after 1 year of 2nd therapy (right panel) shows complete resolution of all lesions. The tumor-marker stimulated thyroglobulin (Tg) showed serial decrease from 9.43 ng/ml (pre-therapy) to 0.4 ng/ml (1 year after 2nd Radioiodine therapy).

Case 3. Radioiodine Therapy in Differentiated Thyroid Cancer with Bone Metastases

Fig 3 in PPT: 3rd & 4th Slides

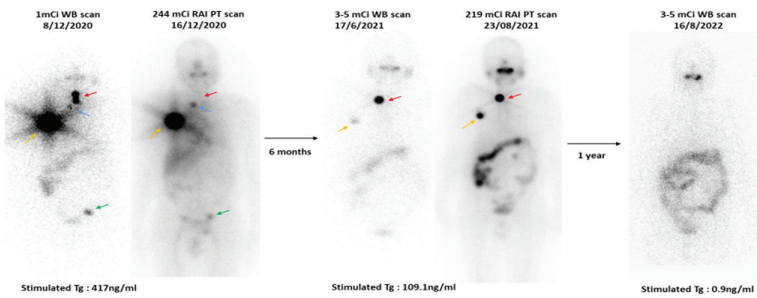

Case 3. A 65-year-old male, case of carcinoma thyroid with skeletal metastases, was referred to for adjuvant RAI therapy with I-131.

The pre-operative FDG-PET/CT in 2020 showed primary tumour in the right lobe of thyroid with metastatic right cervical and mediastinal nodes. Also there was evidence of skeletal metastasis in right 3rd rib and left iliac bone. Total thyroidectomy & Lymph node dissection was undertaken in October 2020.

The 1 mCi diagnostic I-131 scan (left panel) shows abnormal tracer uptake in thyroid bed (red arrow), right upper mediastinum (blue arrow), right side of chest -3rd rib (yellow arrow), pelvis left side (green arrow). The LD scan after 6 months of therapy (middle panel)

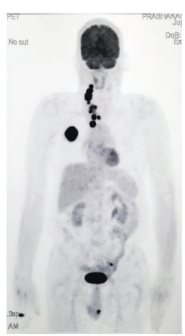

FDG-PET/CT Baseline (at diagnosis

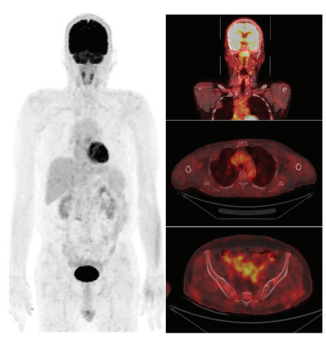

FDG-PET/CT at 1 year after 2nd cycle. It shows complete metabolic response and partial morphological regression of skeletal metastases (right 3rd rib).

Case History and Figures.

A 65-year-old male, case of carcinoma thyroid with skeletal metastases, was referred to for adjuvant RAI therapy with I-131.

The pre-operative FDG-PET/CT in 2020 showed primary tumour in the right lobe of thyroid with metastatic right cervical and mediastinal nodes. Also there was evidence of skeletal metastasis in right 3rd rib and left iliac bone. Total thyroidectomy & Lymph node dissection was undertaken in October 2020.

The 1 mCi diagnostic I-131 scan (left panel) shows abnormal tracer uptake in thyroid bed (red arrow), right upper mediastinum (blue arrow), right side of chest -3rd rib (yellow arrow), pelvis left side (green arrow). The LD scan after 6 months of therapy (middle panel) demonstrates resolution of lesions in right upper mediastinum, pelvis and decrease in tracer uptake on right rib lesion while thyroid bed lesion showed persistent tracer uptake. The repeat diagnostic after 1 year of 2nd RAI therapy showed no abnormal foci of tracer uptake. The stimulated Tg showed serial decrease from 417 ng/ml (during baseline 1 mCi scan) ---> 109.1ng/ml (1st LDS) ---> 0.9 ng/ml (2nd LDS).

Receptor over-expression in Tumors as Target has been a major development in the field of Nuclear Theranostics: two developments where this has found immense success are: (a) [68Ga]Ga-DOTATATE /^{177}Lu-DOTATATE based theranostics and somatostatin receptor based targeted radionuclide therapy known as 'peptide receptor radionuclide therapy' (PRRT) in metastatic and advanced neuroendocrine tumors and (b) [68Ga]Ga-/[177Lu]Lu-PSMA-based theranostics and peptide receptor radioligand therapy (PRLT) in metastatic castration resistant prostate carcinoma (mCRPC).

The term 'Theranostics' implies combining diagnostic and therapeutic capabilities into a single agent. In simplistic terms, Theranostics is defined as *"Treat what you see & See what you treat"*. The aim is to develop more specific, individualized therapies for various diseases in clinics, which has made definite contribution in clinical oncology practice.

[68Ga]Ga-/[177Lu]Lu-PSMA-based theranostics and ^{177}Lu-PSMA-617 peptide receptor radioligand therapy (PRLT) in Metastatic/Advanced Prostate Cancer

Prostate cancer is the second most common cancer in men worldwide with a high incidence of skeletal metastases in the disease course. Multiple molecules have been developed targeting prostate specific membrane antigen (PSMA) receptors on metastatic prostate cancer like PSMA-11, PSMA-617, PSMA-1007, DCFPyL, and so on. With these ligands labelled with radioisotopes metastatic prostate cancer is imaged with high sensitivity using the PSMA-specific molecules labelled with positron emitters like ^{68}Ga and ^{18}F, while the treatment (peptide receptor radioligand therapy or PRLT) is undertaken by these molecules tagged with beta or alpha emitting radioisotopes like ^{177}Lu or ^{225}Ac, with resulting therapeutic radiopharmaceuticals, ^{177}Lu-PSMA-617 and ^{225}Ac-PSMA-617. An example of PSMA

targeted treatment & its efficacy is illustrated in Case 4.

Case 4. Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) based radioligand therapy (PRLT) with ^{177}Lu-PSMA-617 in metastatic castration resistant prostate carcinoma (mCRPC)

Fig 4 in PPT: 5th Slide

^{68}Ga PSMA-11 PET/CT: Baseline and follow-up during ^{177}Lu-PSMA-617 treatment cycles

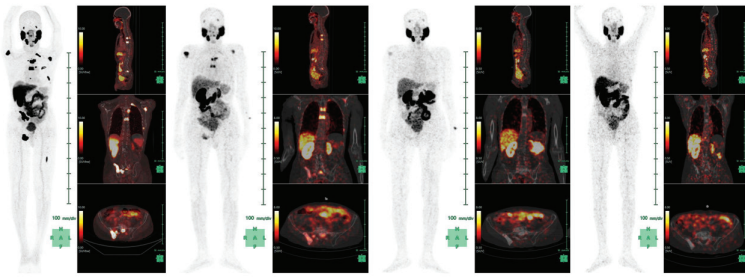

Pre Therapy Baseline S.PSA : 9.5 | **After 1# ^{177}Lu PSMA S.PSA : 6.8** | **After 2# ^{177}Lu PSMA S.PSA : 0.1** | **After 3# ^{177}Lu PSMA S.PSA : 0.1**

Case 4. Patient of metastatic castration resistant prostatic carcinoma. (Gleason's score 5+4=9), diagnosed in 2017, underwent b/l orchidectomcy in 2017 and was on hormonal therapy. The patient was referred for PSMA therapy as disease progression on hormonal therapy (was not fit for chemotherapy).

Serial ^{68}Ga-PSMA-11 PET/CT showed decrease in number of skeletal lesions followed by complete resolution after 3rd cycle of ^{177}Lu-

Case History and Figures.

A patient of metastatic castration resistant prostatic carcinoma (mCRPC), with Gleason's score 5+4=9 on histopathology, diagnosed in 2017, underwent bilateral orchidectomcy in 2017 and was put on hormonal therapy. The patient was referred for considering PSMA targeted therapy in view of disease progression on hormonal therapy (he was not fit for chemotherapy).

The figure 4 shows serial ^{68}Ga-PSMA-11 PET/CT demonstrating decrease in number of skeletal lesions followed by complete resolution after 3rd cycle of ^{177}Lu-PSMA-617 treatment. The patient reported complete resolution of bone pain and improved quality of life.

^{177}Lu-DOTATATE Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) in Metastatic Neuroendocrine Tumors (NET)

The somatostatin receptors (SSTRs) are over-expressed in a variety of NETs which can be imaged or treated by SSTR targeting ligand molecules and their forme-fruste like DOTA tagged with positron-emitting radioisotopes as ^{68}Ga using linker molecule (also known as bi-functional chelates), with resulting compounds such as DOTATOC, DOTANOC & DOTATATE. Thus, while the SSTR targeted PET/CT imaging of the NETs is achieved by the radiopharmaceuticals like ^{68}Ga-DOTA-TATE/^{68}Ga-DOTA-NOC, the therapeutic molecular targeting is accomplished by the therapeutic counterparts, like ^{177}Lu and ^{90}Y and used for the treatment of this class of tumors in their advanced stages: the treatment modality is termed as Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT). An example of efficacy of ^{177}Lu-DOTATATE PRRT is illustrated in Figure 5.

Fig 5 in PPT: 5th Slide

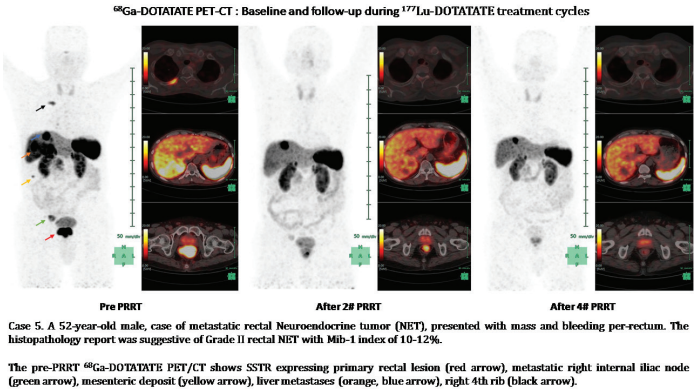

Case 5. A 52-year-old male, case of metastatic rectal Neuroendocrine tumor (NET), presented with mass and bleeding per-rectum. The histopathology report was suggestive of Grade II rectal NET with Mib-1 index of 10-12%.

The pre-PRRT ^{68}Ga-DOTATATE PET/CT shows SSTR expressing primary rectal lesion (red arrow), metastatic right internal iliac node (green arrow), mesenteric deposit (yellow arrow), liver metastases (orange, blue arrow), right 4th rib (black arrow).

Case History and Figure 5.

A 52-year-old male, case of metastatic rectal Neuroendocrine tumor (NET), presented with mass and bleeding per-rectum. The histopathology report was suggestive of Grade II rectal NET with Mib-1 index of 10-12%.

The pre-PRRT ^{68}Ga-DOTATATE PET/CT shows SSTR expressing primary rectal lesion (red arrow), metastatic right internal iliac node (green arrow), mesenteric deposit (yellow arrow), liver metastases (orange, blue arrow), right 4th rib (black arrow).

The follow-up serial ^{68}Ga-DOTATATE PET/CT shows significant decrease in size and SSTR expression of the primary with resolution of all the SSTR expressing lesions except for a single liver metastasis (which has showed decrease in size) after the 4th cycle. There was complete resolution of symptoms after 4 cycles of PRRT.

In addition to the aforementioned 2 newly developed treatments, development in theranostics have resulted in newer accomplishments in the therapeutic nuclear medicine expanding its horizon such as evolution of the (a) α-emitting *radionuclides* for treatment demonstrating high cell-killing efficiencies, (b) transarterial radioembolization (TARE) for liver tumors (such as unresectable hepatocellular carcinoma), (c) radioimmunotherapy employing (i) ^{131}I/^{177}Lu-DOTA-Rituximab (Treatment of relapsed follicular, mantle cell, or other lymphomas) and (ii) ^{177}Lu-trastuzumab (HER2 or Erb2/neu positive metastatic/advanced breast malignancies).

In summary, in this short discourse, we have explored a few major clinical applications of targeted radionuclide therapy (both traditional and newer applications) with I-131 and 177Lutetium based radiopharmaceuticals through illustrative case examples. It is expected that with newer radiopharmaceuticals, this very well-tolerated and efficacious treatment approach would be more popular in cancer patients.

Safer Internet – By the People, of the People, for the People

Dr. Partha Das Chowdhury (1993)

National Research Center on Privacy, Harms and Adversarial Influence Online
University of Bristol, England

Information gives power and absence of information leads to the will of few prevailing over so many. For example, Bible was controlled by the church: they were encoded in Latin and often kept chained. This meant that very many believed what a very few wanted them to believe. However, movable type printing by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg destroyed this monopoly of a few over the minds of so many. Tyndale translated the New Testament in 1524-5 and before he was executed some 50,000 copies were printed which were enough to challenge the religious abuses of centuries.

The Internet as an innovation can be seen as powerful as movable printing press if not more in transforming our lives and connecting us with every corner of this planet. Digital participation is critical to our shared access to many essential services, such as education and healthcare. The times we live in, it won't be an exaggeration if we say the Internet is as much a public utility as healthcare, transport, and education. While there are public debates on safer roads and safer communities; the debate on online safety has gained considerable traction over the past several years. In this brisk ramble we will try to understand what can go wrong and how to protect ourselves.

Common Harms:—

"Catch me if you can" – A common complaint is fraud over the Internet leading to loss of money, reputation, and physical property. Many of us are familiar with victims being duped to share their banking one-time passwords and other sensitive details by thieves pretending to be calling from banks or legitimate financial organizations. The usual bait is to tell the victims that they will lose access to services or there is a complaint against them, and they need to act now.

"The Internet says so" – While interactions move online and there is increased reliance on information found on the Internet, we have seen the devastating consequences on democracy, social life and perhaps every aspect of our collective being. Misinformation and disinformation is an industry in itself now and engaged in manufacturing false information to feed unsuspecting citizens through social media and messengers like WhatsApp.

"False Dmitry I" – Dmitry pretended and ruled as Tsar before he was imprisoned and killed for treason. The Internet makes it far easier; a perpetrator

can steal information belonging to a victim across continents and pretend to be the victim. A simple Google search reveals even minute details about individuals that were nearly impossible to gather in the pre-Internet days. Dmitry still needed to gain the trust of people in the real world who knew the victim he was trying to impersonate, which is not the case on the Internet.

There are no free lunches – A lure of free games and content can be dangerous. Scammers and malicious actors exploit users who look for free versions of their games or content. There are instances when people have lost money and/or scammed in other ways. Then there are romance scams, phishing emails (pretending to be from banks), rent scams, so on and so forth.

A few useful tips:—

Presence of a Capable Guardian – While we aim to reduce the cognitive load on the user to protect themselves against motivated online offenders, we ~~do~~ recommend building upon our inherent tendencies to negotiate with our surroundings. In routine activity theory, in criminology, the presence of the capable guardian can reduce crime even where there is a motivated offender and a suitable victim. We can reduce crime against ourselves by improving our observation skills. They can be flagging of any unwanted advances by strangers towards children and/or parents taking note of increased internet activity by children or having default lens cover for all devices with cameras. These are not necessarily precursors to illegal activity but worth taking note of. If we encourage participants to report any absence of normal, they notice, without automatically escalating them, this encourages an environment of alertness without panic. There are effective ways to maintain an environment of alertness among citizens; they range from awareness drives, safety clinics and use of games to detect the presence of abnormal.

Use Educational Security Games – Security and privacy games are useful learning tools to understand the risk landscape. Datak and Immaculacy are good examples of games that educate about online privacy through role playing. Data Defenders teach teenagers about the harmful consequences of sharing information online. The CyberSprinters game and resources by the National Cyber Security Center UK is a useful resource as well.

We Should Not be Driven by Fear – Studies conducted with citizens (including information technology professionals) report widespread presence of fear and paranoia. Fear can impede our ability to make rational decisions. In 2018, police helicopters were scrambled after reports of a child kidnapped in broad daylight. After seven hours of police investigation and blanket media coverage, the kidnapper contacted the authorities to declare that he was not a kidnapper, and the child was actually his daughter[1].

1. https://letgrow.org/kidnapping-false-alarm-news
2. https://www.schneier.com/essays/archives/2010/05/worst-case_thinking.html

This is an example of how the rapid spread of hysteria can result in the inappropriate use of resources – if we expect ordinary citizens to play an active role in protecting themselves, we risk an unrealistic assessment of threats and consequent inappropriate responses[2]. This is especially true in online spaces, where the internet criminal is a faceless entity who may well be skilled in presenting themselves as legitimate. We cannot reasonably expect citizens to know the modus operandi of criminals, or how apps harvest data – protection mechanisms, during the design phase, must make a reasoned scrutiny of the skills of users and adjust their expectations of user-based assessments accordingly. It is worth noting here that platforms like Google and Apple do have mechanisms in place to assess user reports of abuse and/or threats.

The Moral Obligation of Protection Mechanisms – The design of protection mechanisms is often done without consulting the needs and abilities of the communities and groups who will be using these technologies. This inadvertent exclusion tends to disproportionately affect those who fall outside our conception of a body and mind of the user (those with less privilege). Consequently, protection mechanisms fail to fulfil their moral obligations.

In 2019, when deciding on whether a person has the capacity to take proper decisions regarding the internet and social media use, a judge in the United Kingdom observed[3]: `I do not envisage that the precise details or mechanisms of the privacy settings need to be understood, but P should be capable of understanding that they exist and be able to decide (with support) whether to apply them.' This statement is instructive in how an evaluation of the mental and physical ability of the applicants is critical in understanding whether an individual (i.e., P) would be able to use the privacy mechanisms provided.

Involving a diverse range of users with differing abilities and experience in the design stage of such a mechanism would better safeguard the needs of all individuals – in the above case, the individual was neither physically nor mentally capable of using his social media privacy settings correctly, meaning that he did not have equal access to safe and private browsing, which becomes a matter of injustice. As a general insight, the focus during design should be to develop technologies that all users are able to use in the manner they can and they value.

Co-design Systems with Citizens – Systems have been traditionally built on tendentious assumptions driven by the point of view of providers on what is right for their users. This entails making flawed assumptions about users -- their personal, social, and political realities. Systems built without considering actual users and groups fail to meet legitimate user expectations and needs. The moral argument for understanding the personal realities of users in terms of their age,

3. https://www.bailii.org/ew/cases/EWCOP/2019/3.html

ability and education should be extended to include their social and political realities. System designers should engage in a reasoned scrutiny of the winners and losers any system will create; this is important from the perspective of dignity and justice. This is contra Ferdinand[4] and will require a paradigm shift in the way regulators and system designers treat their prospective users, making a conscious effort to explain the possible uses and limitations of their technology. Such a process would benefit designers with a more able user set and provide the said user set with greater reason to value the technology. There is precedent for such a relationship; citizens by and large cooperated with their governments during the pandemic when restrictions to their movements were backed by reason.

Conclusion – "The best is the enemy of the good". This adage applies to the design and construction of security systems as much as it applies to any other technology – we build these systems to protect humans, and their failures have human consequences. It is therefore critical that system designers, policy makers and other relevant stakeholders understand the human element in the use of their systems. This understanding must include a diverse range of users and their needs in order to develop an inclusive system to protect all. The pursuit of excellence is pernicious in security systems design.

The landscape of online harms is complex, and it is unrealistic to encourage a regime of blame, coercion, and train users in negotiating this landscape safely, especially those who were not considered during the design phase of the systems they were using. Citizens lock their doors to protect themselves from thieves; this is a simple and achievable measure. But we do not expect citizens to install anti-aircraft batteries on their rooftops, as this relative complexity is both inappropriate and beyond their ken. We have password managers to help citizens with generating and remembering passwords, or E2EE to help them encrypt their messages; we should also expect critical role stakeholders to play a more active role in protecting citizens online.

4. Fiat justitia, et pereat mundus: "let justice be done though the world be destroyed" was the motto of Ferdinand I, Holy Roman Emperor, 1558-1564. This phrase was also used by Kant in his "Perpetual Peace" (1795) to emphasise the counter-utilitarian aspect of his moral philosophy.

Spirituality, Surgery and Adivasi Consciousness: A Journey Intertwined

Sisir Sagen Murmu (2006)

India has spirituality at its core, since the dawn of human evolution. There is no dispute about it. We never invaded another sovereign country for worldly gains (though interstate warfares did occur). Rama of Ayodhya attacked Lanka, only when his wife Sita was abducted by Ravana. No other country has ever produced so many pioneers of spiritual upliftment. From the Vedas to Sri Ramakrishna Paramahansa, this country observed myriad ways to fulfil the goal of life i.e. to attain God or to realize the perfection within, which Lord Buddha called the Nirvana (to become zero).

India was a centre for science in ancient times. The sages of yore focused on both experiences of the inward and outward worlds (i.e. macro & microcosm). Shushruta performed rhinoplasty in time immemorial. Only the dark middle ages have put India on a backward path. Fear has gripped most of her soul. Now after 75 years of Independence, India is showing some real progression. As a Surgeon, I feel that there are many similarities between surgery and spirituality; I am going to depict it in the following passages.

Purity and Sterility:

During practice or 'sadhana' the 'sadhak' must be pure in thought, deed or else the practice becomes a failure or repetitive without the desired end. During surgery, the utmost priority to a surgeon is sterility of the surgical field or the area of operation. Sterility for a layman is complete absence of bacteria or its spores achieved by different means such as (auto-claving) or fumigating or scrubbing. If the OT becomes unsterile operation becomes a failure causing surgical site infection afterwards.

Focus:

When a true 'sadhak' delves deep into the arena of consciousness, he loses himself in it. He forgets all the mundane worldly matters. There are instances where some 'sadhak' stayed in deep meditation for more than 60 days, which is quite a miracle to modern science. In a long-standing surgery a surgeon completely loses himself in it. It is a physically and mentally laborious task. Some plastic surgery like neoface implantation takes more than 24 hours to complete. The surgeon finds himself in the state of flow.

Act of exploration:

A 'sadhak' explores within by peeling the layers of Koshas (Annamaya, Pranamaya, manomaya, Vijuanamaya, Anandamaya); he finally finds his true self. Though it sounds very simple yet people have sacrificed their whole lives in its pursuit.

A surgeon has to enter layer by layer in open surgeries or through some port (In laparoscopic & Robotic) to find the diseased organ of concern. He has to dissect through the adhesions, layer of tissue and finally get the diseased part out. Both have their methods of exploring.

Role of the Guru/Mentor:

Be it surgery or spiritual 'sadhana' the presence of a Guru or mentor changes it all. Narendranath became Swami Vivekananda by the divine touch of Sri Ramakrishna. I owe my surgical learning to late Dr. D. P. Ghosal (CTVS Surgeon). His surgical prowess and attitude towards everyone (patient or ward boy) was heart-warming. Guru is the philosopher's stone; the mentor turns every 'sadhak'/ surgeon into gold.

The Adivasis are the ancient dwellers of land; their life style is based on nature/ *'prakriti'*. Our bodies are based on five elements of life: Fire, Air, Water, Earth and Space. Marangburu (the great mountain) or chando bonga (the moon) engulfs us in a spiritual entity. Our body is created from nature only to be united again with nature after death.

In this interval that we call life, we must be devoted to find the real truth. Things get interesting when an Adivasi surgeon decides to be a seeker. He/she combines all the qualities from three fields and gets them improved. Each field would support the other in a symbiotic relatioship.

এসেছি যোগ-এর দ্বারা মুক্ত হতে,
রোগ ও ভোগ-এর সাথে মিশতে নয়।

The author is a practicing Medical offices in W.B. Health Services.

Letters from the Ghats

Manas Sarkar (2007, Present Teacher)

1

Here in our land of grounded dreams, the winds of spring arrive with the tidings of final exams.

Just when the cold in the air seems to be abating, the sun seems to shine a bit warmer on the white walls, and the sky seems glad to have back its shade of blue – when you are ready with all your soul to surrender to the holidays, they serve you the notice, and they serve you the menu. You can't pick, though. The items have been chosen for you at the beginning of the year.

I am a member of the catering team. So in a way, I am the enemy. However, I am also a Vidyapithian – batch of 2007, to be specific – and I was brought up on different values. I don't always play by the rules. This results in this idea some students have that they can come to me and say things that wouldn't be appreciated elsewhere. Or, they can come to me when they need someone who wouldn't look at it the same way as 'the rulebook' dictates. They are not wrong. I am a pupil of Rabindranath when it comes to these things. Freedom of the Spirit always supersedes the boundaries of the Structure. So I go with my gut. No student in the world could truly love exams, because of the simple reason that to be subjected to examining is an insult to the learner's humanity. Yes, they might have been conditioned to crave what follows – the *results*, so to say – but that is merely a Pavlovian reaction, an engineered response which is as artificial as the utterings of a caged parrot.

Examinations should have been a process that lets us test ourselves so that we can pace ourselves better in our long climb to perfection. It should have been a tool for the students, and not the teachers, that they would use to improve themselves through creative growth. What do we have instead? – A giant pedagogic machine that is in part a monstrosity and in part a joke; an apparatus that aims to appease the crowd at the lowest levels, and thins the herd at the highest.

And the seeds that get crushed in this machine are the students. Back in the day, I'd guess the situation was less dire. Now it is worse. We have parents who have been absent from their kids' lives forever, and now want to get 'professional' at it. Of course the gap doesn't close. What was it that the girl had said in that famous film? – "*Dad, what do you expect? You can't all of a sudden be my best friend, just because you've got a problem.*"

The teachers could have been a solution, but the system wasn't made to accommodate for that. Our teachers are not meant to nurture life, they are meant to be the service clerk at the drive-in window. – The funny part is that this realization

is not even new. For years, our leaders-in-education have been developing our schooling models along Western lines, and all along, they have been making a mess of it. Every time someone points out the mistake, they go back to churning a new toy out of the same faulty machine. Rabindranath had tried to tell us,:

> *The students of the European Universities not only have their human environment of culture in their society, they also acquire their learning direct from their teachers. They have their sun to give them light; it is the sun of the human relationship between the teachers and the students. We have our hard flints, which give us disconnected sparks after toilsome blows; and the noise is a great deal more than the light. These flints are the abstractions of learning; they are solid methods, inflexible and cold.*
>
> *To our misfortune we have, in our own country, all the furniture of the European University – except the human teacher. We have, instead, merely purveyors of book-lore, in whom the paper god of the bookshop seems to have made himself vocal. And, as a natural result, we find our students to be 'untouchable', even to our Indian professors. These teachers distribute their doles of mental food, gingerly and from a dignified distance, raising walls of notebooks between themselves and their students. This kind of food is neither relished, nor does it give nourishment. It is a famine ration strictly regulated, to save us, not from emaciation, but only from absolute death. It holds out no hope of that culture which is far in excess of man's mere necessity; it is certainly less than enough, and far less than a feast.*

And then at year's end, we ask them to jump and measure how high they go.

One of my own came up to me, asking for a signature in his notebook, and a line, if I had one. He said it was because his ninth has been a great year. I wondered what to write, and then decided on something from years back. It is not even my own memory. It is something I read in a memoir, published by my school in its 50th anniversary magazine.

It was a day of the annual exams. They had Biology that day (the author's batch was from sometime in the 80s) in the afternoon, and in the morning the study hall was in a nervous uproar. Everyone was apprehensive. Everyone was talking to others, worried about what might turn up and what was not quite properly prepared. It was a dismal state. Then Swapan-da walked in. Swapan-da, teacher of English (and a lot of other things that I can't begin to talk about here), was the warden. Immediately he made everyone drop their books, notes, and anything else they might've been studying, and made them march out of the study hall straight into the hostel. *No more studies*, he said. *This is a travesty; you've studied enough.* – He closed the hall and locked the door.

The author wrote, "We took the exam later, just like that, without having laid eyes on a book for the past several hours. And we all did excellently. The funny thing is, we were not really surprised."

It was Swapan-da's credo that you need to *perform your best as per your preparation*. On the day of the test, there would be no cause for worry. Never mind if you're not prepared enough. You cannot ever be *fully prepared* for life. Whatever you have done throughout the year, wherever you stand now as a result – just do your best from that spot. That's your measure as a student. The rest is trivial – it doesn't count.

And that's what I wrote in the notebook.

If you are trapped in a system that trades your freedom to buy you mere passage through life; if in the name of exams you are subjected to physical strain and mental abuse for year after year; – if your natural process of growth has been institutionally mechanized and rebranded as a kind of WAR – then you need to treat all of it with the same disdain they had for you. You shouldn't have to burn yourself up for this. Any person that asks you to sacrifice your wings just to be allowed out of the cage is full of bosh. Keep your wings, and do everything you can to give yourself the best chance at escaping the bars, and let go.

If you have been honest to yourself, if you have done *your* personal best, then you have the right to expect the world to recognize that. There are plenty of well-wishers and do-gooders standing by the lines, piling their burdens of expectation on your backs. Hold your head high and tell them – *'I have done whatever I can... and if that's not good enough…* then **so be it.'**

2

It has been admitted by better people before, and I will admit it yet again over here – teaching is a nasty business.

First of all, there is the fallacy you will walk into – and if you are unlucky like most teachers – never walk out of – the misconception that you actually teach anything.

No one teaches anyone anything. One day we were sitting in the classroom with the windows shut closed, because it was winter and we wanted to keep the chilly wind out. It was a chemistry period. Our chemistry teacher was Bishnupada Karan, a young man whose passion for his subject was only matched by his enthusiasm for sharing his knowledge and fascination of chemistry with all of us. Karan-da was something out of a Narayan Sanyal novel – a fervent romancer of everything chemistry, a teacher born, a student in his very bones. We did not understand 50% of the stuff he told us in the class. Teaching a class of 10th graders he veered off into university-level discussions about oxides and peroxides and their numerous types and whatnots, while we might not understand the stuff but took down the notes anyway. The subject was not necessarily made more intelligible to every one of us, but it was Karan-da's exceptional zeal that made us love his classes.

That day Karan-da walked in, swept up to the table and put down his chalks on

it (he carried two chalks to every lecture, and exhausted them during the course of the period), and yelled out an order to open up the windows. We did not want to; someone in the class said (in distilled Bangla), "But sir, cold is coming!" Without a moment's hesitation, Karan-da replied, "Your statement is thermodynamically incorrect – cold doesn't come anywhere – *heat leaves*!" – Those, indeed, were the days.

Our little fallacy about teaching is akin to this. No one ever really teaches. All that takes place is learning. You don't impart anything to anyone. A person is always absorbing stuff from his surroundings, picking up signals and storing away memories constantly, – round the clock, – all the time. If you want a person to learn something specific you have on your mind, what you can do is to place that thing in their vicinity, and hope they pick it up and put it away somewhere inside of their mind. You want them to pick up a whole lot of things, you've got to scatter a whole lot of things all around them and hope a percentage of all that goes in. If teachers remembered this, there wouldn't have been so much stupid frustration about 'the students not remembering half the things that were taught.' How about you remember this thing, Mr. Educator - nothing was taught. If they did not buy what you were selling, maybe your ware just wasn't good enough, or you were selling it to the wrong customers. Why go selling flowers in a fish market, or fish in a flower mart?

(There, of course, we arrive at the problem underneath it all. Our schooling insists that children buy fish, flowers and other variously fragrant thingummies right from the same shop, and put them all right in the same basket all at the same time. All of them, buying all the things. It's less like a buffet feast and more like a lunch queue in a prison.)

Then there's the idea that some of the more idealistic ones among us sometimes get, – that we should try to give them as much as possible.

This one is tricky, because, at the bottom of it all, there's love and genuine concern for the students that make a teacher think this way. The teacher will work their hairline off, try every possible angle, use every trick in the bag to load as much software into the children as they can, trying to make them as enabled and empowered as they can, getting them to the best possible place and prepping them as completely as possible for all the weird vagaries of life. It is like that part in the film *The Matrix*, where Tank is loading programs onto Neo's brain and Neo has been taking it for 'ten hours straight.' – The dedicated teacher, in their eagerness, always desires the students to be like Neo. They always fantasize that what they are serving the kids with so much hard work, so much meticulous care will be guzzled up by hungry mouths like they deserve to be. — But in reality that is hardly ever the case.

Kids who are learners will learn at their own pace, in their own time. They have

their own moods, likes and dislikes, times that are right and times that are wrong. Think of your favourite singer, and ask yourself if you can listen to his or her songs at any given moment, or continuously all the time. If you are a normal person, you cannot. Likewise, even if you are really serving something that is heartfelt, masterful, and very, very important, there's no guarantee that the kid there is ready to receive *that* thing – at *that* moment – in the *exact same way* you want them to receive it.

You'll need to be a Dumbledore among teachers, to remember all that. Being a Dumbledore isn't easy. – But maybe we should try. We should learn that we are putting paper boats on the water, and we cannot demand to know where they all go, or even that they all keep going on. Some of them get stuck. Some of them get soaked and drown. Some of them, maybe, didn't even want to be a boat in the first place. Maybe they wanted to be a paper plane or something. Anything but a boat. Possible, isn't it?

You want your kids to pay attention and learn up, because you think you have this job to do. If you are a scoundrel who's in the job for money and status and such petty loot, then to you the job means to complete the syllabus, do the paperwork and get them promoted. If you are a simpleton who's in the job for idealism and things that spring from idealism, like love and humanity and visions for the future, then to you the job means to expand their horizons, strengthen their minds and grow them into good human beings. — Either way, just because you need to get your job done does not mean the students have to be getting out their way for you. You are not doing this for them; you are doing it for yourself because you tell yourself that you have to do it. If those on the receiving end don't respect that, well, forget them and call them a fool, but you can't hold it against them as if they denied you your due.

Remember the classics. Let over the doors of every school and every classroom be inscribed these words for every 'teacher' to read as they enter the school –*"Behold, a sower went out to sow."* – Not all will get it, but it was not spoken for all; only for those who have ears to hear.

So what should we do? What should we do, now that we simpletons have forsaken the juicy cups and come to the stony fields to sow? Shall we not throw ourselves into it, heart and soul? Coming to the sea, shall we now merely stand on the sand?

I guess the wise Anatole France had an answer as good as any…

Do not try to satisfy your vanity by teaching a great many things. Awaken people's curiosity. It is enough to open minds; do not overload them. Put there just a spark. If there is some good inflammable stuff, it will catch fire.

The author is presently a Teacher of English at Vidyapith

The Letters of Swami Vivekananda: The Panacea of Modern Indian Society

Chandrachur Lahiri (2011)

The nineteenth century was the feturaterram (breeding ground) of powerful revolutions across the world. Be it the Industrial Revolution on the socio-economical front or the Revolution of 1848 on the socio-cultural front or be it the Wars of Independence that broke out in nations like Greece, Belgium, Mexico and India to name a few. However, there occurred notable intellectual revolutions too in this century that changed people's views on life forever. Darwin's theory on the Origin of Species by Means of Natural Selection made it necessary "for a vast intellectual revolution of which religious reformation was rather a sign than a cause". Thus when the West was undergoing such a change, it was time for the Orient to rise from the slumber of ignorance. And this awakening or revolution was initiated by the bold sannyasin, Vivekananda.

Born in 1863, who could have guessed, that NarendraNath Dutta was really going to be the "Nara"-"Indra", the "Chief of men"[1] and that he would be the greatest philosopher and visionary of modern India? His ideas, presented through his discourses, lectures and letters were a remedy, and more specifically a "panacea" to every social problem his country faced and would be facing in the years to come. His letters written to his disciples, brother monks and well-wishers were a mere reflection of his mind. They dealt with a wide variety of issues, from casteism to education; from "Harmony of religion" to the "upliftment of women". His ideas and philosophy were supported by relevant allusions from the Vedas and the Upanishads. Thus today, after 150 years of his birth, he lives in his letters. Today when the world is undergoing rapid changes in the social sphere, India is still stagnant with hersocial problems and issues. So in this context, my objective in this paper is to get back to the letters of Swami Vivekananda and try to find their relevance with respect to the social problems that India is facing now. I will try to focus on three significant issues: education, caste discrimination and the position of women.

Education

The current scenario of education in modern India is admirable with all its statistics. There is a big boom in the literacy rate: from 18.3% in 1950-1951 to 74.04% in 2010-2011. The country has been trying to increase this growth by implementing several policies like "Sarba Siksha Abhiyan", to name one. There has been positive growth,

but a close study reveals this upsurge in literacy is mainly city-centred. The drop-out cases are worse. 52.76% of the total number of students of India drop out of school between the age of (6-14 years). However, the main problem, in this case, remains the same as that which Swamiji identified long back: poverty. The greater mass of the Indian population is poor. In his letter to the Maharaja of Mysore he writes:

The one thing that is at the root of all evils in India is the condition of the poor...Supposing [Please check the quotation] even your highness opens a free school in every village, still, it would do no good, for the poverty in India is such, that the poor boys would rather go to help their father in the fields, or otherwise try to make a living than come to school.

And the solution to this problem was offered by him,

Now if the mountain does not come to Mohammad, Mohammad must go to the mountain. If the poor boy cannot come to education, education must go to him. There are thousands of single-minded self-sacrificing sannyasins in our country going from village to village, teaching religion. If some of them can be organised as teachers of secular things also... they can teach a great deal of astronomy and geography to the ignorant. By telling stories about different nations, they can give the poor a hundred times more information through the ear than they can get in a lifetime through books. This requires an organisation, which again means money. There are enough men to work out this plan in India, but alas! They have no money. It is very difficult to set a wheel in motion, but when once set, it goes on with increasing velocity.[2]

Today taking a cue from these words of Swamiji, many NGOs are rendering door-to-door education in the underdeveloped areas of the country. Significantly Ramakrishna Mission has done a commendable job in this sphere with its programmes like "Lok Siksha Parishad" and "Mobile Education Van Service" in the villages across India and has yielded results. But more work is to be done and the government too can work upon these ideas more intensely.

Caste Discrimination

Caste discrimination is another great disease running through the veins of Indian Society. Today more than 165 million people in India continue to be subjected to discrimination, exploitation and violence. The issue of caste dominates housing, marriage, employment and general social interaction. The Government is somewhat negligent of the fact for obvious reasons. India's report on this issue was submitted after eight years of its due date to The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), a body of independent experts responsible for monitoring the state's compliance with the International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination. India ratified the convention in 1968. However, the report which India sent did not consist of a single mention of abuses against Dalits – abuses that India's own governmental agencies here documented and verified. There is a huge number of such cases and reports of honour killing due to inter-

caste marriage. According to statistics from the United Nations, one in five cases of honour killing internationally every year is reported from India.

Now this problem arises from one of the prejudiced beliefs prevalent in Indian society that the caste system is hereditary. Swami Vivekananda was gravely concerned over the matter. He never believed that the caste system was hereditary and throughout his life, he has freely mixed with the so-called backward classes equally. In one of his letters to Pramadadas Mitra, he asks him, "The doctrine of caste in the Purusha-Sukta of the Vedas does not make it hereditary so what are those instances in the Vedas where caste has been made a matter of hereditary transmission?" In his next letter to the same person a few days after later he writes:

I have no doubt that according to the ancient view in this country, caste was hereditary and it can't also be doubted that sometimes, the Shudras used to be oppressed more than the helots among the Spartans or the Negros among the Americans. He goes on to say, "I know it is a social law and based on diversity of guna (merit) and karma (the result of past action). It also means grave harm if one bent on going beyond guna and karma cherishes in mind any caste distinction.

In another letter to AlasingaPerumal Swamiji writes,

Caste is simply a crystallized social institution, which after doing its service is now filling the atmosphere of India with its stench and it can only be removed by giving back to the people their lost social individuality...

Every man born here (America) knows that he is a man. Every man, born in India knows that he is a slave of the society.[3]

Vivekananda strongly believed that in this capitalistic world only competition for survival will remove this casteism and for healthy competition, there should be an equal opportunity and nothing else. Swamiji's vision was that India will would rise from the cottage of the downtrodden and the ignorant. He was probably unaware of the fact that by then someone had already been born in a small village of Madhyapradesh and would be the maker of a new India and will be drafting the constitution of the world's largest democracy.

Position of Women

The position of women in Indian society is in a state of constant flux throughout the ages. From sharing equal status with their counterparts in the Vedic era through the low points in the medieval period to the movements for equal rights by many reformers, the history of women in India has been eventful. It is a matter of utter shame and disgust that a country which once offered the highest designation to a woman is now but a mute spectator in the face of atrocities such as rampant gender inequality and physical abuse of the highest degree.

It is a matter of grave concern that the National Crime Records Bureau reported in 1998 that by 2010 growth in the rate of crime against women would exceed the population growth rate. Another report published by UNICEF in 2014 states

that about 240 million girls in our country are victims of child marriage. Swamiji identified this problem as one of the major problems of India that would hamper its growth. He felt great pain in seeing the wretched condition of women of our country. After comparing both the society the two societies, the Indian and the American, his introspection led him to a conclusion. In a letter to Haripada Mitra, he writes,

...[H]ow pure and chaste are they here! Few women are married before twenty or twenty-five and they are as free as birds in the air. They go to the market, school, and college, earn money and do all kinds of work. Those who are well-to-do devote themselves to doing good to the poor. And what are we doing? We are very regular in marrying our girls at eleven years of age lest they should become corrupt and immoral. What does our Manu enjoin? Daughters should be supported and educated with as much care and attention as sons. As sons should be married up to the thirtieth year, daughters must also observe Brahmacharya and be educated by their parents. But what we actually are doing? Can you better the condition of your women? Then there will be hope for your well-being. Otherwise, you will remain as backward as you are now.[4]

Swamiji always raised his voice against gender inequalities.In one of his letters to Swami Ramakrishna-nanda he quotes from the Shvetashvatara Upanishad "Bang streepumanasitvang kumara utwakumari". "Thou are the women, thou are the men, thou are the boy and the girl as well." "We want men and women. There is no distinction of sex in the soul".[5]

Thus we get a clear idea that he always wanted an unbiased society free from gender inequality. And we should thus keep in our mind clearly that society may never evolve without equal participation of women. Today we have women's reservation bill passed in 2010 with 33% reservation for women candidates in the parliament. The Central, as well as the State Government is trying to work on this issue. It is to be noted that the "Kanyashri" project of the Government of West Bengal has been widely acclaimed internationally. But we need to do more, driven by the vision of Vivekananda.

Today, it is a matter of great shame to us that Swamiji with all his works and philosophy and plan for his country is still identified as a mere "Hindu monk". But he was more of a social reformer than a religious reformer. He clearly stated this fact in a letter to the youth of Madras:

Caste or no caste, creed or no creed, any man, or class, or caste, or nation, or institution which bars the power of free thought and action of an individual– even so long as that power does not injure others-is devilish and must go down.[6]

Thus there is a pressing need to rise above our prejudiced beliefs and go through his works putting aside any religious dogmas.

I must say that only reading his letters, lectures and complete works won't be of much help if we do not put them into practice. He dreamt of an awakened India. He hoped that some heroic soul would arise some time or other in India, far abler

than himself and complete his work. Probably that is what he meant when this great man said,

If there were another Vivekananda, he would have understood what Vivekananda has done! And yet, how many Vivekanandas shall be born in time!.[7]

We should remember his words from his letter to J.J. Goodwin:

"A good world ", "a happy world" and social progress are all terms equally intelligible with "hot ice" or "dark light". If it were good it would not be the world".

It is but natural that there will be problems in society and time and again we have stood up to face them against all odds and set the wheel of development in the Indian society running, only this time let Swami Vivekananda be our light.

Note: Excerpts from the letters are taken from Swami Vivekananda, The Letters of Swami Vivekananda Advaita Ashrama, 2013. [8]

1. Letter 32, pp75
2. Letter 48, p. 118.
3. Letter 24, p. 55.
4. Letter 26, p. 61.
5. Letter 46, p. 112.
6. Letter 27, p. 63.
7. "Last Days of Swami Vivekananda ", Write Spirit, 2022, https://www.writespirit.net/last-days-of-swami-vivekananda/. Accessed on 05.10.2022.
8. Tapasyananda, Swami. Letters of Swami Vivekananda. First, 23rd reprint (Kolkata:AdvaitaAshrama, 1940).

The author is practcing Law in The Calcutta High Court.

Awards and Achievements of Alumni:
November 2019 to September 2022

1. Alokenath Dey. Batch 1978. Awarded with Tech Leader of the Year (ASSOCHAM 2019), Alexander Graham Bell Prize (Canada) (2019), IDC Insights Award and NASSCOM AI Game Changer award (2018).
2. Ashoktaru Sengupta. Batch 1978. Awarded with Certificate of Appreciation by Mankind Pharma for outstanding efforts during Corona Pandemic as physician.
3. Kalyan Kumar Coari. Batch 1979. Appointed as Director (Finance) of Braithwaite Co Ltd
4. Arup Kundu. Batch 1979 Appointed as Executive Director of Life Insurance Corporation of India
5. Indranil Hazra. Batch 1981. Appointed as Secretary, Chennai Port in charge of General Administration.
6. Tapas Kumar Mahato. Batch 1981. Awarded with Shikshashree Award by Govt. of West Bengal.
7. Abhijit Bishayee. Batch 1984. Received the prestigious Industry Outlook Magazine award for Renewable Energy start ups.
8. Ashoktaru Chattopadhyay. Batch 1986. Appointed as President Sandvik SRP (India Pacific).
9. Sasankasekhar Mandal. Batch 1987. Received the award of The Best Paper on Construction Techniques published in the Journal of Indian Concrete Institute.
10. Subrata Chowdhury. Batch 1987. Appointed as Independent Director of PSU Giant, the Neveyli Lignite Coal India Ltd.
11. Arijit Ghosh. Batch 1996. Promoted as Professor of Pharmacology, Malda Medical College.
12. Tias Thakur. Batch 1996. Received 'Devotion to Duty Medal' of Indian Navy.
13. Richik Nandi. Batch 1996. His Tech Solutions Start up named Poshvine has been acquired by Razorpay.
14. Abhinav Parashar. Batch 2011. Selected in Bihar Public Service Commission with 19th rank and joined in Bihar Police Service

SIBRE

Sure to be Safe

SIBRE - the world of industrial brakes and crane components

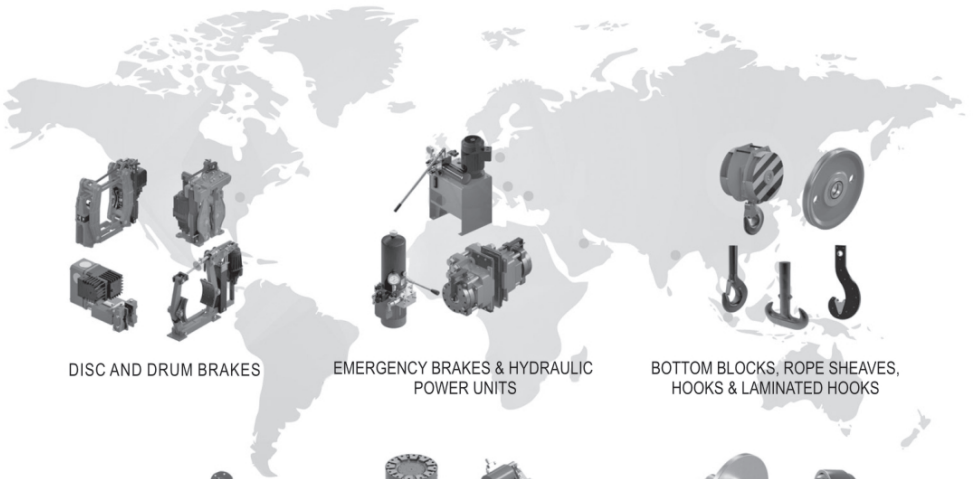

DISC AND DRUM BRAKES

EMERGENCY BRAKES & HYDRAULIC POWER UNITS

BOTTOM BLOCKS, ROPE SHEAVES, HOOKS & LAMINATED HOOKS

DRUM COUPLINGS, CARDAN SHAFTS, GEAR COUPLINGS THRUSTERS

STORM BRAKES

COUPLINGS WITH DISC OR DRUM

INDUSTRIAL REFRIGERATORS BY TMS

BUFFERS

WHEELS, LCWS & ROLLER GUIDES

SIBRE Brakes India Pvt. Ltd.

7- A 2/5, Sarat Bose road, "Sukh Sagar" 7th Floor, Kolkata 700 020, India

Phone: +91 33 2485 1566 | Mobile: +91 93316 63636 | Email: info@sibre.in

Website: www.sibre.co.in

1972 batch celebrating Golden Jubilee of passing out

1997 batch celebrating Silver Jubilee of passing out

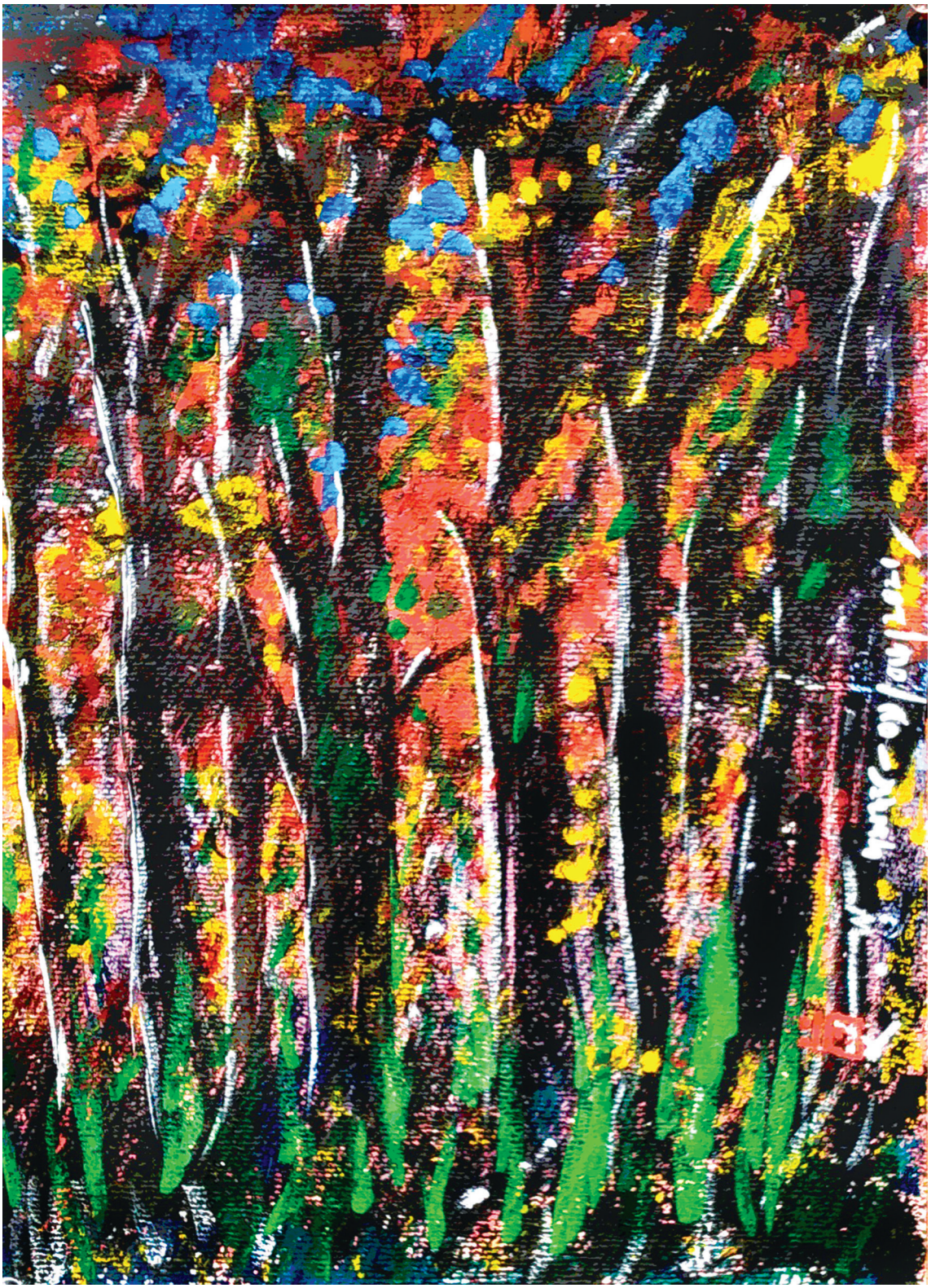

Jayanta Bhattacharya, 1971

Photo : Dipankar Sen, 1970

Dipanjan Mandal, 1989

প্রয়াণলেখ

শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

আমার জীবনের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে শুধু তোমারই আনাগোনা। গুরুপল্লীর ধূসর পাথুরে রাস্তায় তুমি একদিন হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছিলে। সেই ছোটবেলা থেকেই তুমি আমার স্মৃতি-মন্দিরে বিরাজমান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল তোমার। সেই বিশ্বাসই একদিন ক্ষুদ্র শ্যামল চ্যাটার্জিকে বৃহৎ আমি-তে পরিণত করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের জীবন ও দর্শন এনে দিয়েছিল সকলের প্রতি সমভাব। বাবা বিশ্বাস করতেন মানুষ একটি দ্বিপদী প্রাণী ব্যতীত কিছুই নয়, যতক্ষণ না তার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।

বাবা কেমন করে বিদ্যাপীঠে এলেন? শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময়ানন্দজী কলকাতা থেকে ট্রেনে আসছেন। বাবা তখন তরুণ যুবক, বয়স ২১, এম.এ. পরীক্ষার্থী। মহারাজের পছন্দ হল বাবাকে। একটা সিগারেটের খাপে তৎকালীন হেডমাস্টার ধীরেন মহারাজকে লিখলেন— "এটাই ছেলেটির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার জেনো। তুমি ছেলেটিকে নিয়ে নিও। ছেলেটি একটি জুয়েল।" সাল ১৯৫৯। সেদিন থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত শুধু ভালোবাসা দিয়েই ছাত্রদের হৃদয়ের মণিকোঠার অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রতি ছাত্রের ব্যক্তিজীবনের সমস্যার খোঁজ রাখতেন। বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, এ হল শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার একটা অন্যতম ধাপ।

ক্লাসরুমে ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত কেতাদুরস্ত। তাঁর ইংরাজী উচ্চারণ ছিল ছাত্রদের কাছে অনুকরণীয়। বিদেশি ভাষার ব্যাকরণ অনেকটাই আয়ত্বে এসেছিল ওঁর নিয়মিত অনুশীলনের ফলে। এর পাশাপাশি, তিনি বলতেন, বিদ্যা দদাতি বিনয়ম। আর সেই বিদ্যাকে যিনি বিনয়ে রূপান্তরিত করার পথ দেখান, তিনিই শিক্ষক। বলতেন, নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তোলাই হল শিক্ষা।

আজ জীবনে যদি কোথাও পৌঁছতে পারি, তা বাবারই আশীর্বাদ। আজ তিনি দূরে, বহু দূরে।

'হেথায় চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।'

— ডাঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

প্রয়াণলেখ

কালিদাস গুহঠাকুরতা

বিদ্যাপীঠে আমাদের শিক্ষকমশাইরা ক্লাস নিতেন। আমরা তাঁদের স্যার বলে সম্বোধন করতাম না। দাদা বলে সম্বোধন করতাম। যেমন– ফণীদা, শ্যামলদা ইত্যাদি। আজ যাঁর স্মৃতিচারণ করব তিনি শ্রী কালিদাস গুহঠাকরতা আমার বাবা। একবার ক্লাস সেভেনে বাংলা মিডিয়ামে অজয়দার অনুপস্থিতিতে বাবা ক্লাস নিতে এলেন। বিদ্যাপীঠের রীতি অনুযায়ী আমার কালিদাসদা বলে সম্বোধন করার কথা; কিন্তু বাবাকে কি আর দাদা বলা যায়? আমি পড়লাম ধর্মসঙ্কটে। কিন্তু ক্লাসে এত হাসিঠাটা আর মজা হল যে আমার সঙ্কট কেটে গেল। জীবন-বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে বাবার বেশ সুনাম ছিল। ক্লাসে এতো সহজ সরলভাবে জটিল বিষয় মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার কুশলতা দেখলাম। জীবনের আসল বিজ্ঞানটাই তো হাসিঠাট্টা বা গল্পচ্ছলে সহজভাবে জীবন কাটানো। এই বোধ বাবার মধ্যে সবসময় কাজ করত। তাই কালিদাস গুহঠাকুরতা মানেই অফুরন্ত এনার্জিতে ভরপুর এক প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজে খুশিতে থাকেন আর তাঁর ছাত্র বা সহকর্মীদের প্রাণবন্ত রাখেন। পোশাক পরিচ্ছদের দিক থেকেও তিনি সবসময় ধোপদুরস্ত। পরিচ্ছন্ন সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিও যেমন পরতেন তেমনি কোট-টাই পরেও তাকে বেশ মানাত।

শুধু নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ ফিটফাট এমনটা নয়। জীবন-বিজ্ঞান বা Life science Department-এর ল্যাবরেটরিতেও ছিল একই ছবি। কতো জীবজন্তু আর গাছপালার specimen সুন্দরভাবে সারিবদ্ধভাবে বোতলে রাখা থাকত; যা দেখে ছাত্ররা আকর্ষিত হত।

প্রতি বছর Annual Exhibition-এ Life Science Department-এর প্রতি সবার থাকত বাড়তি আকর্ষণ। মাটি দিয়ে human evolution-এর মডেল বা ইলেক্ট্রিকের তারের টুকরো দিয়ে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মডেল, ব্লাড গ্রুপ টেস্ট সবার নজর কাড়ত। তাই পরপর তিন বছর Life Science Department প্রথম হয়েছিল।

বিদ্যাপীঠের রজত জয়ন্তী বর্ষে পরিকল্পনা করা হয় একটি সুন্দর গোলাপ বাগানের। সারদা মন্দিরের সামনে পিচ রাস্তার ধারে যে ত্রিকোণ জায়গাটুকু ফাঁকা আছে সেখানেই বাগান বানাতে হবে। সেক্রেটারী মহারাজ স্বামী উমানন্দ ডাকলেন কালিদাসবাবু আর অমিয়বাবুকে। ঠিক হল এক বছরের মধ্যে গোলাপ বাগান তৈরী করতে হবে। দুজনে ছুটলেন মিহিজামে গোলাপ চারা আনতে। পুরুলিয়ার শক্ত পাথুরে মাটিতে গর্ত করে সার দিয়ে গোলাপ চারা লাগানো হল। তারপর শীতকালে bud grafting করে নানান নামীদামী, রঙবাহারী গোলাপ ফোটানোর মেহনত চলতে থাকল। সিলভার জুবিলির আগেই গোলাপ গাছে ফুল

ফুটল। লাল, সাদা, গোলাপী, হলুদ, কমলা কত রঙের সব ফুল, কি সুন্দর তার রূপ আর নাম। Alexred, Forget me not, Floribanda, Christian dior, Peace, Tajmahal, American heritage আরো কতো কি। ফুলের রঙ আর সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। আবার একই গাছে ফুটেছে লাল, সাদা হলুদ রঙের গোলাপ। এই কাজের পেছনে কতো পরিশ্রম, কতো নিষ্ঠা, একনাগাড়ে লেগে থাকা, সবটুকু আমি খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম যা পরবর্তীকালে নিজের জীবনে শিখেছি।

মাইক্রোস্কোপ ছোটো জিনিষকে বড় দেখায়, কিন্তু সেখানে চোখ রেখে দেখতে হয়। বাবার মাথায় এলো কিভাবে এই ছবি বড় করে প্রোজেক্টরের মতো দেওয়ালে ফেলে দেখানো যায়। লেগে পড়লেন যন্ত্র বানাতে। তার খুব অল্প সময়ের মধ্যে বানিয়ে ফেললেন মাইক্রোপ্রোজেক্টর। ছাত্ররা জাইলেম বা ফ্লোয়েম থেকে শুরু করে ভাইরাসের গঠন বড় আকারে দেওয়ালে এই যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে পেল, তাদের জীবন বিজ্ঞান বোঝাটা সহজ হতে শুরু করল।

বরিশালের বানারিপাড়া থেকে দেশ ভাগের সময় ছিন্নমূল হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন আমার দাদু নিশিকান্ত গুহঠাকুরতা। তাঁরই একমাত্র পুত্র কালিদাস গুহঠাকুরতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বোটানিতে স্নাতক হন। তাই গাছপালার প্রতি ছিল তাঁর ভালোবাসা।

গুরুপল্লীতে আমাদের কোয়ার্টারের সামনে ও পিছনে একফালি করে জমি ছিল। বাবা সেই মাটিতেই বিভিন্ন ঋতুতে কতো সবজী ফলাতেন। কুমড়ো, ঝিঙে, কপি, বরবটি, সীম, মটরশুটি, পালং, টমেটো, ধনে, লঙ্কা, গাজর, মূলো, বিন, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি প্রায় সবধরণের সবজি হত। আর ছিল ফলের গাছ — পেয়ারা, আম, কলা, সফেদা, আনারস, কাঁঠাল, আতা, কমলালেবু সব নিজের হাতে লাগিয়ে ফল ফলিয়েছিলেন।

মাছ ধরাতেও বাবা ছিলেন দক্ষ। বড়শি দিয়ে কত তাড়াতাড়ি আর সহজে মাছ ধরা যায় আমি দেখেছিলাম। হাঙর মাছের গুঁড়ো চার হিসাবে ছড়িয়ে দিয়ে তগি দিয়ে একসাথে তিন-চারটে মাছ ধরতে দেখেছি।

ছোটোবেলায় দেখতাম সব মায়েদেরকেই রান্নাঘরে রান্না করতে। কিন্তু আমার বাবাও রান্নাঘরে ঢুকতেন আর শখ করে রবিবার মাংস রান্না করতেন। আমাদের জন্মদিনে পায়েস আর কেক বানাতেন। রান্নার প্রতি বাবার একটা আকর্ষণ ছিল এবং খুব ভাল রান্নাও করতে পারতেন। শুধু রান্না নয়: খেতেও খুব ভালবাসতেন শুকতো, ডাল, বিভিন্ন রকমের মাছ, মাংস সবরকমের খাবারই ভালবাসতেন। খেয়ে এবং খাইয়ে আনন্দ পেতেন।

ছাত্রদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। জীবন-বিজ্ঞান বিষয়ে প্রায় সব ছাত্রই লেটার পাওয়ার চেষ্টা করত এবং মাধ্যমিকে অনেক ছাত্রই লেটার পেত। আজ সেইসব ছাত্ররা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তাদের স্মৃতিতে বিদ্যাপীঠের মাস্টারমশাই কালিদাসদা সেই একইরকম প্রাণোচ্ছলভাবে বেঁচে আছেন বা থাকবেন। যদিও তিনি ২০২০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেছেন কিন্তু অসংখ্য ছাত্রের হৃদয়ে তিনি আজও বেঁচে আছেন।

— দেবাংশু গুহঠাকুরতা

Obituary

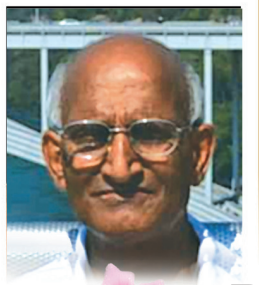

Dayakar Jha

We are extremely saddened to learn about the passing away of our beloved teacher DayakarJha on the26th of March, 2022. An extremely lively and energetic teacher,Dayakarda enlightened several batches of students of the Vidyapith with his profound knowledge of the subject of Hindi. An avid cricket enthusiast,he used to update his students with the latest scores in important matches.

Born on the14th ofNovember, 1941 Dayakarda had completed his school education from Watson High School in Madhubani(Bihar); after whichthat he had attended the Ramakrishna College in Madhubani. He,thereafter, Consequently he joinedenrolled himself in the Calcutta College of Arts and Commerce under Calcutta University to complete his education.

After completing his education, Dayakarda served at the Ramakrishna Mission,Narendrapur for one year(1967-1968) before joining Ramakrishna Mission Vidyapith,Puruliawhereandherendered his services as a permanent teacher at Vidyapithtilluntil his retirement.

Late Dayakarda is survived by his wife, two daughters,two sons and six grandchildren.May Thakur,Ma and Swamiji grant eternal peace to the departed soul.

Shib Shankar Chatterjee

It was my first week at Vidyapith. I was strolling outside Sivananda Sadan before play-time in the evening when our music teacher, Sabyasachi da, called me from a distance. I walked nervously, trying to make up an answer on why I was loitering needlessly.

"Do you know the meaning of Sabyasachi, dear?", he asked.

"Yes, I know", I replied, 'Is this a GK test?

"So tell me who is the Sabyasachi of Vidyapith?"

Secretary Maharaj seemed to be the safest answer to me. I started mumbling. But Sabyasachi da didn't wait for it. "It is your dadu, Shibu Da. You don't get a teacher these days who can teach Maths and English with the same pedigree. Shibu Da is the one and only Sabyasachi here. You are lucky to have him as your grandfather, my boy".

I smiled, felt proud and ran away to the football ground of IV-E.

Truly enough, I realized much later that these two subjects were diametrically opposite in nature. And I have not seen another teacher having a similar hold across both English and Maths. That is Shibu Da for all of you!

Clad in his pristine white dhuti-punjabi, my dadu was everything that a student would like his ideal teacher to be. Towering personality, enjoyable classes, beautiful handwriting and impeccable command over his subjects distinguished him. So many ex-students have shared with me the anecdotes on his classes where complicated geometry and trigonometry concepts became simple, and English Grammar became painless. I came to know from my seniors also about his thespian capabilities and a memorable portrayal of his role of Chandragupta in the teachers' dramatic of the same title by playwright D. L. Ray, while veteran Durgapada Bhattacharya da displayed his dramatic best as Chanakya.

But beyond Maths and English, students used to wait for the opportunity to get a story-telling session from him! I reckon those were the most captivating classes ever! His voice modulation while telling stories was a thing to learn! Not to mention his stock of unlimited stories!

For me and so many others, dadu was more than a teacher. He was an inspirational figure, an affectionate mentor, a guide who shaped lives. Today he has left his mortal soul, but his legacy lives with each of us.

My pranaam!

Kohinoor Banerjee

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় গত ১৫ মে ২০২১ প্রবল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বোলপুরে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছিলেন। বিদ্যাপীঠের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা, নাট্যাভিনয়, বিতর্কসভা ও ইংরাজি বক্তৃতায়, বিদ্যাপীঠ পত্রিকা ও বুলেটিন প্রকাশনায় তাঁর অবাধ গতায়াত ছিল। প্রস্তুত না হয়ে কোনোদিন তিনি ছাত্রদের পড়ানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতেন না। তাঁর সময়ের ছাত্রদের কাছে বিষয়টি অবিদিত ছিল না।

নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের কৃতী প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। ১৯৭০ দশকের শেষপর্বে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ ছেড়ে নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদে যোগদান করেন। তবু পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সঙ্গে তাঁর মনের সম্পর্ক কোনোদিন ছিন্ন হয়নি।

মজলিশী আড্ডায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কিছুটা আবেগপ্রবণ মানুষ হলেও তাঁর হাসি খুশি স্বভাব ছাত্রসমাজ ও সহকর্মীদের মধ্যে তাঁকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে দিত।

Indubikas Das

Indubikas Das was born on 01.05.1934 at the Haridaspur village of Tamluk Sub-division, Purba Medinipur. He passed the Matriculation from the Paramanandapur Jagannath Institution in 1949 and Intermediate (Science) in Agriculture from the Jhargram Agricultural College in 1951. He obtained B.Sc. in Agriculture with distinction from the Jhargram Agricultural College under the University of Calcutta in 1953. He joined as Block Agriculture Development Officer and later on promoted to the Sub divisional Agriculture Officer of the Govt. of West Bengal. He also served under the Govt. of Andaman & Nicobar. Yet he had an affinity to the teaching profession. Inspired by the philosophy of Ramakrishna Math and Mission, he joined as a teacher of Agriculture stream at the Ramakrishna Mission Vidyapith Purulia in the year 1965 and served up till 1994. He wrote a series of popular articles in Bengali monthly magazine 'Masik Basumati' on various plants and herbs. In 1968 he published a book titled 'Puspabichitra'. The book comprises of concise scientific information on commonly available flowers along with their citations in different Hindu mythology and Bengali literature. He had a hobby of painting. Between 1975-1992, his paintings were exhibited thrice in the Academy of Fine Arts, Kolkata. Indubikas Das passed away on 24.12.2020 at the age of 86 years.

প্রয়াণলেখ

সুরেন্দ্রনাথ দাস

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে সিঙ্গুরের প্রত্যন্ত গ্রাম গোবিন্দপুরে জন্ম। স্কুলজীবন কেটেছে সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে ব্যান্ডেল আইটিআই থেকে মেশিনিস্ট ট্রেডে ক্রেডিট মার্কস নিয়ে পাশ করেন ১৯৬৫ সালে। ওই বছরেই পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের ওয়ার্কশপ ইন্সট্রাক্টর পদে নিযুক্ত হন।

ফুটবলপ্রিয় সুরেনদা প্রথম জীবনে শিবানন্দ সদনে ছোটদের ওয়ার্ডেন ছিলেন। ভূতেশানন্দজীর দীক্ষিত মানুষটি শিক্ষকমহলে ডক্টর দাস নামেই জনপ্রিয় ছিলেন অনর্গল ইংরেজিতে হাসি-ঠাট্টা করার জন্য। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি থেকে হায়ার সেকেন্ডারিতে টেকনিক্যাল ট্রেড উঠে যাওয়ার কারণে পরবর্তীকালে ওয়ার্ক এডুকেশন ক্লাসের গার্ডেনিং ইন্সট্রাক্টর ছিলেন। অসম্ভব বাগান-পাগল মানুষটি গুরুপল্লীতে তাঁর কোয়ার্টারে সবজি থেকে শুরু করে শখের ফুলের বাগানও তৈরি করেছেন। এই কাজে সহধর্মিণী রেখা দাস তাঁকে খুব সাহায্য করতেন। একসময় বিদ্যাপীঠের বয়েজ স্টোরের স্টোরকীপার হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০০৩ সালে তাঁর কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি।

অবসর জীবন কাটিয়েছেন গোবিন্দপুর গ্রামেই। ২০২০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে দশটায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুরেনদা রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন। বিদ্যাপীঠের নিরলস শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে তাঁর নাম চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রয়াণলেখ

শ্যামাপদ মোদক

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে কারিগরি শিক্ষা বা টেকনিক্যাল এডুকেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরে তারই পরাকাষ্ঠা। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠেও টেকনিক্যাল বা কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ছিল সূচনাপর্ব থেকেই। পুরনো এগারো ক্লাসের উচ্চমাধ্যমিকের যুগে বিজ্ঞান, কলা বিভাগের পাশাপাশি আমাদের বিদ্যাপীঠের ফাইন আর্টস এবং টেকনিক্যাল বিভাগের ফলাফল সারা পশ্চিম বাংলার ভেতরেই ঔজ্বল্যে স্বমহিম।

১৯৭৬ সাল থেকে যখন বিদ্যাপীঠে দশ ক্লাসের মাধ্যমিক শুরু হল, তখন এই বহুবিচিত্র টেকনিক্যাল বিভাগগুলি ওয়ার্ক এডুকেশন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হল। এর ভিতরে সিরামিক্স বা মৃৎশিল্প, উড ওয়ার্ক, বুক বাইন্ডিং যেমন ছিল, তেমনি ছিল টেলরিং বা দর্জিবিদ্যা।

এই টেলরিং বিভাগের কর্ণধার ছিলেন শ্যামাপদ মোদক-দা। সম্প্রতি চলে গেলেন। গত তিন বছরের অভূতপূর্ব মৃত্যু মিছিলে আরও এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। সিংহাবলোকনে মনে পড়ে একশো বছর আগে 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' নামের সেই যুগান্তকারী কবিতার বইয়ে লেখা টি এস এলিয়টেরই লাইন, 'I had not thought death had undone so many'...

শ্যামাপদ মোদক-দার জন্ম ৩১ মে ১৯৪৬। আজকের ঝাড়খণ্ডের বড়ামে। খুবই তরুণ বয়সে বিদ্যাপীঠে অস্থায়ী টেলরিং টিচার হিসেবে যোগ দেন, ক্রমশ প্রশিক্ষণের পর স্থায়ী (permanent) হন।

তুখোড় হাস্যরসিক, প্রাণবন্ত মানুষ।

নিজেকে নিয়ে রসিকতা করবার মতো বিনয় তাঁর চরিত্রে ছিল। গুরুপল্লিতে নয়, থাকতেন পুরুলিয়া শহরে। শহর থেকে সাইকেলে তাঁর নিত্য আসা-যাওয়া ছিল বিদ্যাপীঠে।

চলে গেলেন ৫ জানুয়ারি, ২০২১, পুরুলিয়াতেই। বিদ্যাপীঠ পরিবারকে আরও খানিকটা রিক্ত করে। ছাত্রকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ওই শিক্ষকের স্মৃতি আমাদের পাথেয় হোক।

প্রয়াণলেখ

মধুসূদন মিত্র

মধুসূদন মিত্র, আমাদের মধুদা ১৯৩৮ সালে পুরুলিয়া জেলার মানবাজার-২ ব্লকের অন্তর্গত বুড়ির বাঁধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে বিহারের বড়ামে (মামার বাড়ি) চলে আসেন। সেখানেই পড়াশোনা চালিয়ে যান। পরে জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ভর্তি হন এবং ম্যাট্রিক পাশ করেন।

চাকরির খুব দরকার ছিল, বোকারো স্টীল প্ল্যান্টে চাকরি পান। মধুদার সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫৮ সালে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তাঁরই নির্দেশে ১৯ বছর বয়সে বিদ্যাপীঠে কাজে যোগ দেন।

সবে তখন বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠছে। মধুদা টাইপিংয়ে খুবই দক্ষ ছিলেন। ইংরেজি ডিকটেশন ততোধিক দ্রুততার সঙ্গে নিতেন। স্বামী রমানন্দজী মহারাজ মধুদার এই দক্ষতার কথা প্রায়ই বলতেন। পূজনীয় হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজকে নানান অনুদান সংগ্রহ বা অন্য কাজে বারে বারে রাইটার্স বা অন্যান্য অফিসে যেতে হতো। সঙ্গে মধুদা থাকতেন কলকাতা থেকে আগত আরকিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসারদের আসা যাওয়া লেগেই থাকতো, অফিসের নানান কাজের সঙ্গে তাঁদের তদারকি করার দায়িত্ব মধুদাই সামলাতেন। এইভাবে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী থেকে শুরু করে স্বামী উমানন্দজী পর্যন্ত অধ্যক্ষদের এক সুদক্ষ সহযোগী ছিলেন মধুদা।

মধুদা বিদ্যাপীঠ পরিচালিত খরাত্রাণে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু শিবিরে ত্রাণ বিতরণে পুষ্করিণী খননে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বিদ্যাপীঠে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী অভিনীত নাটকেও তাঁকে অনেকবার মঞ্চে দেখা গেছে। বিদ্যাপীঠের স্টাডিতে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। সেই সূত্রে ছাত্রদের সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সরকারি ভাবে বিদ্যাপীঠকে সেবা দিয়ে যাওয়ার পরেও উমানন্দজির সঙ্গে আরো চার-পাঁচ বছর সহযোগী ছিলেন অবশেষে ৮৩ বছর বয়সে পুরুলিয়া শহরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ও পনের দিনের মাথায় ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০, বিকেল ৪ টে ৪০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মধুদাকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি ও তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি ।

Supriya Guha
1963

Supriya Guha was the topper of the 1963 batch of Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia.. He was an efficient officer of the Government of West Bengal at the Secretary level. He was a very open hearted person by nature. He kept his friendship alive with Sri Amitabha Dey of his batch and other classmates from RKMVP until death. He is fondly remembered by all his friends who pray for his eternal peace.

Amaresh Gooptu
1965

Having studied Civil Engineering in BE College, Amaresh had a small stint in WS Atkins and Engineers India Ltd .
Then he ventured out on his own. He undertook building bridges, factories and multistoreyed buildings.
The Maidan Metro Station, a landmark was built by him.
He was a Rotarian too.
He is survived by his wife and two daughters.

Aniruddha Guha Roy
1965

Aniruddha joined Bihar Institute of Technology, Sindri after passing out from Vidyapith. Before that he was at Deoghar Vidyapith too.
Then he joined Hindusthan Fertilizer Corporation's Factory in Sindri.
He took Voluntary Retirement and finally settled in Kolkata.
He is survived by his wife and two daughters.

প্রয়াণলেখ

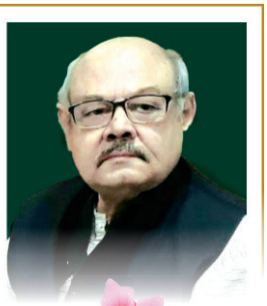

সমর দে
১৯৬৬

একটা স্বীকারোক্তি দিয়ে স্মৃতিকথা শুরু করছি। আমি নিজে আজ পর্যন্ত কোনো লেখা লিখিনি, কিন্তু আজ সত্যি আমার লিখতে ইচ্ছে করছে।

সমরদা-ময় সম্পর্কে পুনর্মিলনের স্মরণিকায় কোন রচনা থাকবে না, এটা আমি ভাবতেই পারি না। এই 'অভ্যুদয়' পত্রিকা সমরদাময়। একবার বাদ দিলে ১৯৮৩ সাল থেকে যতগুলো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটা সংখ্যা সমরদা ছাপিয়েছিলেন। ২০১৯-এ পূজনীয় কালীপদ মহারাজ সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যাটি সৈকতেশ মহারাজের সাহায্য ছাড়া হত না, তাই জ্যোতিদা (১৯৭৩) পুরুলিয়া থেকে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেকটি সংখ্যা সমরদা খুব যত্ন করে ছেপেছিলেন। বলতে গেলে ১৯৮৩ সাল থেকে Alumni Association-এর যত কিছু ছাপা হয়েছে, সে লেটারহেড প্যাড-ই হোক, আমন্ত্রণপত্রই হোক, বিল বই হোক বা Advertisement Form-ই হোক– সবই সমরদার করা। এবং আজ বলতে দ্বিধা নেই, কথা রাখার দায়ও আমার আর নেই – সমরদা ১৯টি Reunion Card-এর জন্য কোনদিন কোনো টাকা নেননি Association-এর কাছ থেকে।

এই লেখাটা লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে হচ্ছে রিইউনিয়নের তারিখ তো ১৯ নভেম্বর, আর আজ ১ নভেম্বর, এত তাড়া কীসের? কোনো বছরের রিইউনিয়ন হয়তো ২০ তারিখ, আমরা Advance Party তার মানে থাকে ১৮ই রাত্রের ট্রেন-এ যাবো। ১৪ অথবা ১৫ই Association Office-এ মিটিং চলছে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে সরগরম আলোচনা। এমন সময় সমরদার প্রবেশ। আমাদের আর্ত জিজ্ঞাসা "বই কোথায় সমরদা?; সমরদার উত্তর "দাঁড়াও! ডাক্তারকে একটা ফোন করি, ও তো এখনো লেখা দেয়নি।' ডাক্তার মানে তপেনদা। সমরদা মিটিং শেষ করে চললেন মার্বেল প্যালেস বা ফোনে শুরু করলেন "তপেন লেখাটা দাও?। তপেনদা ১৪ তারিখে বলছেন "আমার আরো একদিন লাগবে'। সমরদা তখনও cool। আমরা তখন প্ল্যান শুরু করেছি কিভাবে Post Reunion Period-এ স্যুভেনিরগুলো বিতরণ করা যায়। সমীর পাইনদা গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে সমরদার। সমরদা চুপ। বিজয়কে (1988) depute করা হলো এই বলে যে "তুই গাড়ি নিয়ে হাওড়া যাবি, যাওয়ার পথে সমরদার বাড়ি থেকে স্যুভেনিরগুলো তুলে নিস।' আমরা ৯ টার সময় পুরুলিয়া থেকে ফোন করছি "বিজয় পেলি?; বিজয় চুপ। সমরদা বাড়িতে নেই। অমরদা (সমরদার ভাই, ১৯৬৫ ব্যাচ) বলছেন "দাদা তো দুপুর বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।' আমরা বিদ্যাপীঠে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি। রাত ১১-১০-এ ফোন এলো সমরদা চলন্ত আদ্রা-চক্রধরপুরে

বই তুলছেন এবং তারপরে সটান এ ট্রেন-এ চড়ে পুরুলিয়াতে এসে হাজির সকালবেলা। সমীর পাইনদার সামনে দাঁড়িয়ে সেই হাসি। বললেন "হলো তো – বই deliver করলাম তো!" তারপর সমরদার সেই epic statement "সমর late করে, কিন্তু আসে!"

সত্যি বিদ্যাপীঠে থাকাকালীন অবস্থা থেকে সব কিছুতে সমরদা late। Association Office থেকে আমরা সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় বেরোবো, সমরদা ঢুকলেন আটটা পঁচিশে। তাঁর সঙ্গে চপ, চা। আড্ডা আবার শুরু হলো। আমরা বলতাম full stop, সমরদা কোনো অনুষ্ঠানে আসা মানে আর লোক আসবে না। এবার pack up করা যেতে পারে বা খাওয়া শুরু করা যেতে পারে।

সমরদা, বিদ্যাপীঠের ৬৪-এর batch, ৬৬-তে পাস করেন। সত্যহরি সাহাদা না থাকলে এই সমর দের Ex-student হওয়া হতো না– এই গল্প আমরা বহুবার শুনেছি। হিরণ্ময়ানন্দজি মহারাজের die-hard fan, ধ্রুবদার একনিষ্ঠ ভক্ত, সমরদা ছিলেন ৬৬-র ব্যাচের gang of 6-এর member যাঁরা বিদ্যাপীঠের Indoor hospital-এর Pox ward-এ Reunion-এর সময় থাকতেন। তপন চ্যাটার্জিদা, সমীর পাইনদা, দিব্যেন্দু মজুমদারদা, সমরদা, দীপক অধিকারীদা-এরা ছিলেন permanent - ৬ নম্বরটা ছিলো rotational- কখনো অতনু ভাস্করদা, কখনো সুভাষ চৌধুরীদা বা ৬৬র অন্য কেউ কিন্তু কখনো বাইরের কেউ নয়। দীপকদা আর সুভাষদা ছাড়া সবাই চলে গেলেন একে একে। Pox ward এবারে আর কেউ Book করলেন না in advance। সমীর পাইনদা ছিলেন বিদ্যাপীঠে থাকাকালীন সমরদার Room-mate। ওর মৃত্যুটা সমরদাকে খুব নাড়া

দিয়েছিলো। বারবার বলতেন সমীর আমার জন্য wait করছে। আসলে বৌদির মৃত্যুর পর থেকেই সমরদা একটু একাকিত্বে ভুগতেন। এক বিজয়া দশমীর দিন বৌদি চলে যান, সকালবেলা আমরা বিজয়া করলাম তারপর বারোটার সময় সমরদা ফোন করে আমাকে জানালেন "তোমার বৌদি চলে গেলেন– সবাইকে জানিয়ে দিও।' সিরিয়াস কথা হলে 'তুমি' বলতেন বাকি সময় তুই-তোকারি করতেন।

সমরদা printing technology-র উপরে যাদবপুরে পড়াশোনা করেছিলেন। তারপর নিজেদের Press– D.H. Kesh & Co., 68, Lenin Sarani। সেখানকার ফোন নম্বরও মজাদার। দু ডজন এক ডজন দেড় ডজন ২৪১২১৮। পরে সামনে ২ এসে যাওয়াতে ছন্দটা নষ্ট হয়ে যায়। আজকের অক্রুর দত্ত লেন-এ Association office হবার আগে, তপেনদার ৭ বি কিরণশংকর রায় রোড এবং সমরদার প্রেসই ছিলো Association-এর ঠিকানা। প্রত্যেক বুধবার কিরণশংকর রায় রোডে হাজিরা এবং রিইউনিয়নের সময় সমরদার Press-ই ছিল আমাদের war room.

সমরদার অদ্ভুত কিছু ভালো গুণ ছিলো– ভালো গাইতেন, artistic এবং aesthetic Sense ছিল বেশ উচ্চমানের। অটোমোবাইল-এর উপর সাঙ্ঘাতিক জ্ঞানগম্যি ছিল। গাড়ির বিবর্তনের উপর সমরদা ঘন্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে পারতেন। মধ্য কলকাতা ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। আর পুরোনো কলকাতার পুরোনো পরিবারগুলোর উপর একটা huge database ছিলো। Alumni association অন্তপ্রাণ ছিলেন তিনি। এই association তৈরির পিছনে যাঁদের অবদান তাঁদের মধ্যে সামনের সারিতে সমরদাকে ফেলা যায়।

মজাদার লোক ছিলেন সমরদা। দেওঘর বিদ্যাপীঠেও পড়েছিলেন। ওদের reunion-এ গিয়ে পুরুলিয়ার প্রশংসা করতেন আর পুরুলিয়ার reunion-এ দেওঘরের প্রশংসা করতেন। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে সমরদা গেলে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিতো। নিজের মনে গোটা ক্যাম্পাসটা ঘুরতেন, শেষের দিকে লাঠিটা রাখা থাকতো hospital-এর খাটে। আবার লাঠিটা প্রয়োজন পড়তো হাওড়া স্টেশনে নামার পর। সেটা বলাতে খুব রেগে যেতেন।

শেষ যেবার পুরুলিয়া গেলেন, সৈকতেশ মহারাজ তখন সেক্রেটারি হিসাবে এসে গেছেন। হঠাৎ ফোন এলো মহারাজের "দেখ তো সমরদাকে বিদ্যাপীঠে পাওয়া যাচ্ছে না'। অনেকবার ফোন করে আমিও পেলাম না, অবশেষে বাঘকে (সমরদার ছেলে) ফোন করলাম। সে বললে "বাবা তো অযোধ্যা পাহাড় চলে গেছে সকালবেলা - আমাকে সকালে phone করেছিলো।' বিদ্যাপীঠ থেকে কোনো অভিভাবক হয়তো যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সমরদা চলে গেলেন অযোধ্যা পাহাড়ে। মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন, মানুষকে ভালোবাসতে পারতেন। আমি সমরদার থেকে বাইশ বছরের ছোটো। বলতে দ্বিধা নেই, সমরদা আমাকে বা আমাদের যতটা ভালোবাসতেন, আমি বা আমরা আমাদের বাইশ বছরের জুনিয়রদের অতো ভালোবাসতে হয়তো জীবনেও পারবনা। শুধু সমরদা নন, রঞ্জিতদা, সঞ্জীবদা, সমীরদা, ধ্রুবদা, সুভাষ চ্যাটার্জিদা ও চৌধুরীদা, এদের কাউকে আমার বা আমাদের ভোলা সম্ভব নয় এ জীবনে।

যাওয়া হয়নি সমরদার ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ। খুব ইচ্ছে ছিলো সেখানে যাওয়ার। কিন্ত পুরুলিয়া থেকে কোনো বারই সম্ভব হয়নি নানা কারণে।

আর ছিলো ভুলে যাওয়া। কোনটা যে কোথায় রাখলেন সমরদার কিছুই মনে পড়তো না সময়ে। দেখা হলো যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এলেন বা ফোন করলেন, সেটা ছাড়া সব বিষয়ই বলে গেলেন। তারপর বাড়ি ফিরে আবার ফোন করে বলছেন "হ্যারে ভুলে গেলুম তোকে আসল কথাটা বলতে।' বিভিন্ন সময় সমরদার ফোন আসত। এখন আর আসে না। আর আসবেও না কোনদিন। মাঝেমধ্যে সমরদার কথা খুব গভীর করে মনে পড়ে। তাঁকে সত্যি বড় মিস করি।

লকডাউন-এর সময় দাড়ি রেখেছিলেন। নিজের নাম দিয়েছিলেন 'সাহেব বুড়ো'। পর পর তিনদিন ২৯ মে, ৩০ মে আর ১ জুন দিব্যেন্দু মজুমদারদা, অতনু ভাস্করদা এবং অবশেষে সমরদা চলে গেলেন।

সমরদা যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। আপনার Association থাকবে। 'অভ্যুদয়' থাকবে। প্রতিবারের মতো এবারেও প্রকাশিত হবে। প্রত্যেক reunion-এই প্রকাশিত হবে। শুধু একদিন বা দুদিন আগে বিদ্যাপীঠে পৌঁছে যাবে, ব্যস। এটাই যা ফারাক।

সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

Obituary

Nemai Nandi
1969

Our dear friend Late Nemai Nandi left for his heavenly abode on 20/10/2020 at the age of 67 years. He was a wonderful person with ever-smiling face and pleasing demeanor.

He had contracted COVID-19 and was hospitalised at Rubi hospital, Kolkata. His condition deteriorated very fast and it took his precious life untimely within 3 to 4 days.

After passing out from RKMV, Purulia he graduated in Mechanical Engineering from IIEST, erstwhile Bengal Engineering College, Shibpur in the year 1975. He stood 4th in Technical stream in the H.S exam in 1969.

He joined Hindustan Motors, Hooghly immediately after his graduation. Later he joined Acc Vickers Babcock Ltd., Durgapur and served for a few years. Finally he took up a job with Jessop Ltd in Kolkata andultimately retired from there.

Through his parents lived in Santragachi, Howrah but he settled down at Behala, Kolkata after retirement.

His wife passed away few years before him and his two sons are married and settled in the USA and Noida, Delhi.

We convey our sincere condolences to the bereaved family of our dear friend Late Nemai Nandi.

Obituary

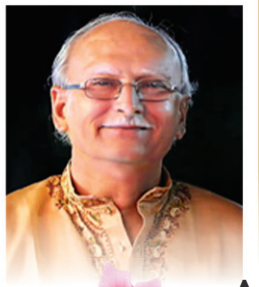

Alok Banerjee

1969

Our dear friend Late Alok Banerjee passed away on 7th May, 2021 at the age of 68. He was quite handsome among our batchmates and a wonderful person with ever-smiling face and pleasing behaviour.

He had suffered from COVID 19 and was hospitalised at Anand Surgical near his residential locality at Ahmedabad. His condition deteriorated fast and it took his precious life untimely within a week's period of time.

After passing out from RKMV, Purulia he graduated in Textile Engineering from erstwhile Berhampore Textile Engineering College in the year 1973.

He joined Reliance Textile Mill at Ahmedabad immediately after his graduation. He continued his service there rising to the post of Senior Manager until 2002.

His parents lived in Barrackpore, North 24 Paraganas but he settled down at Ahmedabad after retirement.

He is survived by his wife and two sons who are married and settled in Ahmedabad.

We convey our sincere heartfelt condolences to the bereaved family of our dear friend Late Alok Banerjee.

প্রয়াণলেখ

সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায়

১৯৭০

১৯৫৩ সালের শেষ প্রান্তে আমরা দুজনেই পা রেখেছিলাম ধরাধামে। দেখা হয়েছিল নয় বছর পর দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে,একটু বিচ্ছিন্ন হলেও আবার দেখা পুরুলিয়া মিশনে। সৌমিত্র পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে ১৯৭০ সালে কৃষি বিভাগে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার পর পল্লী শিক্ষা সদন কলেজে (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) কৃষি নিয়ে শুরু করে পন্থনগর, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পর্ব শেষ করে এলাহাবাদ ব্যাংকে আধিকারিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু ও ২০১৩তে সেখান থেকেই কর্মজীবনের সমাপ্তি।

সৌমিত্র আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। হঠাৎ করেই ছুটি নিয়ে নিলো, বড় তাড়াতাড়ি। ওর প্রাণখোলা হো হো রবে হাসি আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত "জি ভরকে জিও, ঔর সবকো জিনে দো" স্লোগান কোনদিনই আমরা ভুলতে পারবো না। অসময়ে চলে যাওয়া বন্ধুদের মধ্যে চরিত্র বৈশিষ্ট্যে এবং ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্তিতে উজ্জ্বল সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায়---- স্কুল এবং কলেজ জীবনে সবার কাছে খুব প্রিয় ছিল।

কথা বলতো মেপে। ছোটখাটো একহারা সুশ্রী চেহারা। ফরসা গায়ের রঙ। বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। হকি খেলতো দারুণ। ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টনেও ওস্তাদ। মাউথ অরগ্যানটা ও ভালই বাজাতো।এসরাজও বাজতো ওর হাতে। টিচারদের প্রিয় পাত্র।ছবি আঁকতো পাকা হাতে , ভালো কার্টুনিস্ট ছিল। রং তুলি ক্যানভাস ওর হাতে প্রাণ পেয়ে কথা বলত। পিএসএস বা শ্রীনিকেতনে যে কোন অনুষ্ঠানে মঞ্চসজ্জায় দেখতাম ওর হাতের কাজ। শান্তিনিকেতন 'পৌষমেলায়', শ্রীনিকেতন 'মাঘমেলায়' বা গৌর প্রাঙ্গণে "আনন্দ বাজারে" আমাদের পল্লী শিক্ষা সদন কলেজ ষ্টল দিত। সেখানে থাকতো ওর হাতে আঁকা ছবির পসরা।

কোলিয়ারির উচ্চপদে আসীন পিতার আদরের সন্তান। পরিবার বলতে মা,বাবা,দুইবোন ও সৌমিত্র। একমাত্র পুত্র বলে সৌমিত্রর বাড়ি থেকে মাসোহারাটা ভালই আসতো। টাকা পয়সা নিয়ে কোন দুর্ভাবনা ওর ছিল না। ব্যপারটাকে আমলই দিত না। শ্রীনিকেতনের পল্লী শিক্ষা সদন কলেজ থেকে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে বিএসসি এগ্রিকালচার অনার্স পাশ করে। এম এসসি পড়তে গেল পন্থ নগর ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে জড়িয়ে গেল ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে। চরমপন্থী রাজনীতির শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলো। ফিরে এলো পশ্চিম বঙ্গের কল্যাণীতে। সেখানে মাষ্টার ডিগ্রিটা শেষ করে ঢুকে গেল ব্যাংকে।

কর্মজীবন শুরু এলাহাবাদ ব্যাংকের অফিসার হয়ে, পরে ম্যানেজার।

এই ছিল সৌমিত্র। অসম্ভব ট্যালেন্টেড। ব্যাংকের চাকরি পেয়ে বিয়ে করল। রাজার হালে দিন কাটছিল। বছর ১২ আগে অসুস্থ স্ত্রী খুব অল্প বয়সে মারা গেল। এরপর থেকে সৌমিত্র বেহিসেবি আর বেপরোয়া জীবন কাটাতে লাগলো। আয়ের থেকে ব্যয় বেশী। শেষ জীবনটা বড়ই অভাব আর কষ্টে কাটলো। হঠাৎ স্ট্রোক। সপ্তাহ দুয়েক মাত্র তারপর সব শেষ।

২০২০ মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ২৫ মার্চ একটা বৈচিত্র্যময় জীবন স্তব্ধ হয়ে গেল।

সমর সিংহ (১৯৭০)

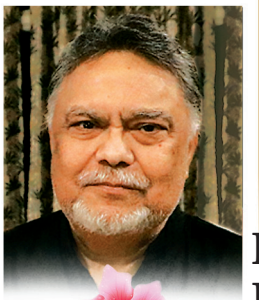

Partho Pratim Burmon Roy

1971

Graduated in Naval Architecture from IIT, Kharagpur (1976), Partho joined and worked for a few years at Garden Reach Shipbuilders & Engineering Ltd. After a brief stint at the Shalimar Engineering Works Pvt Ltd, he joined Bharati Shipyard Ltd, Mumbai in a senior position, where he was instrumental in designing and delivering various types of ships. On retirement he settled in Kolkata, and started a shipyard at Jhellingham ,Nandigram and instituted various constructions and repair of ships. He was an active member of the Institution of Naval Architects. He is survived by his wife and two daughters.

Pinaki Barua
1971

Unlike his 1971 batchmates who joined IIT, Kharagpur, he joined Architecture at IIT one year later, but found the engineering course too stifling for his creativity. Surmounting a strong opposition from his parents he moved to Kala Bhavana, Visva Bharati and completed B. Fine and M. Fine with specialisation in Printmaking, under the tutelage of the legendary Somnath Hore. He was briefly employed as the Art Teacher at Julian Day School, Kolkata, and then served for ten years as Lecturer in Printmaking at Rabindra Bharati University. He then moved to Kala Bhavana, Visva Bharati as Professor (1994-2013). He was a towering figure in Graphics Art have a lyrical quality. He also dabbled in photography, which he found as an independent medium of expression. He organized printmaking camps in different parts of India, Bangladesh and Mauritius, and participated in more than twenty major exhibitions. He had a deep commitment to teaching, and was much loved at Kala Bhavana He is survived by his wife and two daughters.

Kiriti Mahato
1973

Kiriti Mahato was a very colourful character during our Vidyapith life. He was actively involved with quite a few social organizations in Purulia like 'UNMESH', 'RANGAMATI' which work for financially weak girl students by providing them with free schooling, stipends, books, food etc. Kiriti's particular interest in folk music and dance forms like Chou, Jhumur, Tusu, Nachni, and Bhadu was remarkable. He himself was a very good singer of Bhadu / Tusu songs and very proudly used to say "Music is my life". His contribution towards the welfare of the artists financially and otherwise was noteworthy. He was the chief brain behind the creation of a film "Bihar agei bhalo chili" in local language of Manbhum.

Kiriti was also associated with an NGO named 'Naihati Wins' of Kolkata and participated in thein social and cultural activities.

In Vidyapith life Kiriti always used to keep our spirits high with his jokes and light -banter. He had no fear or tension in life and he took things as and when they came to him. He retired from the erstwhile UBI (now PNB), Vivekanandanagar Branch and before that he had sacrificed all opportunities for promotions in order to be in that particular branch which was in close proximity to Vidyapith.

We wish Kiriti all the blessings in his after life.

Obituary

Balaram Sardar
1976

Born to Late Nityananda Sardar and Nanibala Sardar in the village of Barometala in Ranibandh, Bankura, Balaram Sardar led a life full of promise. He studied in Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia from 1970 to 1976, when he passed out as a member of the First Madhyamik batch.

Balaram completed MBBS from Calcutta University in 1984 from Bankura Sammilani Medical College and Hospital, Bankura. He was posted as MO in Radiotherapy in BSMCH for many years. He developed a reputation of being a doctor with heart who could advise rural patients fully taking into cognizance their adversiti. His vast experience in treating cancer patients was however not considered when he was transferred to Barjora Superspeciality Hospital.

In school Balaram was friendly to all and sundry and he maintained his simplicity and catholicity of mind to the end of his life. One cannot recall any instance when he was hostile to anybody. Such complete lack of ego is a rare quality with which Balaram was blessed. He developed a complication during dental extraction and passed away in 2022. He is survived by wife and son. He will be always fondly remembered by his friends. We are fortunate that we met him during the Reunion of our batch in 2019.

প্রয়াণলেখ

শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

১৯৭৮

১৯৭৩ এ ষষ্ঠ শ্রেণীতে শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় যখন আসে তখন তার চোখে মুখে স্বাভাবিক বালকসুলভ চপলতা, কিছুটা দুরন্তপনা, বয়স তখন মাত্র ১২ বছর। তার পর বিদ্যাপীঠের পরিমার্জন।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বিরাট জনসমুদ্রে কিছুটা সময় হারিয়ে যাওয়া। এ সময় পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবন শুরু।

পরবর্তী সময় আবার আমাদের যোগাযোগ হয়, যা তার এপ্রিল, ২০২০ তে স্নায়বিক রোগাক্রান্ত হয়ে বরাবরের মতো হারিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অটুট ছিল।

তার এই অপরিণত বয়সে চলে যাওয়া এক সান্ত্বনাহীন শূন্যতার সৃষ্টি করেছে বন্ধুবর্গের হৃদয়ে।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৮

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র। ১৯৭৩ সালে ১০ বছর (জন্ম : ২৮ মার্চ ১৯৬৩) বয়সে বিদ্যাপীঠে আসে। নিষ্পাপ দুটি চোখ আর অপার সারল্য-মাখা মুখ। বিদ্যাপীঠের সময়টা মাধ্যমিকের পরে শেষ। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক।

আমাদের সাথে পুনর্মিলনের আগে ইসিএল-এ কর্মজীবন শুরু করে এবং শেষ দিন পর্যন্ত ওখানেই ছিল। ১৮ জুন ১৯৯০ অপর্ণার পাণিগ্রহন করে। দুই কন্যার মধ্যে বড় কন্যা বিবাহিত।

দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানের এই মহাঘাতক করোনা ১৪ মে ২০২১ এ তাকে অপিরণত বয়সে কেড়ে নেয়। তার এই অকালপ্রয়াণ তার পরিজনের সঙ্গে আমাদেরও ব্যথিত করেছে।

Obituary

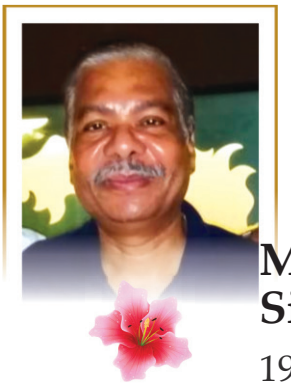

Mahesh Prasad Singh Samant

1978

Mahesh Prasad Singh Samant hailed from Khandapada, a town in Nayagarh district of Odisha. Born in 1963, he was a brilliant student from his childhood. He won the Govt. of India Merit Scholarship from Odisha in 1974 and chose to study in Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia. When he was asked about his aim in life during the interview of the said scholarship test, he emphatically told he would become a farmer and carry out farming using scientific method and latest technology. That was not a normal answer by a student who was only 11 years then. Yes, Mahesh was never a conventional thinker; We was recognized as a genius of mathematics amongst his friends at Purulia. He was admitted to the School in 1974 in class VII and he passed out in 1978 with flying colours.

Then he went on to become a Chartered Accountant and had his own firm having offices in Jharkhand (Ranchi) and Odisha (Bhubaneswar). On the 17th of February, 1991 he married Smt Jayesh Nandini and shuttled between Ranchi and Bhubaneswar for family and work. He always believed that everyone is different and should find his path on his own. He never imposed any pressure on his two children, elder son and a younger daughter in choosing their career paths. They were given full freedom on that account. His son Sawayam Siddha is a cricket player who is trying his luck in Ranji Trophy and his daughter Pragati Sutrika is a Chartered Accountant looking after her father's firm.

Mahesh was a simple, honest and happy-go-lucky guy who had strong faith in God. He always advised his friends to be patient and enjoy small things and moments in life. We always admired his depth of understanding of relationships and life. I had the opportunity to meet Mahesh at Bhubaneswar in 2019.That day, Mahesh was at his effusive best and I will cherish those moments for life.

Then came the notorious and dreaded Covid-19. Mahesh suffered from the disease in March 2021 and seemed to have recovered from the same. However, he had a brain stroke in April 2021 and succumbed to the same on the 10th of April 2021. In a short span of 58 years, Mahesh lived a life of satisfaction and completeness. May his soul rest at His lotus feet!

প্রয়াণলেখ

তপন হালদার
১৯৮০

তপন হালদার বিদ্যাপীঠে ক্লাস ফোরেই যোগ দেয়। ও ছিল তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা। ১৯৮০ সালে বিদ্যাপীঠ থেকে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হবার পর তপন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে। তারপর কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে স্নাতক হয়। কর্মজীবনের পুরোটাই তপন ভারতীয় ডাক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

তপনের সম্পর্কে বলতে গেলে একটা আশ্চর্য সারল্যের ছবি ভেসে ওঠে। ও এতটাই সরল ও নির্বিবাদী ছিল যে পুরো কর্মজীবনটাই টানা গড়বেতা অঞ্চলে কাটিয়ে দিল। তার বাইরে কখনো বেরোতে চায়নি। ওর সেই অর্থে আজকালকার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিরাট জাগতিক চাহিদাও ছিল না। আজকের সময়ের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়ে এক অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম হয়ে তপন ওর জীবন অতিবাহিত করেছে।

বিদ্যাপীঠের ছাত্রজীবনে তপন খুব মিশুকে এবং মজাদার চরিত্র ছিল। আশেপাশের বিভিন্ন ছেলেদের এবং অন্যান্য লোকেদের পর্যবেক্ষণ করার একটা সহজাত প্রতিভা ওর ছিল। এবং তা থেকে ও খুব মজার চরিত্রচিত্রণ করে ভালো নকল (mimicry) পরিবেশণ করতো। সর্বদাই হাসিখুশি থাকতো ও সঙ্গীদের রসিকতায় মাতিয়ে রাখত।

শেষের দিকে নিজের শরীরের প্রতি সেভাবে খেয়াল রাখে নি। ভেতরে জটিল রোগ বাসা বেঁধেছিলো, হয়তো বুঝতেও পারেনি। সময়ে সঠিকভাবে চিকিৎসাটা করাতে পারলে ও আজও আমাদের মধ্যেই থাকত। কোভিড মহামারির প্রথম পর্যায়ে ২০২০ সালের , ২০ শে সেপ্টেম্বর তপন আমাদের ছেড়ে অকালেই চলে যায়। ওর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

আবির বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৮০

বিদ্যাপীঠের ভাষায় বলতে গেলে আবির ব্যানার্জি ছিল 'টাউনের ছেলে' অর্থাৎ পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দা। মা শিক্ষিকা ও বাবা ছিলেন সরকারি আধিকারিক । ক্লাস ফাইভে আসে আর ১৯৮০ তে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়।

এর পর যথাক্রমে নরেন্দ্রপুর থেকে ১৯৮২ তে উচ্চমাধ্যমিক, ১৯৮৬ তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক এবং ১৯৮৯ সালে সেখান থেকেই নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। এরপর আই আই টি, কানপুর-এ কোয়ান্টাম অপটিক্স নিয়ে গবেষণা এবং ১৯৯৬ সালে ডক্টরেট উপাধি লাভ। তারপর আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসাবে দুবছর ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোরে এক বছর গবেষণা । এরপর ১৯৯৯ সালে জওহরলাল নেহরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ সেন্টারে সহকারী গবেষক পদে নিযুক্ত হয়।

পরে আবির চন্দননগরে চলে আসে এবং হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল কলেজে ২০০৫ থেকে আমৃত্যু পদার্থবিদ্যার প্রধান ছিলো।

আবির বরাবরই একটু অন্তর্মুখী প্রকৃতির ছিলো, চুপচাপ থাকতো অনেক সময়। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে নাটকে আগ্রহ নিয়ে যোগদান করতো। চেহারায় একটু ছোটখাটো ছিল বলে হয়তো খেলাধুলা বা শারীরিক কসরৎ ইত্যাদি ওর খুব পছন্দের ছিল না।

নিজের স্বাস্থ্য ও শরীরের প্রতি ওর আরো মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। কোভিড মহামারির প্রথম পর্বের শেষ দিকে ফেব্রুয়ারি ২০২১এ আবির আমাদের ছেড়ে চলে যায়। ওর অকালমৃত্যুতে বহু অসম্পূর্ণ গবেষণা শেষ করতে পারেনি অকৃতদার বিজ্ঞানতপস্বী এই মানুষটি।

প্রয়াণলেখ

বাসব মুখার্জী

সঞ্জীব সেনগুপ্ত

সুব্রত সাধুখাঁ

অভিরাম আচার্য

(১৯৮২)

"অমলটা ধুঁকছে – ক্ষমা আর" – বাসব ছোট থেকেই পেট রোগা - বায়ুদোষগ্রস্ত। বিবেক মন্দিরের সামনের শ্রেণিকক্ষে নীরবে নিদ্রাতুর সান্ধ্য পঠনকালেই ঘটত পুস্তক বোঝার সশব্দ পতন। ঐ শব্দের মাঝেই বাসব তার হাওয়া বের করে নিত। স্বাভাবিক সময়ের হেরফেরে ধরাপড়ে যাওয়া। ঘর থেকে আয়ুর্বেদিক চূর্ণ জাতীয় কিছু আনত। সেবনে যদি যকৃত প্লীহা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। দুরারোগ্য কর্কটরোগই বাসবকে আমাদের বাসবরঞ্জন মুখার্জিকে, হজমহীনতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

চারদিকে ঢোলা জামা-প্যান্ট পরিহিতদের মাঝে "ফিটিং" কাপড় পরিহিত "স্মার্ট বয়" সঞ্জীব সেনগুপ্ত। বিবেকানন্দ সেনাদল প্রধান তথা রাণা প্রতাপ দলের নিদেশক। আমরা তখন ক্লাস ফাইভে। ১৯৭৬ সালের কালী পুজার সন্ধ্যায় দুই থলি পটকা নিয়ে ঘোরা সঞ্জীবের সংযোগ। সাঁই সাঁই হাওয়া বাজি ছোটে দিগ্বিদিকে। মহারাজ থলি কেড়ে ফেলে দেওয়ায় বড় দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি। নিত্যনতুন পরিকল্পনা (অধুনা স্মার্ট আপের মত) করতে করতেই কণ্ঠরোধ হয়ে গেল সেনাপ্রধানের। অকালে ঝরে গেল তাজা সজীব সঞ্জীব।

আমাদের সকলের থেকে একটু বড় সুব্রত সাধুখাঁ। তেমন বিশেষ কোন বিষয়ে সাধুখাঁ পারদর্শী ছিল না। পরবর্তীকালে একাই প্রায় ৯০ জনের ঠিকানা যোগাড় অনুসন্ধান করে এক বিখ্যাত আয়োজক রূপে ৮২ ব্যাচের একত্রীকরণের সবটুকু কৃতিত্ব ওর প্রাপ্য। সবার থেকে উচ্চতায় একটু বেশি, খাদ্য রসিক, নিত্যদিনের নিয়মমাফিক একঘেয়ে খাবারে কিঞ্চিৎ বিরক্ত। চেহারা নিয়ে টাকা-টিপ্পনি, ব্যঙ্গ-মস্করা, অতিমানবীয় ভঙ্গিমায় ক্রোধহীন, অভিমানহীন ভাবে হেসে উড়িয়ে দিত। সর্বনাশা ভোজনপ্রিয়তাই সাধুকে মধুমেহগ্রাসে ঠাকুরধামে নিয়ে গেল।

শিব -- মানে সুন্দর, তাই জটা থাকলেও শ্মশ্রুবিহীন, সদা-আনত নয়ন। আমাদের অভিরাম আচার্য বিদ্যাপীঠ জীবনের ৮টি শিবরাত্রির শ্রেষ্ঠ শিব। যেমন লম্বা, চওড়া, দোহারা চেহারা তেমনই সুরেলা কণ্ঠ, দক্ষ ক্রিকেটার, সুভাষ সেনাদল প্রধান, বিদগ্ধ নট, নাট্যনির্দেশক শিক্ষককুলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিল। এমন দিলদার, বন্ধুবৎসল, সদা প্রাণচঞ্চল... নবীনবরণে তো গান গেয়ে তো সবার মন কেড়ে নিয়েছিলই, পরে শনিবারের শেষ পিরিয়ড সভাগৃহে অনুষ্ঠিত ভি.পি.-তে (পরবর্তীতে সি.পি) প্রায়ই গাইত 'বেলা বয়ে যায় - ছোট্ট মোদের পানসি তরী'..। কখন যে বেলা বয়ে গেল; অভিরামের জীবনতরী দেখতে দেখতে রামকৃষ্ণ সাগরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

মানস ঘোষ

ডাঃ বিশ্বজিৎ বন্দোপাধ্যায়

১৯৮৬

আজ থেকে পনেরো বছর আগে যখন বাচ্চার জন্মগত হৃদযন্ত্রের ত্রুটি মানেই বাঙালিদের স্বাস্থ্য তীর্থে নিয়ে যাওয়া, তখন কলকাতার রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সায়েন্সে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় Paediatric Invasive Cardiology চালু করেন। সেই হিসেবে ওঁকে পূর্বভারতের Paediatric cardiology-র পথিকৃৎ বলা যায়। শ্বেতশুভ্র চুল, গোঁফ আর মুখে মন ভোলানো হাসি। আমি নিশ্চিত যে শিশুদের হৃদযন্ত্রের ফুটো বন্ধের পাশাপাশি শিশুদের মায়েদের হৃদঘটিত সমস্যাও বিশু সমাধান করেই ছাড়ত। কিছু মানুষ জমিদার হয়ে জন্মায়। বিশু ছিল সেই গোত্রের। ওকে ঘিরে আমাদের বিচরণ। এই যে কেষ্ট বিষ্টু অশোকতরু বা সুব্রত, তারাও কেমন বিশুর চেলা ছিল। কখনো বা অশোককে সিনেমা হল থেকে বার করে শান্তিনিকেতন নিয়ে চলে গেছে, কখনো আমরা ন ঘন্টা ধরে দেড়শো কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছি। শুধু ছুতো ছিল মিলিত হবার। এমন কি প্রি-বন্ধ পালন করতেও পিছপা হই নি। হোলির আগে ব্যাপরে আমরা সপরিবারে মিলিত হতাম | সেখানেও বিশু থাকত মধ্যমণি হয়ে। চলেও গেল রাজার মত। করোনার সময় নাওয়া খাওয়া ভুলে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে করতে করোনা আক্রান্ত হয়ে। তবে জমিদারের সংযমের অভাব ছিল। যদি একটু সাবধান হত আর আমরা যদি ওর বে-লাগাম জীবনে একটু লাগাম ধরতে পারতাম তাহলে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আজও করেক হাজার শিশুর জীবনে সূর্য হয়ে থেকে যেতে পারত।

দেবদুলাল চট্টোপাধ্যায়

১৯৮৮

বিদ্যাপীঠ টিমের বোলিং ওপেন করত দেবদুলাল। তার দুরন্ত ফাস্ট বোলিং বিপক্ষকে কাঁপিয়ে দিত। সেই হাতেই আবার চমৎকার ছবি আঁকত সে। বিদ্যাপীঠের ব্যান্ডে বিগ ড্রাম, কেটল ড্রাম বাজাত। বাঁকুড়ার ছেলে দেবদুলাল বরাবরই দামাল প্রকৃতির, যেখানেই যাক হৈচৈ বাধিয়ে রাখবে। একইসঙ্গে দিলদরাজ, হাসিখুশি আর বন্ধুবৎসল। কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকত। অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হবার কথাও ছিল, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ যবনিকা নেমে এল। প্রাণবন্ত দেবদুলালের এভাবে চলে যাওয়া সব হিসেবের বাইরে।

সঞ্জয় মাহাত

১৯৮৮

পুরুলিয়ার ডাবর গ্রামের ছেলে সঞ্জয় যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল, তার তুলনা মেলা ভার। নিজের গ্রামে অনাথাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, ইস্কুল চালিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি ছৌ নাচের দল নিয়ে যেত কত জায়গায়। ভাবতে অবাক লাগে একজন মানুষ এতরকম কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ভাবতে গর্ব হয় সে আমাদের বন্ধু। কালান্তক করোনার প্রথম ধাক্কায় চলে যেতে হল তাকে। অনেক অসমাপ্ত কাজ ফেলে রেখে মাঝপথে সঞ্জয়ের এই অকালপ্রস্থান আমাদের সেই পুরোনো প্রবাদ মনে করিয়ে দেয়-কিছু কিছু মৃত্যু পাহাড়ের মত ভারী।

Surajit Datta

1989

1989 batch had to accept a very premature loss of Surajit Datta. A very shy, humble, and down- to-earth person from Purulia, Surajit joined us at the 4th standard in 1982. A bright student and sports-lover, Surajit was a member of the Subhash Platoon. Unfortunately, during his student days he was diagnosed with a very rare nerve disease, which had affected his lower limbs, but he did not lose his courage. After passing out from Vidyapith he had completed his Higher Secondary education and Graduation in Purulia Town and got engaged in family business successfully.

During the Covid pandemic he was detected with Covid Pneumonia. After a brief struggle he left us for Ramakrishna Lok in 2020.

প্রয়াণলেখ

পুষ্পেন্দু চক্রবর্তী
২০০০

খবরটা পাওয়ার পর কয়েকদিন ধরে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, যে পুষ্পেন্দুর নাম্বারটা ডায়াল করলে আর ওর গলাটা শুনতে পাব না "কি ভাই, কেমন আছিস?" এখনও পরিষ্কার গলাটা শুনতে পাই, ওর কথা মনে করলেই। মোবাইলের কাছে হাতটা নিশপিশ করত খুব, মনে হত ফোন করলেই পুষ্পেন ধরবে।

শুরু থেকে শুরু করি। আমি বিদ্যাপীঠে ভর্তি হই ক্লাস ফাইভে! তখন ফোর থেকে ভর্তি শুরু হত। আমি নতুন ছেলে। একটু তটস্থ, নতুন পরিবেশে, মানিয়ে নিতে সময় লাগছে। আমার ডায়েরীতে সে দিনটার কথাও লেখা ছিল– যেদিন সকালে স্টাডি হল থেকে বেরিয়ে বিমল মহারাজের অফিসের দিকে হাঁটবার সময় পুষ্পেন বলল, "তুই তো সিংহের বাচ্চা, নিজেকে ভেড়া ভাবছিস কেন?" কথামৃতের গল্প। আমাদের আই.সি.তে পাঠ্য ছিল। সেইদিনটাই ছিল আমার বিদ্যাপীঠে 'নতুন ছেলে' থেকে 'বিদ্যাপীঠের ছেলে' হয়ে ওঠার দিন। পরে অনেকবার মনে হয়েছে, পুষ্পেনের সারা জীবনটাই ওই সিংহ হয়ে ওঠার সাধনা। পুষ্পেনের কিছু নীতিবোধ ছিল, সারাজীবন সেগুলো থেকে একবিন্দু সরে আসেনি।

ফুটবলে মাঝমাঠে একজন শক্ত লোক থাকে না? ক্রিকেটে মিডল অর্ডারে। যে হয়ত দলের সবচেয়ে বড় নায়ক নয়, কিন্তু সবচেয়ে কঠিন যোদ্ধা। পুষ্পেন্দু ছিল সেই লোকটা। খেলার মাঠে, জীবনের খেলায়। দর্শকেরা নায়কের দিকে চেয়ে বসে থাকে। নায়ক যার দিকে চেয়ে বসে থাকে কঠিন যুদ্ধটা লড়বার সবচেয়ে শক্তিশালী সঙ্গীকে পাশে পাবার জন্য, পুষ্পেন্দু ছিল সেই লোকটা। আমরা রবিন সিং বলতাম ক্রিকেটের মাঠে, ফুটবল মাঠে কার্লোস। আর সবচেয়ে ভালো খেলত ভলিবলটা– সেই মাঝখানে– সেই গোটা দলের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে– বাঘের মত। ছোট বেলায় ওর শারীরিক শক্তি বিদ্যাপীঠে বিখ্যাত ছিল, বড় হতে হতে পরিচিত হলাম ওর মনের জোরের সাথে। বিদ্যাপীঠ ছেড়ে যাবার পরও প্রায়ই ওর সথে ফুটবল নিয়ে কথা হত, বড় কোনও ম্যাচ থাকলে, বিশেষ করে আর্জেন্টিনার। পুষ্পেনের সাথে আমি মাশ্চেরানোর মিল পেতাম– যোদ্ধা– অসম্ভব মানসিক শক্তিশালী একটা মানুষ।

কখনো মাথা নীচু করতে দেখিনি পুষ্পেনকে। কোনও প্রলোভনে কখনও নত হতে দেখিনি– স্যারদের চোখে ভালো হবার প্রলোভনেও না, বন্ধুদের কাছে জনপ্রিয় হবার প্রলোভনেও না। সাধারণ মানুষকে দিয়ে ওর তুলনা করা যায় না।

পরীক্ষার সময়ে, আমি যখন সবে চার নম্বর পৃষ্ঠায়, পুষ্পেন হাত তুলে বলত, "স্যর, পেজ।" প্রচণ্ড দ্রুত লিখতে পারত পুষ্পেন, আর আমি সবচেয়ে ধীরে। ভাই, জীবনের সব পেজগুলো এত তাড়াতাড়ি কেন শেষ করে চলে গেলি, আর একটু আস্তে লিখতি, আমাদের সাথে। জানি তুই ভালো আছিস, যেখানেই আছিস। ভালো থাকিস।

Obituary

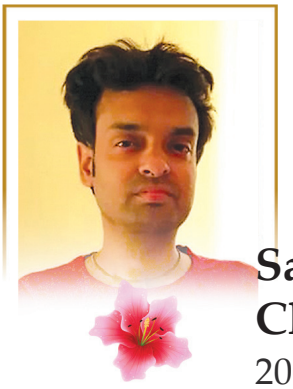

Sandipan Chatterjee

2001

For most of us the fondest memory of Sandipan was when a lanky guy came to bat, and the next thing we heard was a cracking sound of a huge six. That was our friend Sandi for us, the Tendulkar of our Vidyapith . A cheerful guy, always sporting a smile, brilliant in studies and even better at sports. He had won numerous cricket matches for his class and platoon single handedly. Even years after passing the school, the little boy in Sandi still loved to throw balls out of the park on weekends, in-between his busy work schedule.

In early 2019 at the age of 34, Sandi was surely one of the fittest guys amongst batchmates. So the news of his sudden stage 4 lung cancer came in as a total shock to all of us. But it was a bigger shock for him as he was an absolute "NON-SMOKER". It was one of those moments when it felt the world is unfair. By the time he got to know, cancer had already started spreading to bone, liver and brain along with his lungs.

Unfortunately Sandi lost both his parents in 2014. All he had was a younger brother. But in this battle against cancer he was never alone. His childhood friends from Vidyapith stood by him like his family. Even though there were many who helped, the story of Sandi is incomplete without mentioning Chakku, his batting partner from school (AmitabhaChakrabarti of 2001 batch). Just like they played and fought numerous cricket matches together, Chakku stood by him taking care throughout his treatment.

Sandi did put on a brave fight with cancer with a smile on his face and left us on Jan 13,2021. Sandi was the reason why Batch Coordinators of RKMVP was started, an initiative that connected batches from 1961 to 2019 and on. To save Sandi, not only his classmates but the entire Vidyapith fraternity came together like never before.

প্রয়াণলেখ

শুভজ্যোতি মিত্র
২০০৪

আমাদের বন্ধু শুভজ্যোতি , আমাদের আদরের টপা। ১৯৯৭ সাল থেকে পুরুলিয়ার রুক্ষ মাটি থেকে বন্ধুত্বের, যে চারাগাছ রোপিত হয়েছিল, আচমকাই তার একটা ডাল প্রবল ঝড়ে ভেঙ্গে গেল। আমাদের ছেড়ে কোনো এক অনন্তের পথে চলে গেলো আমাদের আদরের টপা। কোভিড আক্রান্ত হয়েছিল। বিদ্যাপীঠ পরিবারের সব প্রার্থনা কে না-করে দিয়ে ছুটি হয়ে গেলো তার। দিনটা ২৪ আগস্ট , ২০২০। পেশায় একজন প্রতিষ্ঠিত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত ছিল।

টপার প্রাণবন্ততা , তুড়ি মেরে জীবনকে উড়িয়ে দেওয়ার যে স্পর্ধা তা আমাদের কাছে অনতিক্রম্য। বিদ্যাপীঠ জীবনের পরে আমাদের একটা সুতোয় বেঁধে রাখার কাজটা ওই করতো। ওর শিশুসুলভ দুষ্টুমি, ওর দরাজ উপস্থিতি প্রতিটি অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতো। খুব ছোট্টবেলাতে মা-কে হারিয়েছিল। তাই আক্ষরিক অর্থে ওর কাছে মায়ের রূপ ছিল বিদ্যাপীঠ। খেলাধুলো তে অসম্ভব ভালো ছিল। কিছু বছর আগে বাবা কে ও হারিয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনে তাই খুব একা ছিল। অথচ প্রতিটি অনুষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় দেখেছি ওর দাপুটে মানসিক শক্তি আমরা যেমন সামগ্রিক ভাবে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে জীবন কাটাই ওর জীবনের পুরো পরিধিটাই ছিল বিদ্যাপীঠকে কেন্দ্র করে। আর খুব পছন্দের ছিল হিমালয় পর্বত।

আজ দুবছরের কিছু বেশি সময় সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে। কিন্তু প্রতিটি অনুষ্ঠানে ওর অনুপস্থিতি আমাদের কষ্ট দেয়। এই বিশ্বাসে এগোই যে টপা আজও বিদ্যাপীঠের আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছে।

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥"

প্রয়াণলেখ

অরিন্দম দাশ
২০০৭

আবাসিক বিদ্যালয়ে ওরকম নামের একটু আধটু হেরফের হয়েই থাকে। অরিন্দমেরও ভাটু হয়েছিল।

আর অরিন্দম দাসের সাথে 'নিউ' তকমাটা জুটেছিল প্রথম দিন থেকেই। কারণ আর এক 'মার্কামারা' পুরনো অরিন্দম দাসের উপস্থিতি। সংক্ষেপে অরিন্দম 'ওল্ড'।

অরিন্দম (নিউ) মানেই একটা ভালো মানুষ ভাব, ভালো মানুষ চিন্তা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, সাদাসিধে চেহারা, বেলবটম প্যান্ট আর সরল প্রাণোচ্ছল হাসি। এই দিয়েই ভাটু আমাদের মনে থেকে যাবে চিরদিন।

ক্লাস সেভেনের মুখচোরা অরিন্দম নিউ কবে যেন সব থেকে ভালো অঙ্ক করা, দারুণ ভালো খেলতে পারা, চুলে জেল লাগিয়ে কেতা করা আর অনর্গল ভাটিয়ে যাওয়া সবার প্রিয় ' ভাটু' হয়ে উঠলো আমরা নিজেরাও জানিনা।

অসম্ভব পরিশ্রমী, হার মানতে না চাওয়া ছেলেটার জীবনের প্রতি মূল্যবোধ ছিল শ্রদ্ধা করার মতো। মনে করতামও হয়তো অনেকে। কারণ অনেকেরই অগুনতি কঠিন জীবন সমস্যা ওর ভাট-বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে।

আজ প্রায় বছর দুই ভাট শুনিনা। জানি আর শুনবোও না। এখন আর কেউ ফোন করে বলে না 'বন্ধু প্রণাম'।

আমরা জানি অরিন্দম যেখানেই আছে খুব ভালো আছে। আর ওর চারপাশ জুড়ে অনেকটা অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো হয়ে আছে।

Obituary

Sagapam Romen Singh
2009

Romen Singh was born in Ningthoukhong of Bishnupur District of Manipur on August 23, 1994, to S. Ibochoubi mother was S. Radha Devi. Romen was the fourth child and he had two elder brothers and an elder sister. Lovingly his family members and local friends used to call him “Men”.

He came to Vidyapith in Class V in the year 2004. Throughout his Vidyapith life, he was always kind and jolly to others and was loved and adored by all. He was forever in love with sports and arts. During Janmastami and annual exhibitions, his contributions in paintings and artistic activities have been significant every year. He has received the “Best Athlete of the Year” prize several times. He was a member of the 2008 School football Team which won the Inter Ramakrishna Mission Football tournament held at RKM, Narendrapur. He passed the 2009 Madhyamik Examination from Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia marks securing First Division and good conduct.

He did his Higher Secondary from the Millenium School, Imphal and went on to pursue Civil Engineering from BVC Engineering College, Odalarevu. Before his untimely demise, he was working as a Section Officer (as Civil Engineer) in Manipur Industrial Development Corporation Limited (MANIDCO), Govt. of Manipur. He even used to look after his family Business with his Father and was successful at it. He was married to Daisy Moirangthem on the 25th of March 2019.

Romen was a true believer of the teachings and philosophy of Swami Vivekananda. He was always generous and open handed to his fellow beings. Once we remember, he celebrated his 23rd Birthday at an Orphan Children’s Home by treating all the kids with lunch. He was always a part of activities of All Manipur Ramakrishna Mission Alumni.

Unfortunately, just after a month of his marriage, in a tragic incident in which a boat capsized after a storm in the Mapithel dam in Ukhrul District of Manipur at around 5 pm of 28th April of 2019, Romen left for his heavenly abode along with his own elder Brother S. Rajiv and a teenage girl N. Rani of the same locality.

আরো যাদের হারিয়েছি

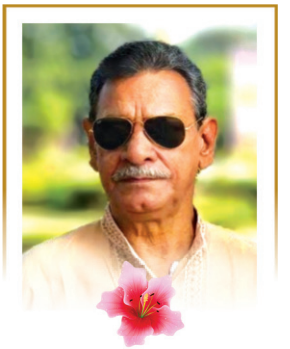

অতনু ভাস্কর
১৯৬৬

দিব্যেন্দু মজুমদার
১৯৬৬

সুনীল মুখার্জী
১৯৬৭

অতীশ বসু
১৯৭৪

দীপক মুখার্জী
১৯৭৭

কৌশিক পাল
১৯৭৯

রাতুল চক্রবর্তী
১৯৮৪

এল. রতন সিং
১৯৮৪

আরো যাদের হারিয়েছি

বিষ্ণুপ্রিয় মাহাতো
১৯৮৪

কুনাল মুখার্জী
১৯৮৪

সুমন মুখার্জী
১৯৮৫

কৌশিক বসু
১৯৯৫

গৌরব বেহেরা
২০০২

কে. জয়কুমার সিং
২০০২

গৌরব মাহাতা
২০১৮

Photo : Arupananda Mukherjee, 1983

With Best Compliments From :

M. P. Birla Foundation Educational Society

"Birla Building", 4th Floor,
9/1 R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
Phone : (091) (33) 66166911 / 66166919
E-mail : mpbfes@mpbicts.com

With Best Compliments From :

EASTERN INDIA EDUCATIONAL INSTITUTION

"Birla Building", 4th Floor,
9/1 R.. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001
Phone : (033) 6616 6911 / 919
E-mail : eiei@mpbicts.com

With Best Wishes from

Tarun Kumar Mallik

Consultant - Sustainability Projects

- **R**enewable Energy and Energy Storage system – Lead Acid Battery, Li-ion Battery through Advanced Chemistry Cell for Electric Vehicle & Energy Storage.
- **B**io-degradable & Compostable Plastics.
- **P**lastics Waste Management.
- **P**lastics Recycling.
- **L**ow-Cost Packaging.
- **L**ow-Cost Housing.

+91 90510 55403

tarun_mallik@hotmail.com / tarunk.mallik@gmail.com

With Best compliments from :

A

Well Wisher

কৃতজ্ঞতা পত্র

সূচনাতেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে বিদ্যাপীঠে সমাগত তিন পূণ্যশ্লোক সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বনাথানন্দজি (সুভাষ মহারাজ) স্বামী অমৃতেশানন্দজি (রবিন মহারাজ) এবং স্বামী স্বাগতানন্দজিকে (বিমল মহারাজ)। ছাত্রজীবন এবং উত্তরজীবনে তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। এই পুনর্মিলন উৎসবে তাঁদের পুণ্যপদস্পর্শে ধন্য বিদ্যাপীঠের প্রতিটি ধূলিকণার মতো আমাদেরও তাঁরা কৃতকৃতার্থ করেছেন।

অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ, সন্ন্যাসীবৃন্দ, শিক্ষককুল আর সর্বস্তরের অশিক্ষক কর্মচারিগণকে। বিদ্যাপীঠের পুণ্য মাতৃভূমিতেই এই পুনর্মিলন উৎসব যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে-ব্যাপারে তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগ এবং সক্রিয় সহযোগের জন্য। এ বিষয়ে বিদ্যাপীঠের বর্তমান সম্পাদক স্বামী শিবপ্রদানন্দজি মহারাজ এবং প্রধান শিক্ষক স্বামী জ্ঞানরূপানন্দজি মহারাজের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য।

কৃতজ্ঞতা জানাই এই উদযাপন উপলক্ষ্যে বিদ্যাপীঠে সমাগত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রয়াত শিক্ষককুলের পরিবারবৃন্দকে।

উপরি-উল্লিখিত সকল পুণ্যাত্মার শুভকামনা শুধু বর্তমান পুনর্মিলন উৎসবেরই নয়, আমাদের জীবনপথেরও পাথেয়।

কৃতজ্ঞতা জানাই মার্বেল প্যালেস, কলকাতার অছি পরিষদ, বিশেষত আমাদের প্রাক্তনী সংসদের সভাপতি ড. তপেন্দ্র মল্লিক মহোদয়কে। মার্বেল প্যালেসের শিল্পসুষমামণ্ডিত ঐতিহ্যশালী সুচারু পরিসরটিকে প্রাক্তনীদের বিজয়া সম্মেলনী অনিষ্ঠানে ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য।

কৃতজ্ঞতা জানাই ‘অভ্যুদয়’-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দকে। পত্রিকাকে সুন্দর আর নির্ভুলভাবে পরিবেশন করতে তাঁদের অক্লান্ত, নিরলস, তদগতচিত্ত স্বেচ্ছাশ্রমের জন্য কোনো ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়।

কৃতজ্ঞতা এই সংখ্যার লেখককুলকে, তাঁদের মেধাশ্রমে ঋদ্ধ সেরা লেখাটি তাঁদের প্রিয় বিদ্যাপীঠের পুনর্মিলন-উৎসব-স্মারক ‘অভ্যুদয়’-এর অঞ্জলিপুটে তুলে দেবার জন্য।

কৃতজ্ঞতা বিদ্যাপীঠের বর্তমান ছাত্রবৃন্দসহ এ সংখ্যার সমস্ত নবীন-প্রবীণ পাঠককে। ‘একাকী গায়কের নহে তো গান’..তাঁদের পাঠ আর প্রতিক্রিয়া ছাড়া ‘অভ্যুদয়’ অসম্পূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা জানাই এ সংখ্যার মুদ্রক শ্রীযুক্ত সন্দীপ মল্লিক (ইউনিক ফোটোটাইপ, কলকাতা - ৬) এবং প্রুফ রীডার শ্রীযুক্ত রথীন চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁদের দক্ষতা এবং নৈপুণ্যেই এ সংখ্যাকে যথাসম্ভব নির্ভুল আর সুন্দর করে তোলার প্রযত্ন সাকার হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের যাদের সহৃদয় সহযোগিতা আমাদের এই পত্রিকা প্রকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই পুনর্মিলন উৎসবে সমবেত সমস্ত প্রাক্তনীকে, যাঁদের সাগ্রহ অংশগ্রহণ এই উদযাপনের সাফল্যের সূত্র। গম্যমান এক স্বজনহারানো শুশ্রূষাপিপাসু দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ হোক আমাদের পথের মন্ত্র, মননেই যার ত্রাণ।

Gmmco CAT

With
Best Compliments
From

Gmmco CAT

Reaching Customer Support to New Height
GMMCO LTD. a C. K. Birla Group Company

DISTRIBUTORS FOR
WORLD CLASS **CATERPILLAR**
EARTHMOVING, MINING EQUIPMENT.

CAT INDUSTRIAL AND MARINE ENGINE
AND DIESEL GENERATING SETS.
Total commitment to the Mining Industry.

GMMCO Limited
"Birla Building", 11th Floor,
9/1 R.. N. Mukherjee Road,
Kolkata - 700 001

Phone : 033 4086 4101 / 4110, Fax : 033 4086 4105
E-Mail : anuj@gmmcoindia.com / dipak@gmmcoindia.com

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর